জীবনের সময়চিত্রে পবিত্র সুন্নাহ থেকে যা প্রমাণিত

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ فِيْ أَيَّامِ السَّنَةِ

জীবনের সময়চিত্রে পবিত্র সুন্নাহ থেকে যা প্রমাণিত

মূল

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

ভাষান্তর

মাওলানা সগির আহমদ চৌধুরী

সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ

উপাধ্যক্ষ মাওলানা জমির উদ্দীন নেসারী

প্রকাশনায়

আল-মদীনা প্রকাশনী

১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

❖ গ্রন্থের নাম
জীবনের সময়চিত্রে পবিত্র সুন্নাহ থেকে যা প্রমাণিত

❖ মূল
শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

❖ ভাষান্তর
মাওলানা সগির আহমদ চৌধুরী

❖ সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ
উপাধ্যক্ষ মাওলানা জমিরউদ্দীন নেসারী

❖ প্রকাশকাল
জানুয়ারী, ২০১৫ - রবিউল আওয়াল, ১৪৩৬

❖ কম্পোজ, প্রচ্ছদ ডিজাইন ও মুদ্রণ
আল-মদীনা প্রিন্ট মিডিয়া, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৮১৮–৯০৭০০২

❖ প্রকাশনায়
আল-মদীনা প্রকাশনী
১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৮১৯–৫১৩১৬৩, ০১৮২৫–৩৮৪২৩২

❖ হাদিয়া
৪০০ [চারশত] টাকা মাত্র

Ma Sabata bis Sunnah Fee Aiyamis Sanah, By: Sheikh Abdu Haq Muhaddith Dehlavi (Rh.), Translated Into Bangla by Moulana Sagir Ahmad Chawdhury, Published by: Al-Madina Prokhasoni, Chittagong, Bangladesh. Price: 400/-

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ

وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَم

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে নিবেদিত, যিনি বরকতময় সময়গুলোকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। পরহেযগার ও পূণ্যপথের যাত্রীদের জন্যে সৌভাগ্য আর গৌরবান্বিত সম্মানে ভূষিত করেছেন। যাতে তাঁরা পরকালের লাভজনক সওদা থেকে বহুগুণ মুনাফা অর্জন করতে পারেন। পাশাপাশি ভালো আমলগুলোর মাধ্যমে দু'আ কবুলের প্রত্যাশী হতে পারেন।

অবশ্য ব্যবসায়-সওদার সুবর্ণ সুযোগেও যারা লাভবান হতে পারে না তারা প্রকৃতই দুর্ভাগা। সীমালঙ্ঘণকারীগণই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাকওয়াবান আলোকিত কাফেলার মধ্যমণি, সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য শুভেচ্ছা ও সালামের উৎকৃষ্ট উপহার। যার শিক্ষা ও অনুসরণ খুলে দেয় জ্ঞান ও আমলের স্বর্ণদুয়ার। ইহ ও পরকালের সমুদয় স্বপ্ন-আশা কেবল তাঁর সুপারিশপ্রাপ্তিতেই ছুঁতে পারে সফলতা। তিনিই মানবতার মহান শিক্ষক, জগতের শীর্ষ রাহবর, রহমত-মহানুভবতা ও জ্ঞানের উৎসধারা। তাঁর সেসব পরিবার-পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক যাঁরা আলোর পথের অভিযাত্রী ও ইল্‌মের ধারক-বাহক।

অতঃপর অধম আবদুল হক ইবনে সায়ফুদ্দীন আদ-দিহলবী আল-বুখারী আল্লাহর দরবারে আরজ করছি, তিনি সাইয়িদুল মুরসালীন ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আমাদেরকে দৃঢ়তর বিশ্বাস নসীব করুন এবং সঠিক পথে জীবন পরিচালনার তওফীক দিন।

প্রাত্যহিক দু'আ ও অযীফা এবং বিশেষ দিবস-রাত্রির নামায-রোযা সম্পর্কে মুহাদ্দিসীন, ওলামা ও তরীকতের রাহবরদের মধ্যকার কিছু মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও হাদীসবিশারদগণ আহলে তরীকতের মত, আমল, উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণ ইত্যাদির ওপর যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনা ও কঠোর ভাষায় অনেক কিছুর অপনোদন করেন। আহলে তরীকতের পেশকৃত প্রমাণাদি অস্বীকার করে তা ভুল সাব্যস্ত করে থাকেন।

এ-গ্রন্থটি রচনার আগে আমি ফারসি ভাষায় একটি পুস্তকে উভয় শ্রেণীর মাঝে ঐক্য ও সমন্বয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উভয়

দলের মাঝামাঝি আমি একটি নিরাপদ রাস্তা তৈরি করে নিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ভালো জানেন, কে সঠিক পথের ওপর আছেন।

এই গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনায় শিরোনাম চয়ন, বিশুদ্ধ হাদীস, হাদীসে হাসান, দুর্বল ও অপ্রমাণিত হাদীসগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছি। কারণ এসব হাদীসের সূত্র যাচাই ও অনুসন্ধান তো ওসব ওলামায়ে কেরামের হাতে সম্পাদিত হয়েছে। বিশেষভাবে এ-গ্রন্থে আলোচনার বিভিন্ন সূক্ষ্ম দিক এবং প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক বিষয় সন্নিবেশ করেছি। বিশেষভাবে রবিউল আউওয়ালে বিশ্বনবীর বিদায় প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছি। মুহাররম থেকে যিলহজ মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসভিত্তিক সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ সর্বোত্তম তওফীকদাতা এবং প্রতিটি কাজের পূর্ণতা তাঁর সর্বময় নিয়ন্ত্রণে। আমি গ্রন্থটির নাম রেখেছি, «مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ فِيْ أَيَّامِ السَّنَةِ» (জীবনের সময়চিত্রে পবিত্র সুন্নাহ থেকে যা প্রমাণিত)। গ্রন্থটি হে আল্লাহ অনুগ্রহে কবুল করুন, যাকে তন্দ্র স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়।

মাহে মুহার্‌রম

মাহে মুহার্‌রমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিশেষত্ব এবং এ-মাসে সিয়াম-পালনের মর্যাদা বিষয়ে *জামিউল উসূলে* বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ উদ্ধৃত হচ্ছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ فِيْهِ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

'হযরত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হতে বর্ণিত, রামাযানের আগে আশুরায় সিয়াম পালিত হতো। যখন রামাযানে সিয়াম পালনের বিধান অবতীর্ণ হলো তখন থেকে যার খুশি রাখতো, ইচ্ছে হলে নাও রাখতে পারতো।'[১]

এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি (হযরত আয়িশা ﵂) বলেন,

[١] كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ .. الحديث.

'(১) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আশুরা-দিবসে সিয়াম পালনে নির্দেশ দিয়েছেন।'[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি (হযরত আয়িশা ﵂) বলেন,

[٢] كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا سُتِرَ فِيْهِ الْكَعْبَةُ، قَالَتْ: فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ».

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ২৪, হাদীস: ৪৫০২

[২] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৩, হাদীস: ২০০১

‘(২) রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হওয়ার আগে লোকেরা আশুরার সিয়াম পালন করতো। এ-দিনে কাবাগৃহে গিলাফ চড়ানো হতো। তিনি আরও বলেন, যখন রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হলো তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আশুরায় কেউ চাইলে সিয়াম পালন করতে পার, ইচ্ছে করলে ত্যাগও করতে পার।’’[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি (হযরত আয়িশা ﵂) বলেন,

[٣] كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ عَاشُوْرَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

‘(১) জাহিলি যুগে কুরাইশরা আশুরায় সিয়াম পালন করতো। জাহিলি যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লামও আশুরায় সিয়াম পালন করতেন। এমনকি তিনি মদীনায় আগমন করেও সিয়াম পালন করেছেন এবং অন্যদেরও এ-সিয়াম পালনে নির্দেশ দিতেন। যখন রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হলো তখন থেকে তিনি আশুরায় সিয়াম পালন ছেড়ে দেন; কেউ চাইলে আশুরায় সিয়াম পালন করতো, ইচ্ছা করলে ত্যাগও করতে পারতো।’[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

[٤] – فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

‘(৪) যখন রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হলো নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ‘কেউ চাইলে আশুরায় সিয়াম পালন করতে পার, ইচ্ছে করলে ত্যাগও করতে পার।’’[৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১৪৮–১৪৯, হাদীস: ১৫৯২
[২] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০২
[৩] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৩, হাদীস: ২০০১

[৫] – أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّىٰ فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ».

'(৫) জাহিলি যুগে কুরাইশরা আশুরায় সিয়াম পালন করতো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লামও এ-সিয়াম পালনের আদেশ করেন। তবে যখন রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হয় তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আশুরায় কেউ চাইলে সিয়াম পালন করতে পার, ইচ্ছে করলে ছাড়তেও পার।"

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম মুসলিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন।[১] ইমাম মালিক (ইবনে আনাস (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)), ইমাম আবু দাউদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম আত-তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও চতুর্থ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২] এতে «فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ» (যখন রামাযান সিয়াম পালন ফরয হল) বক্তব্যের পর «فَكَانَتْ هُوَ الْفَرِيْضَةُ» (রামাযানে সিয়াম পালনই ফরয হিসেবে পরিগণিত হলো)।[৩]

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُوْنَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ مِّنْ أَيَّامِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ...».

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, জাহিলি যুগে লোকজন আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করতো। হযরত রাসূলুল্লাহ

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২৪, হাদীস: ১৮৯৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯২, হাদীস: ১১৬ (১১২৫)

[২] (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ৩, পৃ. ৪২৮, হাদীস: ৩১৫; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ২৪৪২; (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১১৮, হাদীস: ৭৫৩

[৩] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩০৫–৩০৬, হাদীস: ৪৪৩৬

ﷺ ও অন্যান্য মুসলিমরাও রামাযানের সিয়াম পালন ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ-সিয়াম পালন করতেন। যখন রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হয় হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আশুরা-দিবস আল্লাহর (প্রিয়) দিবসসমূহের অন্যতম, অতএব যার খুশি এই দিনে সিয়াম পালন করতে পার।"[১]

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنهما বলেন,

[١] ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُوْمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

'(১) নবী করীম ﷺ-এর দরবারে আশুরা-দিবসের প্রসঙ্গ ওঠলো। এ-প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন, 'দিবসটি জাহিলি যুগের লোকেরা সিয়াম পালন করতো। এখনও যার খুশি সিয়াম পালন করতে পার, ইচ্ছে করলে ত্যাগও করতে পার।"

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী رحمه الله ও ইমাম মুসলিম رحمه الله বর্ণনা করেছেন।[২]

ইমাম আল-বুখারী رحمه الله-এর বর্ণনায় এসেছে,

[٢] صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَاشُوْرَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَهُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُوْمُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

'(২) আশুরায় হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন করেছেন এবং এ-সিয়াম পালনে নির্দেশও দিয়েছেন। তবে যখন রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হয় তখন থেকে তিনি এ-সিয়াম পালন ছেড়ে দেন। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর رضي الله عنهما) তাঁর নিয়মিত সিয়াম পালনের সাথে মিলে না-গেলে তিনি এ-সিয়াম পালন করতেন না।"[৩]

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ,* খ. ২, পৃ. ৭৯২, হাদীস: ১১৭ (১১২৬)

[২] মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৭৯৩, হাদীস: ১২১ (১১২৬)

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* খ. ৩, পৃ. ২৪, হাদীস: ১৮৯২

যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশির ভাগ সময় দিনে রোযা রাখতেন, তাই ঘটনাক্রমে যদি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযার মাঝে ১০ মুহাররমের দিন এসে পড়ে তাহলে ওই দিনের রোযাও রেখে দিতেন।

ইমাম মুসলিম ও দ্বিতীয় হাদীসটির অনরূপ বর্ণনা করে বলেছেন,

[৩] « ... فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ».

'(৩) ...এখন কারো ভালো লাগলে আশুরায় সিয়াম পালন করতে পার আর ভালো না লাগলে বিরত থাকতেও পার।'[১]

ইমাম আবু দাউদ প্রথম হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَىٰ، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ تُعظِّمُهُ الْيَهُوْدُ، وَتَتَّخِذُوْنَهُ عِيْدًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ».

'হযরত আবু মুসা (আল-আশআরী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরা-দিবসকে ইহুদিরা সম্মান করতো এবং এ-দিবসে তারা ঈদ উদ্‌যাপন করে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ, 'তোমরাও এ-দিবসে সিয়াম পালন কর।''[৩]

এক বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، يَتَّخِذُوْنَهُ عِيْدًا، وَيُلْبِسُوْنَ نِسَاءَهُمْ فِيْهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ».

'খায়বার অধিবাসীগণ আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করতো, এ-দিবসে তারা ঈদ উদ্‌যাপন করতো এবং তাদের মেয়েদের উন্নত পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সাজাতো। এ-পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'এ-দিবসে তোমরা সিয়াম পালন কর।''[৪]

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[৫]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوْا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، أَنْجَى

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৯৩, হাদীস: ১১৮ (১১২৬)
[২] (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ২৪৪৩; (খ) ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল, খ. ৬, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ৪৪০৭
[৩] আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০৫
[৪] মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৯৬, হাদীস: ১৩০ (১১৩১)
[৫] ইবনুল আসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩০৭, হাদীস: ৪৪০৮

اللهُ فِيْهِ مُوْسَىٰ وَبَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ، فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَىٰ مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ মদীনায় আগমনের পর আশুরা-দিবসে ইহুদিদের সিয়ামপালন করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কী'? তারা জবাবে বলল, এটি এক মহান দিবস; এ-দিবসে আল্লাহ হযরত মুসা ও বনী ইসরাইলকে শত্রু (ফিরআউন)-এর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এ-কারণে তিনি এ-দিবসে সিয়াম পালন করতেন। একথা শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ তাদের বললেন, হযরত মুসা-এর ব্যাপারে তোমাদের তুলনায় আমাদের অধিকার বেশি। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ নিজে এ-দিবসে সিয়াম পালন করেন এবং অন্যদেরও সিয়ামপালনের নির্দেশ দেন।'

এক বর্ণনায় এসেছে,

فَقَالَ لَهُمْ: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ تَصُوْمُوْنَهُ»؟ قَالُوْا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَىٰ وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوْسَىٰ شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ.

'হযরত রাসূলুল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কোন দিবসে তোমরা সিয়াম পালন করছ'? তারা উত্তর দেয়, এটা বড়দিন। এ-দিবসে আল্লাহ হযরত মুসা ও বনী ইসরাইলকে (শত্রু ফিরআউনের হাত থেকে) মুক্তি দিয়েছিলেন। এ-দিবসেই ফিরআউন ও তার বাহিনীকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। এর কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ হযরত মুসা সিয়াম পালন করেছিলেন। তাই এই দিবসের সম্মানে আমরাও সিয়াম পালন করি।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[1] দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।[2]

---

[1] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০৪, খ. ৪, পৃ. ১৫৩, হাদীস: ৩৩৯৭ ও খ. ৫, পৃ. ৭০, হাদীস: ৩৯৪৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ,* খ. ২, পৃ. ৭৯৬, হাদীস: ১২৮ (১১৩০)

[2] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান,* খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ২৪৪৪; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল,* খ. ৬, পৃ. ৩০৮, হাদীস: ৪৪৩৯

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْهُ.

'হযরত জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরা-দিবসে সিয়ামপালনের নির্দেশ দিতেন এবং এ-ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে ওয়াদা-অঙ্গীকার নিতেন। তবে যখন রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হয় তখন থেকে তিনি আশুরা-দিবসে সিয়ামপালনের আমাদের আদেশ-নিষেধ কোনোটাই করেননি, ওয়াদা-অঙ্গীকারও নিতেন না।'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[1]

وَعَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يَطْعَمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، تُرِكَ، فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ.

'হযরত আলকামা থেকে বর্ণিত, হযরত আল-আশআস ইবনে কায়স আশুরা-দিবসে হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর)-এর কাছে এলে তাঁকে আহার করতে দেখলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আজকে তো আশুরা-দিবস! উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ বলেন, রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হওয়ার আগে (এ-দিবসে) সিয়ামপালন হতো, যখন রামাযানে সিয়ামপালনে ফরয হয় তখন তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তুমি সিয়াম পালন না করলে (আমাদের সাথে) খেতে বস।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[2]

---

[1] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৪, হাদীস: ১২৫ (১১২৮); (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩০৮—৩০৯, হাদীস: ৪৪৪০

[2] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০৭ ও খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০৭; (খ) মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৯৮, হাদীস: ১৩৫ (১১৩৫); (গ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩০৯, হাদীস: ৪৪৪১

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ: «أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ».

'হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, 'যাও সবার মাঝে ঘোষণা করে দাও, সাহরী খেলেও না খেলেও আজ যেন সবাই সিয়াম পালন করে। কারণ আজকের দিন আশুরা-দিবস।'

এক বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ: «أَذِّنْ فِيْ قَوْمِكَ، أَوْ فِي النَّاسِ» بِالشَّكِّ.

'নবী করীম ﷺ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, 'গোত্রের মধ্যে অথবা লোকদের মধ্যে জানিয়ে দাও।' শব্দগত কিছু সংশয় রয়েছে।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আন-নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।[1]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে মাসলামা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[2]

وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ الْمُعَوِّذِ ﵂، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِيْ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ»، فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُوْمُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُوْنَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ».

---

[1] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ২৪, হাদীস: ৫৪০৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৪, হাদীস: ১২৪ (১১২৮); (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৯২, হাদীস: ২৩২১; (ঘ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩০৯–৩১০, হাদীস: ৪৪৪২

[2] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৭, হাদীস: ২৪৪৭; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৪৪৪৩

'হযরত রুবাইয়ি' বিনতুল মুআওয়িয (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
তিনি বলেন, আশুরার সকালে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের সকল পল্লীতে এ-নির্দেশ দিলেন, 'যার সিয়াম অবস্থায় সকাল হয়েছে সে যেন সাওম পূর্ণ করে, আর যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে। পরবর্তীতে আমরা ওই দিবসে সিয়াম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের সিয়াম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ওই খেলনা দিয়ে ইফতার পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতাম।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[১]

অন্য বর্ণনায় অনুরূপই এসেছে।[২]

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﵁، قَالَ: كُنَّا نَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَنُؤَدِّيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ.

'হযরত কায়স ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরা-দিবসে আমরা সিয়াম পালন করতাম এবং সাদকা-ফিতর দিতাম। তবে রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হয় এবং যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হয় নবী করীম ﷺ সিয়ামপালন সম্পর্কে কোনো আদেশ-নিষেধ জারি করেননি। তাই আমরা আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করে যাই।'

হাদীসটি ইমাম আন-নাসায়ী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[৩]

তিনি আরও বর্ণনা করেন,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّيْفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ»؟ فَقَالُوْا: مِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ، قَالَ:

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৩৭, হাদীস: ১৯৬০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৮, হাদীস: ১৩৬ (১১৩৬)

[২] (ক) মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৯৯, হাদীস: ১৩৮ (১১৩৬); (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩১০–৩১১, হাদীস: ৪৪৪৪

[৩] (ক) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৫, পৃ. ৪৯, হাদীস: ২৫০৬; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩১১, হাদীস: ৪৪৪৫

«فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوْضِ، فَلْيُتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ».

'হযরত মুহাম্মদ ইবনুস সাইফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরা-দিবসে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকে তোমরা কিছু খেয়েছো'? তারা জবাবে বলল, আমাদের কেউ কেউ সিয়াম পালন করছি, আবার অনেকে সিয়াম পালন করছি না। তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সবাই অবশিষ্ট দিবস পূর্ণ করো এবং আশপাশের লোকদেরও বলে দাও, তারা যেন অবশিষ্ট দিবস পূর্ণ করে।"

হাদীসটি ইমাম আন-নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।[১]

ইমাম মালিক (ইবনে আনাস) বর্ণনা করেন,

بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَصُمْ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُوْمُوْا.

'তিনি জানতে পেরেছেন যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব হারিস ইবনে হিশাম)-এর কাছে খবর পাঠিয়েছেন, আগামীকাল আশুরা-দিবস; তুমি নিজেও সিয়াম পালন করবে এবং তোমার আত্মীয়-স্বজনকেও সিয়াম পালনে আদেশ করবে।'

এটি (ইমাম মালিক ইবনে আনাস তাঁর) *মুওয়াত্তায়* বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِيْ رَمَضَانَ.

'হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে শুনেছেন; তাঁকে আশুরা-দিবসের সিয়াম পালন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করতেন;

---

[১] (ক) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৯২, হাদীস: ২৩২০; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩১১, হাদীস: ৪৪৪৬

[২] (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৮৪৪; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩১১–৩১২, হাদীস: ৪৪৪৭

তিনি এই দিবসকে অন্যান্য দিবসের তুলনায় বিশেষ মর্যাদা দিতেন। যেমন এই মাস তথা রামাযানকে অন্যান্য মাসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

«مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّىٰ صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا هَـٰذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَهَـٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ»..

'নবী করীম ﷺ আশুরা-দিবসকে অন্যসব দিবসের তুলানায় এবং এই মাস তথা রামাযানকে অন্য মাসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، إِنِّيْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ».

'হযরত আবু কাতাদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমি মহান আল্লাহর কাছে আশা করি, আশুরা-দিবসের সিয়ামে পূর্বের এক বছরের (সগীরা) গোনাহ মার্জনা করবেন।''

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ يَوْمُ الْعَاشِرِ».

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরা-দিবসে তথা দশই মুহার্‌রম সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।'

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[১]

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০৬; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৭, হাদীস: ১৩১ (১১৩২); (গ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৪৪৪৮

[২] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১১৭, হাদীস: ৭৫২; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৪৪৪৯

[١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ» يَعْنِيْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যদি আমি আগামীতে বেঁচে থাকি নয়ই মুহার্‌রম অর্থাৎ আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করবো।''[২]

এক বর্ণনায় এসেছে, (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ) বলেন,

[٢] حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَاشُوْرَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَىٰ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْتُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّىٰ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

'(১) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিজে আশুরায় সিয়াম পালন করেছেন এবং অন্যদেরকে সিয়াম পালনে আদেশ করেছেন তখন তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই দিবস তো ইহুদি-খ্রিস্টানরা সম্মানে উদ্‌যাপন করে থাকে। তিনি বললেন, 'আগামী বছর আমি নয়ই মুহার্‌রম সিয়াম পালন করবো ইনশাআল্লাহ।' অবশ্য পরবর্তী বছর আর আসেনি, তার আগেই হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াফাতবরণ করেন।'[৩]

হযরত আল-হাকাম ইবনুল আ'রাজ ﷺ-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

[٣] انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِيْ زَمْزَمَ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِيْ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ، فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، قَالَ: هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُوْمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

---

[১] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১১৯, হাদীস: ৭৫৫; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৪৪৫০

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৮, হাদীস: ১৩৪ (১১৩৪)

[৩] মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৯৭, হাদীস: ১৩৩ (১১৩৪)

'(২) আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর খিদমতে গিয়ে দেখি, তিনি একটি চাদর মুড়িয়ে যমযম কূপের পাশে বসে আছেন। আমি বললাম, আশুরায় সিয়াম পালন সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, মুহাররমের চাঁদ দেখলে যথারীতি পানাহার চালিয়ে যাও, তবে নয়ই মুহাররম সিয়াম পালন কর। তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও কি তাই করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এমনটিই তিনিই করতেন।'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন।[১] ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ও দ্বিতীয়[২] ও তৃতীয়[৩] হাদীসদুটো বর্ণনা করেছেন।

এক বর্ণনায় হাদীসটি ইমাম রাযীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন,

[٤] عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ، يَقُوْلُ: «صُوْمُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ».

'(৩) আতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত (আবদুল্লাহ ইবনে) আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, ইহুদিদের বিরোধিতা করে তোমরা নয় ও দশই মুহাররমে সিয়াম পালন কর।'[৪]

وَعَنْ حَفْصَةَ ﷺ، قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَّمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَّرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

'হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আশুরা, শাওয়ালের দশ দিন, প্রতিমাসে তিন দিনের সিয়াম পালন এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকাআত সালাত—এই চার আমল হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো ছাড়েননি।'

হাদীসটি ইমাম আন-নাসায়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন।[৫]

[١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৭, হাদীস: ১৩২ (১১৩৩)

[২] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৭, হাদীস: ২৪৪৫

[৩] আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩২৭, হাদীস: ২৪৪৬

[৪] (ক) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৪, পৃ. ৪৭৫, হাদীস: ৮৪০৪; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩১৩—৩১৪, হাদীস: ৪৪৫২

[৫] (ক) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২২০, হাদীস: ২৪১৬; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩১৫, হাদীস: ৪৪৫৩

رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ».

'(১) হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'রামাযানের সিয়ামের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের সিয়ামই মর্যাদাপূর্ণ এবং পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর রাতের সালাত (তাহাজ্জুদই) অধিক মর্যাদাপূর্ণ।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বলেন,

[٢] سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وَأَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ».

'(২) জিজ্ঞাসা করা হলো, ফরয সালাতের পর কোন সালাত সর্বোত্তম? (নবী করীম ﷺ জবাবে) ইরশাদ করেছেন, 'রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ)।' আর রামাযানের সিয়ামের পর কোন সিয়াম সর্বোত্তম? (নবী করীম ﷺ জবাবে) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর মাস মুহাররমের সিয়াম।"

হাদীসটি ইমাম মুসলিম ﷺ ও ইমাম আবু দাউদ ﷺ বর্ণনা করেছেন।[১] আর ইমাম আত-তিরমিযী ﷺ ও ইমাম আন-নাসায়ী ﷺ প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هَذَا، إِلَّا رَجُلًا سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ تَعَالَىٰ، فِيْهِ يَوْمٌ تَابَ فِيْهِ عَلَىٰ قَوْمٍ، وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِيْنَ».

---

[১] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮২১, হাদীস: ২০২ ও ২০৩ (১১৬৩); (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ২৪২৯

[২] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৮, হাদীস: ৭৪০; (খ) আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২০৬, হাদীস: ১৬১৩; (গ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ২৭৩, হাদীস: ৬৮৭৮

'হযরত আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, রামাযানের পর কোন্ মাসে আপনি সিয়াম পালনে আমাকে নির্দেশ দেবেন? তিনি তাকে বললেন, জনৈক ব্যক্তিকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, তিনি আমার সম্মুখেই হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাহে রামাযানের পর কোন্ মাসে আপনি সিয়াম পালনে আমাকে নির্দেশ দেবেন? তিনি ইরশাদ করেন, 'মাহে রামাযানের পর যদি তুমি কোনো সিয়াম পালন চাও তাহলে মুহাররমের সিয়াম পালন কর। কেননা এটি মহান আল্লাহর মাস, এ-মাসে তিনি একটি সম্প্রদায়কে ক্ষমা করেছিলেন এবং এ-মাসেই তিনি অন্যান্য জাতির ক্ষমাপ্রার্থনাও মঞ্জুর করেন।''

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী رحمه الله বর্ণনা করেছেন।[১]

এ-পর্যন্ত সবগুলো হাদীস হাদীসের বিখ্যাত ছয় গ্রন্থে এসেছে, যা *জামিউস উসুলে* সংকলিত। এরপর আমরা আরও কিছু হাদীস সংকলন করছি যা উল্লিখিত হয়েছে সাইয়েদ মাওলানা আরিফ বিল্লাহ শায়খ আলী আল-মুত্তাকী رحمه الله প্রণীত *জামিউল কবীরে*; এটি তিনি সংকলন এবং অধ্যায়-বিন্যাসে সাজিয়েছেন ইমাম আস-সুয়ূতী رحمه الله-এর *জামউল জাওয়ামি'* থেকে। সেখানে ভিন্নসূত্রে সিহাহ সিত্তার হাদীসগুলোও এসেছে। যেহেতু সেসব সিহাহ সিত্তার বরাতে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানে আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। হে আল্লাহ! অবশ্য *জামিউল উসূলে* এড়িয়ে যাওয়া ভিন্ন শব্দের এবং পুনরুল্লেখিত নতুন হাদীসগুলো আমরা এখানে আলোচনা করবো। যথা—

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ تَعَالَىٰ، فِيْهِ يَوْمٌ تَابَ فِيْهِ عَلَىٰ قَوْمٍ، وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِيْنَ».

'হযরত আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, 'মাহে রামাযানের পর যদি তুমি কোনো সিয়াম পালন চাও তাহলে মুহাররমের সিয়াম পালন কর। কেননা এটি মহান আল্লাহর মাস, এ-মাসে তিনি এক সম্প্রদায়ের

[১] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৮–১০৯, হাদীস: ৭৪১; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ২৭৩, হাদীস: ৬৮৭৯

তওবা কবুল করেছিলেন এবং এ-মাসেই তিনি অন্যান্য জাতির ক্ষমাপ্রার্থনাও কবুল করেন।'

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَخَالِفُوْا فِيْهِ الْيَهُوْدَ، وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا وَّبَعْدَهُ يَوْمًا».

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন কর, তবে ইহুদিদের বিরোধিতায় তার একদিন আগে ও পরে সিয়াম পালন কর।''

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল) বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَئِنْ بَقَيْتُ أَمَرْتُ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ وَيَوْمٍ بَعْدَهُ يَعْنِيْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ».

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আশুরা-দিবসের একদিন আগে ও পরে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেবো।''

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী *শুআবুল ঈমানে* বর্ণনা করেছেন।[৩]

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، «صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَهُوَ يَوْمٌ كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ تَصُوْمُهُ، فَصُوْمُوْهُ».

'হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, 'তোমরা আশুরা-দবসে সিয়াম পালন কর; এ-দিন আম্বিয়ায়ে কেরাম সিয়াম পালন করতেন, তাই তোমরাও সিয়াম পালন কর।''

---

[১] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৮–১০৯, হাদীস: ৭৪১; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৪৪১, হাদীস: ১৩২২ ও পৃ. ৪৪৭–৪৪৮, হাদীস: ১৩৩৫; (গ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩২১, হাদীস: ৩৪৭৯

[২] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৫২, হাদীস: ২১৫৪; (খ) আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৩০, হাদীস: ৩৫১১

[৩] আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৩০, হাদীস: ৩৫১০

হাদীসটি ইমাম ইবনে আবু শায়বা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ عِيْدُ مَنْ قَبْلَكُمْ، فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ».

'তাঁর (হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) থেকে আরও বর্ণিত আছে, আশুরা-দিবস ছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের ঈদ-দিবস; এই দিনে তাই তোমরা সিয়াম পালন কর।'

হাদীসটি ইমাম আল-বায্যার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম আদ-দায়লমী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ شَهْرِ الْحَرَامِ: الْخَمِيْسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ، كُتِبَ لَهُ عِبَادَةُ سَنَتَيْنِ».

'হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুহার্‌রম মাসের বৃহস্পতি, জুমুআ ও শনিবার এই তিনদিন সিয়াম পালন করবে তার জন্য দুই বছরের ইবাদতের সওয়াব লেখা হবে।'[৩]

وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ».

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'আগামী বছরও আমি মুহার্‌রমের নবম দিবসে সিয়াম পালন করবো।''[৪]

وَعَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنْ عِشْنَا خَالَفْنَاهُمْ، وَصُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ».

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'আমি বেঁচে থাকলে

---

[১] ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ২, পৃ. ৩১১, হাদীস: ৯৩৫৫

[২] (ক) আল-বায্যার, *আল-বাহরুয যাখ্খার*, খ. ১৭, পৃ. ১৮৫, হাদীস: ৯৮১৩; (খ) আদ-দায়লামী, *আল-ফিরদাউস বি-মাসূরিল খিতাব*, খ. ৫, পৃ. ৫৩০, হাদীস: ৮৯৮৯

[৩] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ২, পৃ. ২১৯, হাদীস: ১৭৮৯

[৪] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৭, হাদীস: ২৪৪৫

তাদের (ইহুদিদের) বিরুদ্ধাচরণে মুহাররমের নবম দিবসেও সিয়াম পালন করবো।'[1]

وَعَنِ ابْنِ عَمَرٍو ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الزِّيْنَةِ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ مِنْ صِيَامِ السَّنَةِ» يَعْنِيْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি উৎসবের দিনে অর্থাৎ আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করে সে যেন সারা বছরের হারানো সিয়াম ফিরে পেলো।'[2]

ইমাম আবুশ শায়খ (আল-আসবাহানী) *আস-সাওয়াব* গ্রন্থে বর্ণনা করেন, (হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন,

«إِنَّ نُوْحًا هَبَطَ مِنَ السَّفِيْنَةِ عَلَى الْجُوْدِيِّ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَصَامَ نُوْحٌ، وَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ بِصِيَامِهِ شُكْرًا لله، وَفِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ تَابَ اللهُ عَلَىٰ آدَمَ، وَعَلَىٰ أَهْلِ مَدِيْنَةِ يُوْنُسَ، وَفِيْهِ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، وَفِيْهِ وُلِدَ إِبْرَاهِيْمُ وَابْنُ مَرْيَمَ ﵉».

'আশুরা-দিবসে হযরত নূহ-এর কিশতি জুদি পাহাড়ে গিয়ে ঠেকে। প্লাবন থেকে মুক্তির কৃতজ্ঞতা হিসেবে হযরত নূহ এ-দিবসে নিজে সিয়াম পালন করেন এবং তাঁর সহচরদেরও সিয়াম পালনে নির্দেশ দেন। আশুরা-দিবসেই আল্লাহ হযরত আদম ও হযরত ইউনুস-এর গোত্রের তওবা মনজুর করেন। এ দিবসেই আল্লাহ বনী ইসরাইলের জন্য নদীর বুকে রাস্তা তৈরি করে দেন এবং হযরত ইবরাহীম ও হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম জন্মগ্রহণ করেন।'[3]

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَسَّعَ عَلَىٰ عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، لَمْ يَزَلْ فِيْ سَعَةٍ سَائِرَ سَنَةٍ».

---

[1] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১১, পৃ. ১৩০, হাদীস: ১১২৬

[2] আলী আল-মুত্তাকী, *কনযুল উম্মাল*, খ. ৮, পৃ. ৫৭৬, হাদীস: ২৪২৫৫

[3] আলী আল-মুত্তাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ৫৭৬, হাদীস: ২৪২৫৬

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'আশুরা-দিবসে যে ব্যক্তি তার পরিবারে খাবারে সুব্যবস্থা করে সারা বছর সে স্বচ্ছলতায় কাটাবে।'[১]

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ، «سَيِّدُ النَّاسِ آدَمُ، وَسَيِّدُ الْعَرَبِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَسَيِّدُ الرُّوْمِ صُهَيْبٌ، وَسَيِّدُ الْفُرْسِ سَلْمَانُ، وَسَيِّدُ الْحَبْشَةِ بِلَالٌ، وَسَيِّدُ الْجِبَالِ طُوْرُ سِيْنَاءَ، وَسَيِّدُ الشَّجَرَةِ السِّدْرَةُ، وَسَيِّدُ الْأَشْهُرِ مُحَرَّمٌ، وَسَيِّدُ الْأَيَّامِ الْجُمُعَةُ، وَسَيِّدُ الْكَلَامِ الْقُرْآنُ، وَسَيِّدُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ، وَسَيِّدُ الْبَقَرَةِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، أَمَا إِنَّ فِيْهَا خَمْسَ كَلِمَاتٍ؛ فِيْ كُلِّ كَلِمَةٍ خَمْسُوْنَ بَرَكَةً».

'হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মানবজাতির নেতা হলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম, আরবের নেতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ, রোমের নেতা হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু, পারস্যের নেতা হযরত সালমান (আল-ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবিশিনিয়ার নেতা হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, পাহাড়ের সরদার হলো সিনাই পর্বত, বৃক্ষরাজির সরদার হলো সিদরাতুল মুনতাহা, মাসের মধ্যে প্রধান হলো মুহাররম, দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জুমাআ, আল্লাহর কালামসমূহের শ্রেষ্ঠ কুরআন, কুরআনের মধ্যে সুরা আল-বাকারা, সুরা আল-বাকারার ভেতর উত্তম হলো আয়াতুল কুরসী। উল্লেখ্য যে, আয়াতুল কুরসীতে পাঁচটি বিশেষ বরকতপূর্ণ শব্দ রয়েছে।'

হাদীসটি ইমাম আদ-দায়লমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *মুসনদুল ফিরদাওসে* বর্ণনা করেছেন।[২] বর্ণনাটি দুর্বল।

অধমের[৩] বক্তব্য হচ্ছে, এ-প্রসঙ্গে অন্য হাদীসে এসেছে যে, 'রামাযান মাসই সর্বশ্রেষ্ঠ মাস।' যেমন– ইমাম আত-তাবরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيْلُ، وَأَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَأَفْضَلُ الشُّهُوْرِ شَهْرُ

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১০, পৃ. ৭৭, হাদীস: ১০০০৭
[২] আদ-দায়লামী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৪২, হাদীস: ৩৪৭১
[৩] কিতাবের লেখক শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

رَمَضَانَ، وَأَفْضَلُ اللَّيَالِيْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَأَفْضَلُ النِّسَاءِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ».

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'আমি তোমাদের অবহিত করবো না, ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিবরাইলই (আলাইহিস সালাম) হলেন শ্রেষ্ঠ, দিনে জুমাআ হলো শ্রেষ্ঠ দিবস, মাসের মধ্যে রামাযান হলো শ্রেষ্ঠ মাস, রাতসমূহে লায়লাতুল কদর শ্রেষ্ঠ রাত এবং নারীকুলের শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মরয়াম (আলাইহাস সালাম)।''[১]

হে আল্লাহ! তিনিই জানেন, এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাস্তরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অতএব তা বুঝতে হবে। আল্লাহ সহায় হোন।

পবিত্র মক্কা নগরীর মুফতী, শীর্ষ ফিকহ ও হাদীস-বিশারদ শায়খ শাহাবউদ্দীন ইবনে হাজর আল-হায়সমী আল-মিসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর *আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা* গ্রন্থে আশুরা প্রসঙ্গে বলেছেন,

মনে রাখতে হবে যে, আশুরা-দিবসে হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে যে-দুঃখজনক ঘটনা ঘটে তা নিশ্চতই শাহাদাত। এটি আল্লাহর দরবারে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং পবিত্রাত্মা আহলে বায়তের উন্নত মর্যাদার প্রমাণ। তাই আশুরা-দিবসে তাঁর (হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেই) দুঃখজনক ঘটনার আলোচনা করে তার জন্য আল্লাহর আদেশ অনুসরণে এবং সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ইসতিরজা' (প্রত্যাবর্তন-বাণী: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝) পাঠে নিমগ্ন হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

'তারা সেসব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়তপ্রাপ্ত।'[২]

আশুরা-দিবসে দুআটি পাঠ এবং অনুরূপভাবে প্রধান ইবাদত হিসেবে সিয়াম পালন ব্যতীত আর কোনো কাজ করবে না। খবরদার! রাফিযীদের বিদআতি প্রথা যেমন– হা-হুতাশ, কান্নাকাটি ও শোক পালন থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। কারণ এসব মুমিনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মোটেও সম্পর্কিত নয়। নতুবা এটি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াফাত-দিবস সম্পর্কে অধিকতর সমীচিন ও যুক্তিযুক্ত ছিলো।

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১১, পৃ. ১৬০, হাদীস: ১১৩৬১

[২] আল-কুরআন, *আল-বাকারা*, ২:১৫৭

এ ছাড়া আহলে বায়তদের নিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত খারেজি ও সেসব মুর্খদের বিদআত থেকেও দূরত্ব বজায় রাখবে যারা ধ্বংস দিয়ে ধ্বংসকে, বিদআতকে বিদআত দিয়ে এবং একটা মন্দের মাধ্যমে আরেকটা মন্দকে মুকাবিলা করতে চায়; আনন্দ-উৎসব পালন, আশুরা-দিবসকে ঈদে রূপায়ন, এ দিনে চুলে কলপ, চোখে সুরমা ও নতুন পোষাক পরে বিশেষভাবে সাজসজ্জায় মেতে ওঠা, প্রাণখুলে ব্যয় এবং সাধারণ অভ্যাসের চেয়ে উন্নত খাবার পরিবেশন ও রকমারী খিচুড়ি রান্না করে। তাদের বিশ্বাস মতে এসব আবহমানকালের লালিত ঐতিহ্য ও সুন্নাত। অথচ এ জাতীয় মনগড়া কর্মকা-বর্জন করাই হচ্ছে সুন্নাত। কেননা এসব কাজের সমর্থনে নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা নেই এবং কোনো প্রামাণ্য কোনো সূত্রও নেই। আশুরা-দিবসে চোখে সুরমা ব্যবহার, গোসল, মেহদি লাগানো, খিচুড়ি পাকানো, নতুন কাপড়-চোপড় পরা এবং উৎসব পালন প্রসঙ্গে বহু হাদীস ও ফিকহবিশারদদের মতামত চাওয়া হলে তাঁরা বলেছেন, এসবের পক্ষে নবী করীম ﷺ-এর কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এমনকি তাঁর কোনো সাহাবী থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। মুসলমানদের চার ইমাম ও অন্য কেউই এসব কাজকে পছন্দ করেননি। প্রামাণ্য কোনো কিতাবে এহেন কর্মকা-ের সমর্থনে বিশুদ্ধ বা দুর্বল কোনো বর্ণনাই পাওয়া যায় না।

আর যেসব বর্ণনায় এসেছে (যেমন–),

«إِنَّ مَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَرْمَدْ ذَلِكَ الْعَامَ».

'নিশ্চয় যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে চোখে সুরমা লাগাবে ওই বছর সে চোখ-উঠা রোগে আক্রান্ত হবে না।'[১]

«وَمَنِ اغْتَسَلَ لَمْ يَمْرَضْ».

'(আশুরা-দিবসে) যে-ব্যক্তি গোসল করবে সে অসুস্থ হবে না।'[২]

অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে,

«وَمَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِيْهِ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ».

'(আশুরা-দিবসে) যে-ব্যক্তি পরিবারে উন্নত খাবারের আয়োজন করে আল্লাহ তাকে সারা বছর স্বচ্ছলতায় রাখবে।'[১]

---

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ৩৫১৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত

[২] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ২, পৃ. ২০১; (খ) ইবনে ইরাক, *তানযীহুশ শরীয়া*, খ. ২, পৃ. ১১৫, বর্ণনা: ১৭

অনুরূপভাবে এ-দিবসে সালাত আদায়ের মর্যাদা, এ-দিবসে হযরত আদম (আ.)-এর তওবা, (হযরত নূহ (আ.)-এর) নৌকা জুদি পাহাড়ে গিয়ে ঠেকা, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর (নমরূদের) আগুন থেকে মুক্তি, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ভেড়াপন দিয়ে হযরত ইসমাইল (আ.)-কে আত্ম-উৎসর্গ থেকে মুক্তি এবং হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রত্যাবর্তনের মতো অনেক বর্ণনা রয়েছে, যার সবই বানোয়াট। অবশ্য পরিবারের জন্য উন্নত খাবারের ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক হাদীটি (বানোয়াট না হলেও) এর সূত্র-বিশ্বস্ততা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বস্তুত মূর্খরা নিজেদের মূর্খামির কারণে এ-দিবসকে উৎসবে পরিণত করেছে। অন্যদিকে রাফিযিরা তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শগত কারণে এ-দিবসকে শোকদিবসে হিসেবে বেছে নিয়েছে। কাজেই এই উভয় সম্প্রদায় ভ্রান্ত এবং তাদের এসব কর্মকা- সুন্নাহর পরিপন্থী। একথা অধিকাংশ হাদীসবিশারদ ঐকমত্যের সাথে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আল-হাকিম (রহ.) হাদীসের উদ্ধৃতি-সহকারে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, আশুরা-দিবসে সুরমা লাগানো বিদআত,

«إِنَّ مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، لَمْ تَرْمَدْ عَيْنُهُ أَبَدًا».

'নিশ্চয় যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে চোখে ইসমদ সুরমা লাগাবে তার চোখ কখনো চোখ-উঠা রোগে আক্রান্ত হবে না।'

তবে তিনি বলেন, এসব বর্ণনা সর্বৈব বানোয়াট। এ-কারণে বর্ণনাটি ইমাম ইবনুল জওযী (রহ.) তাঁর *মওযূআতে* ইমাম আল-হাকিম (রহ.)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন।[2] অন্যান্য হাদীসবিশারদগণ ভিন্ন সূত্রেও এটি বর্ণনা করেছেন। অভিধানিক ইমাম মাজদউদ্দীন (আল-ফীরূযাবাদী (রহ.)) ইমাম আল-হাকিম (রহ.)-এর বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, 'এ-দিবসে সিয়াম-পালন ব্যতীত অন্য সব কাজ যেমন– সালাত, ব্যয়, চুলে কলপ, মাথায় তেল লাগানো, চোখে সুরমা ব্যবহার ও খিচুড়ি রান্নার মর্যাদা-বিষয়ক যাবতীয় হাদীস সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।'

এ-প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাইয়িম (আল-জওযিয়া (রহ.))ও স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আশুরা-দিবসে সুরমা, তেল ও সুগন্ধি ব্যবহারের বর্ণনাগুলো মিথ্যাবাদীদের বানানো।'

---

[1] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৩২, হাদীস: ৩৫১৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত

[2] ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ২, পৃ. ২০৩–২০৪

এখানে মূল বিতর্ক সুরমা ব্যবহার (ইত্যাদি)-কে আশুরা-দিবসকে ঘিরে বিশেষভাবে করা নিয়ে। অবশ্য এ-দিবসে স্বচ্ছলতা বিষয় পূর্বে বর্ণিত বর্ণনার কিছুটা ভিত্তি আছে। হাফিযুল ইসলাম জায়নুদ্দীন আল-ইরাকী তাঁর *আমালীতে* ইমাম আল-বায়হাকী-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

«مَنْ وَسَّعَ عَلَىٰ عِيَالِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ».

'আশুরা-দিবসে যে-ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনে উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করে আল্লাহ সারা বছর তার জন্য স্বচ্ছলতার ব্যবস্থা করে থাকেন।'[১]

হাদীসটি বর্ণনা করার পর তিনি বলেছেন, এর বর্ণনাসূত্রে ত্রুটি রয়েছে। তা সত্ত্বেও ইমাম ইবনে ইবনে হিব্বান-এর মতে হাদীসটি হাসান পর্যায়ভুক্ত। এর অন্য একটি সূত্রও আছে; যাকে হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে নাসির বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য করেছেন। অবশ্য তাতে অতিরিক্ত কিছু অংশ রয়েছে যা বানোয়াট।

ইমাম আল-বায়হাকী-এর স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে যে, ইমাম ইবনে হিব্বান-এর মতামত ছাড়াও জীবিকাবৃদ্ধির-বিষয়ক হাদীসটি হাসান। কেননা তিনি এ-হাদীসটি একদল সাহাবায়ে কেরাম থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যদিও এর সবগুলো সূত্র দুর্বল, তবে বর্ণনাগুলো পরস্পর একত্র করা হলে তা শক্তিশালী রূপলাভ করে।[২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, জীবিকায় স্বচ্ছলতা বিষয়ে নবী করীম ﷺ থেকে কোনো হাদীসই বর্ণিত হয়নি। তাঁর এ-অস্বীকৃতি উপর্যুক্ত সংশয় থেকেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-এর বক্তব্য হচ্ছে, হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়[৩] অর্থাৎ মূলত (এটি বিশুদ্ধ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত নয়)। তবে এতে করে হাদীসটি হাসান লি গায়রিহি হতে বাধা থাকে না। আর হাসান লি গায়রিহি হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য, এটি হাদীসশাস্ত্রের প্রমাণতত্ত্বের একটি নীতি। এখানে ইমাম ইবনে হাজর আল-হায়সমী-এর বক্তব্য সমাপ্ত।[৪]

---

[১] আল-ইরাকী, *আত-তাওয়াস্সুআতু আলাল ইয়াল*, পা-লিপি, পৃ. ৫

[২] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ৩৫১৫

[৩] ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া, *আল-মানারুল মুনীফ*, পৃ. ১১১–১১২, বর্ণনা: ২২৩

[৪] ইবনে হাজর আল-হায়সামী, *আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা*, খ. ২, পৃ. ৫৩৩–৫৩৬

শায়খ মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিরচিত *মাকাসিদুল হাসানা* গ্রন্থে এক হাদীসে এসেছে,

«مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، لَمْ تَرْمَدْ عَيْنُهُ أَبَدًا».

'আশুরা-দিবসে যে-ব্যক্তি চোখে পাথুরে সুরমা লাগাবে আজীবন তার চোখ রোগাক্রান্ত হবে না।'

হাদীসটি ইমাম আল-হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও *শুআবুল ঈমানের* ২৩ অধ্যায়ে ইমাম আল-বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।[১] ইমাম আদ-দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জুওয়াবির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি হযরত আয-যাহ্হাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মরফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আল-হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এটি প্রত্যাখ্যাত, বরং বনোয়াট একটি বর্ণনা। এ-কারণে হাদীসটি ইমাম ইবনুল জওযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর *আল-মওযূআতে* সংকলন করেছেন।[২] হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনাটির একটি বিতর্কিত সূত্র রয়েছে। (সূত্রটি বিতর্কিত হওয়ার কারণ হচ্ছে,) এতে একজন আহমদ ইবনে মনসূর আশ-শূনীযী রয়েছেন, তিনি হাদীসে মনগড়া কথা সংযোজন করে বলে অভিযোগ রয়েছে। শায়খ মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য এখানে সমাপ্ত।[৩]

আরও এক হাদীসে আছে,

«مَنْ وَسَّعَ عَلَىٰ عِيَالِهِ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ السَّنَةَ كُلَّهَا».

'যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে নিজের সন্তান-সন্ততিকে ভালো খাবার খাইয়েছে; আল্লাহ সারা বছর তাকে স্বচ্ছলতায় রাখবেন।'

হাদীসটি ইমাম আত-তাবরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[৪], ইমাম আল-বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *শুআবুল ঈমান* ও *ফাযায়িলুল আওকাতে*[৫] এবং ইমাম আবুশ শায়খ (আল-আসবাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। প্রথম দু'জন হাদীসটি হযরত আবু সাঈদ (আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই কেবল বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে *শুআবুল ঈমানে* শুধু হযরত জাবির

---

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ৩৫১৭

[২] ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ২, পৃ. ২০৩

[৩] আস-সাখাওয়ী, *আল-মাকাসিদুল হাসানা*, পৃ. ৬৩২–৬৩৪, হাদীস: ১০৮৫

[৪] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৯, পৃ. ১২১, হাদীস: ৯৩০২

[৫] (ক) আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ৩৫১৪; (খ) আল-বায়হাকী, *ফাযায়িলুল আওকাত*, পৃ. ৪৫৩, হাদীস: ২৪৫

(ইবনে আবদুল্লাহ)[১] ও হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। শেষে তিনি বলেছেন, এর সবগুলো সূত্রই দুর্বল; তবে হাদীসগুলো পরস্পর মিলিয়ে নিলে এতে সবলতা সৃষ্টি হয়ে যায়।[২]

হাফিয আল-ইরাকী তাঁর *আমালীতে* বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসটি আরও অনেকের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার অনেকগুলোকে হাফিয ইবনে নাসির বিশুদ্ধ বলে মত পেশ করেন।[৩] তবে ইমাম ইবনুল জওযী হাদীসটিকে সুলায়মান ইবনে আবু আবদুল্লাহর সূত্রে তাঁর *আল-মওযূআতে* গ্রন্থভূত করেছেন। তিনি বলেন, সুলাইমান একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারী।[৪] অবশ্য ইমাম ইবনে হিব্বান সুলাইমানকে তাঁর *আস-সিকাত* গ্রন্থে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। তাঁর মতে হাদীসটি হাসান। তিনি বলেন, এর অন্য আরেকটি সূত্র রয়েছে, হযরত জাবির (ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে; যাতে ইমাম মুসলিম -এর শর্ত (হাদীস সংকলনের নীতি) অনুসৃত হয়েছে। ইবনে আবুয যুবায়রের বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি ইমাম ইবনে আবদুল বর তাঁর *আল-ইসতীআব* বর্ণনা করেছেন।[৫] হাদীসটির এ-সূত্রটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ইমাম আদ-দারাকুতনী ও তাঁর *আল-ইফরাদ* গ্রন্থে এটি হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব)-এর ওপর মওকুফ একটি শক্তিশালী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আল-বায়হাকী তাঁর *শুআবুল ঈমানে* হাদীসটি হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাশির -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (শায়খ মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী) বলবো, এ হাদীসের সত্যায়নের ব্যাপারে আমার শায়খ বেশ শক্ত জবাবদিহিতা আরোপ করেছেন, যা এখানে আলোচনা করছি না।

ইমাম ইবনুল জওযী তাঁর *আল-মওযূআত* গ্রন্থে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ ()-এর হাদীসের বর্ণনাকারী হায়সাম ইবনে শাদ্দাখের ব্যাপারে ইমাম আল-উকায়লী ()-এর বক্তব্যের সাথে একমত হয়েছেন যে, তিনি একেবারেই অজ্ঞাত।[৬] অবশ্য ইমাম ইবনে হিব্বান ()

---

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৩১, হাদীস: ৩৫১২

[২] আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ৩৫১৫

[৩] আল-ইরাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

[৪] (ক) আল-উকায়লী, *আয-যুআফাউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৬৫, হাদীস: ১৬১৮; (খ) ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ২, পৃ. ২০৩

[৫] ইবনে আবদুল বারর, *আল-ইসতিযকার*, খ. ৩, পৃ. ৩৩১, হাদীস: ৬২৩

[৬] (ক) আল-উকায়লী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৫২, হাদীস: ১২৫৩; (খ) ইবনুল জওযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২০৩

তাকে বিশ্বস্ত ও দুর্বল বলে উল্লেখ করেন।[১] এখানে শায়খ মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী -এর বক্তব্য সমাপ্ত হয়েছে।[২]

পবিত্র নগরী মদীনার যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ইমাম হাফিয আল্লামা শায়খ আলী মুহাম্মদ ইবনুল ইরাক তাঁর *তানযীহুশ শরীয়া ফীল আহাদীসিল মাওযূআয়* একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন,

«مَنْ صَامَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِّنْ أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ بَنَى اللهُ لَهُ قُبَّةً فِي الْهَوَاءِ مِيْلًا فِيْ مِيْلٍ لَّهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ».

'যে-ব্যক্তি ১ থেকে ৯ মুহাররম পর্যন্ত সিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার জন্য চার দরজা-বিশিষ্ট একটি পরিবহন তৈরি করবেন যা গতি মুহূর্তে চার মাইল।'

হাদীসটি ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী) হযরত আনাস (ইবনে মালিক) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণনাকারীদের একজন মুসা আত-তাওয়ীল রয়েছেন, তিনি হাদীসশাস্ত্রে বিপজ্জনক (হিসেবে নিন্দিত)।[৩]

আরও একটি হাদীসে এসেছে,

«مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ كَتَبَ اللهُ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّيْنَ سَنَةً بِصِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ أُعْطِيَ ثَوَابَ عَشَرَةِ آلَافِ مَلَكٍ، وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ أُعْطِيَ ثَوَابَ أَلْفِ حَاجٍّ وَّمُعْتَمِرٍ، وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ أُعْطِيَ ثَوَابَ عَشَرَةِ آلَافِ شَهِيْدٍ، وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ جَائِعًا فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ جَمِيْعَ فُقَرَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَأَشْبَعَ بُطُوْنَهُمْ، وَمَنْ مَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِ يَتِيْمٍ رُفِعَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَىٰ رَأْسِهِ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَخَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَالْأَرْضَ كَمِثْلِهِ، وَخَلَقَ الْقَلَمَ يَوْمَ

---

[১] ইবনে হিব্বান, *আল-মজরূহীন*, খ. ৩, পৃ. ৯৭, ক্রমিক: ১১৭৪
[২] আস-সাখাওয়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৪–৬৭৫, হাদীস: ১১৯৩
[৩] ইবনে ইরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৪৮, ক্রমিক: ১৫

عَاشُوْرَاءَ واللَّوْحَ كَمِثْلِهِ، وَخَلَقَ جِبْرِئِلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَالْـمَلَائِكَةَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَخَلَقَ آدَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَوُلِدَ إِبْرَاهِيْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَنَجَّاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَفَدَىٰ إِسْمَاعِيْلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَغَرِقَ فِرْعَوْنُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَرُفِعَ إِدْرِيْسُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَتَابَ اللهُ عَلَىٰ آدَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَغُفِرَ ذَنْبُ دَاوُدَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَاسْتَوَى الرَّبُّ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَتَقُوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ».

'যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার জন্য ষাট বছরের ইবাদত লিখে দেবেন; তাতে সিয়ামব্রত ও রাতে ইবাদত পালনও অন্তর্ভুক্ত। যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তাকে দশ সহস্র ফেরেশতার ইবাদতের সওয়াব দেবেন। যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তাকে হাজারো হজ-ওমরার সওয়াব দেবেন। যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তাকে দশ সহস্র শহীদের সওয়াব দেবেন। যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তাকে সপ্তআসমানের সমপরিমাণ সওয়াব লিখে দেবেন। যে-ব্যক্তি ১০ মুহার্‌রম কোনো ক্ষুধার্তকে খাওয়ালো সে যেন উম্মতে মুহাম্মদীর সমস্ত ক্ষুধা-দারিদ্র্যপীড়িতদেরকে তৃপ্ত করে আহার করালো। যে-ব্যক্তি (এ-দিবসে) কোনো অনাথের মাথায় হাত রাখলো তার হাতে নিচের প্রতিটি চুলের বিনিময়ে বেহেশতে তার স্তর উন্নতি হবে। আশুরা-দিবসে আল্লাহ নভো ও ভূম-ল সৃষ্টি করেছেন। আশুরা-দিবসে আল্লাহ লাওহ (মহাশিলালিপি) ও কলম সৃষ্টি করেছেন। আশুরা-দিবসে আল্লাহ জিবরাইল এবং আশুরা-দিবসেই ফেরেশতাকুলকে সৃষ্টি করেছেন। আশুরা-দিবসে (আল্লাহ) হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন। আশুরা-দিবসে (আল্লাহ) হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেন এবং আশুরা-দিবসেই আল্লাহ তাঁকে (নমরুদের) আগুন থেকে মুক্তি দেন। আশুরা-দিবসে (আল্লাহ) হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবর্তে যবেহের জন্য ভেড়া মুক্তিপন পাঠিয়েছেন। আশুরা-দিবসে (আল্লাহ) ফিরআওনকে নদীতে ডুবিয়ে দেন। আশুরা-দিবসে (আল্লাহ) হযরত ইদরীস (আলাইহিস সালাম)-কে মর্যাদায় উন্নীত করেন। আশুরা-

দিবসে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)-এর তওবাও কবুল করেন। আশুরা-দিবসে (আল্লাহ) হযরত দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করেছেন। আশুরা-দিবসে আল্লাহ আরশে সমাসীন হন। আশুরা-দিবসেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।'

বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট[১]। বর্ণনাটি হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে ইমাম ইবনুল জওযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর *আল-মওযূআত* গ্রন্থে) উল্লেখ করেছেন।[২] এতে একজন হাবীব ইবনে আবু হাবীব রয়েছেন, যিনি হাদীসশাস্ত্রের জন্য বিপজ্জন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত।[৩]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَىٰ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ صَوْمَ يَوْمٍ فِي السَّنَةِ؛ وَهُوَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ، فَصُوْمُوْا وَوَسِّعُوْا عَلَىٰ أَهْلِيْكُمْ فِيْهِ، فَإِنَّ مَنْ وَسَّعَ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْ مَالِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ، فَصُوْمُوْهُ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِيْ تَابَ اللهُ فِيْهِ عَلَىٰ آدَمَ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ رَفَعَ اللهُ فِيْهِ إِدْرِيْسَ مَكَانًا عَلِيًّا، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ نَجَّى اللهُ فِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ مِنَ النَّارِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ أَخْرَجَ فِيْهِ نُوْحًا مِّنَ السَّفِيْنَةِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ أَنْزَلَ اللهُ فِيْهِ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوْسَىٰ، وَفِيْهِ فَدَى اللهُ إِسْمَاعِيْلَ مِنَ الذَّبْحِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ أَخْرَجَ اللهُ يُوْسُفَ مِنَ السِّجْنِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ رَدَّ اللهُ عَلَىٰ يَعْقُوْبَ بَصَرَهُ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَشَفَ اللهُ فِيْهِ عَنْ أَيُّوْبَ الْبَلَاءَ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ أَخْرَجَ اللهُ فِيْهِ يُوْنُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ فَلَقَ اللهُ فِيْهِ الْبَحْرَ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ غَفَرَ اللهُ فِيْهِ لِمُحَمَّدٍ ذَنْبَهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، وَفِيْ هَذَا الْيَوْمِ عَبَرَ مُوْسَىٰ

---

[১] উল্লেখিত অভিমত হাদীসটির বর্ণনার বিষয়ে। এখানে কিছু বিষয় এমনও আছে, যেগুলো অন্য সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। যেমন- ফেরআউন ও তার দলকে ডুবিয়ে মারা।

[২] ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ২, পৃ. ২০২-২০৩

[৩] ইবনে ইরাক, *তানযীহ*, খ. ২, পৃ. ১৪৯, কানা: ১৫

الْبَحْرَ، وَفِي هَذَا الْيَوْمِ أَنْزَلَ اللهُ التَّوْبَةَ عَلَىٰ قَوْمِ يُونُسَ؛ فَمَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ كَانَ لَهُ كَفَّارَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَأَوَّلُ يَوْمٍ خَلَقَ اللهُ مِنَ الدُّنْيَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَأَوَّلُ يَوْمٍ نَزَلَ الْمَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ عَاشُوْرَاء، فَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ؛ وَهُوَ صَوْمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ عَاشُوْرَاءَ فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللهَ مِثْلَ عِبَادَةِ أَهْلِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَمَنْ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۝ ﴾ [الفاتحة] مَرَّةً وَخَمْسِيْنَ مَرَّةً ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ ﴾ [الإخلاص] غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَ خَمْسِيْنَ عَامًا مَاضِيَةً وَخَمْسِيْنَ عَامًا مُسْتَقْبَلَةً وَبَنَى اللهُ لَهُ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ أَلْفَ مِنْبَرٍ مِنْ نُوْرٍ، وَمَنْ سَقَىٰ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ فَكَأَنَّمَا لَمْ يَعْصِ اللهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ أَهْلَ بَيْتِ مَسَاكِيْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَكَأَنَّمَا لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا قَطُّ، وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ، وَمَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ لَمْ تَرْمَدْ عَيْنَاهُ السَّنَةَ كُلَّهَا، وَمَنْ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِ يَتِيْمٍ فَكَأَنَّمَا بَرَّ يَتَامَىٰ وَلَدِ آدَمَ كُلِّهِمْ، وَمَنْ عَادَ مَرِيْضًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَكَأَنَّمَا عَادَ مَرْضَىٰ وَلَدِ آدَمَ كُلِّهِمْ».

'নিশ্চয় আল্লাহ ইসরাইল সম্প্রদায়ের ওপর গোটা বছরের মধ্যে কেবল যে-দিবসটিতে সিয়াম পালন ফরয করেছেন তা হচ্ছে আশুরা-দিবস, এটি মুহাররমের দশম দিন। অতএব তোমরা এ-দিবসে সিয়াম পালন কর এবং নিজেদের পরিবারে উন্নত খাবারের ব্যবস্থা কর। কেননা যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে নিজের পরিবারে অর্থ-খরচে আত্মশান্ত হয় আল্লাহ সারা বছর তার জন্য সচ্ছলতার ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং তোমরা এ-দিবসে সিয়াম পালন কর। কারণ এ-দিবসেই আল্লাহ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)-এর তওবা কবুল করেছেন। এ-

দিবসেই আল্লাহ হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম-কে উঁচু মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এ-দিবসেই আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে (নমরুদের) আগুন থেকে মুক্ত করেছেন। এ-দিবসেই (আল্লাহ) হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-কে নৌকো থেকে অবতরণ করিয়েছেন। এ-দিবসেই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর ওপর আল্লাহ তওরত নাযিল করেছেন। এ-দিবসেই আল্লাহ হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম-কে যবেহের পরিবর্তে ভেড়া মুক্তিপন প্রেরণ করেছেন। এ-দিবসেই আল্লাহ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে জেল থেকে মুক্ত করেছেন। এ-দিবসেই আল্লাহ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ-দিবসেই আল্লাহ হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-কে আরোগ্য দান করেছেন। এ-দিবসেই আল্লাহ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম-কে মাছের পেট থেকে বের করে এনেছেন। এ-দিবসেই আল্লাহ নীলনদের বুক চিরে ইসরাইল সম্প্রদায়ের জন্য রাস্তা তৈরি করেছেন। এ-দিবসেই আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের গোনাহ মাফ করেছেন। এ-দিবসেই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নীলনদ ফেরিয়েছেন। এ-দিবসেই আল্লাহ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর জাতির তওবা কবুল করেন। অতএব যে-ব্যক্তি এ-দিবসে সিয়াম পালন করবে তা তার জন্য চল্লিশ বছরের গুনাহের কাফফারা হবে। আশুরা-দিবসই প্রথম দিবস যে-দিন আল্লাহ পৃথিবীর কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন। আশুরা-দিবসই প্রথম দিবস যে-দিন আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করে সে যেন পুরো একযুগ সিয়াম পালন করে। এ-দিবসে সকল নবী সিয়াম পালন করেছেন। যে-ব্যক্তি আশুরা-রাতে রাতজেগে ইবাদত করে সে যেন সপ্তআকাশবাসীদের সমান ইবাদত করে। আর যে-ব্যক্তি (আশুরার রাতে) চার রাকাআত নামায আদায় করে প্রতি রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহা একবার এবং পঞ্চাশবার সুরা আল-ইখলাস তিলাওয়াত করে তাহলে আল্লাহ তার অতীতের পঞ্চাশ ও ভবিষ্যতের পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং বেহেশতের শীর্ষস্থানে আল্লাহ তার জন্য পঞ্চাশটি স্বর্ণমিনার নির্মাণ করবেন। যে-ব্যক্তি (আশুরা-দিবসে) কোনো ব্যক্তিকে এক ঢোক শরবত হলেও পান করিয়েছে সে যেন একটি মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর অবাধ্য হয়নি (এমন মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে)। আশুরা-দিবসে যে-ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে তৃপ্ত করে খাইয়েছে সে বিদ্যুৎবেগে পুলসিরাত পার হতে

পারবে। যে-ব্যক্তি যৎসামান্য দান করে সে যেন সারা বছর কোনো নিঃস্ব-দুস্থদের বিমুখ করলো না (সমতুল্য পূণ্য ও মর্যাদা অর্জন করবে)। যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে গোসল করে সে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো রোগে আক্রান্ত হবে না। যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে চোখে সুরমা লাগায় সারা বছর তার চোখে (চোখ ওঠা) অসুখ হবে না। যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে কোনো অনাথের মাথায় হাত রাখে সে যেন সমগ্র দুনিয়ার সকল অনাথের সাথে সুআচরণ করেছে। যে-ব্যক্তি আশুরা-দিবসে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা করে সে যেন তাবৎ বনী আদমের সেবা-শুশ্রূষা করেছে।'

ইমাম ইবনুল জওযী এটিকে তাঁর *আল-মওযূআতে* উল্লেখ করেছেন।[1] তিনি বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, পরবর্তী যুগের কতিপয় লোক কিছু মনগড়া ও বানানো কথাকে বিশ্বস্ত হাদীস-বর্ণনাকারীদের নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। এখানেই ইমাম ইবনে ইরাক-এর বক্তব্য সমাপ্ত।[2]

[হযরত হুসাইন-এর শাহাদত]

রাসূলুল্লাহ-এর প্রিয় দৌহিত্র সৌভাগ্যবান শহীদ-সরদার সাইয়িদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হুসাইন সালামুল্লাহি আলায়হি ওয়া আবায়িহিল করীমের শাহাদতের আলোচনা[3]:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَخْبَرَنِيْ جِبْرِيْلُ أَنَّ حُسَيْنًا يُقْتَلُ بِشَاطِئِ الْفُرَاتِ».

'হযরত আলী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'হযরত জিবরাইল আমাকে

[1] ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ২, পৃ. ২০০–২০১

[2] ইবনে ইরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৫০–১৫১, হাদীস: ১৭

[3] শাহাদাতে হোসাইন, ইয়াযিদ ও কারবালা ট্রাজেডি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি ইসলামের ইতিহাসে একদিকে বিয়োগান্তক ও অতীব বেদনাদায়ক, অন্যদিকে সমকালীন বিভিন্ন মতাবলম্বী ইতিহাসবিদদের পরস্পর বিপরীতমুখী তথ্যের দ্বন্দ্বে এটি বহুল বিতর্কিত বিষয়ও। এ সুযোগে শিয়া, খারেজী-রাফেজীসহ কতিপয় ভ্রান্তবিশ্বাসী সম্প্রদায় এসব ঘটনার বিবরণে মনের মতো রঙ চড়িয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে সূক্ষভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। যাতে সাধারণ মুসলমানগণ ইসলামের ধারক-বাহকদেও সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলাম সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।- অনুবাদক

জানিয়েছেন ফুরাতের তীরে হযরত হুসাইনকে শহীদ করে দেওয়া হবে।"

ইমাম ইবনে সা'দ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَنَّ ابْنِي الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بَعْدِيْ بِأَرْضِ الطَّفِّ، وَجَاءَنِيْ بِهَذِهِ التُّرْبَةِ، وَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهَا مَضْجَعَهُ».

'হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'আমার পরবর্তীকালে আমারই সন্তান (অধঃস্তন পুরুষ) হুসাইনকে তফ নামক স্থানে শহীদ করা হবে। (হযরত জিবরাইল) আমাকে তার রক্তমাখা লাল মাটির টুকরো এনে দেখিয়েছেন এবং জানিয়েছেন।"

হাদীসটি ইমাম ইবনে সা'দ ও ইমাম আত-তাবারানী তাঁর *আল-মু'জামুল কবীরে* বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَنَّ أُمَّتِيْ سَتَقْتُلُ ابْنِيْ هَذَا يَعْنِيَ الْحُسَيْنَ، وَأَتَانِيْ بِتُرْبَةٍ مِّنْ تُرْبَةٍ حَمْرَاءَ».

'হযরত উম্মুল ফযল বিনতুল হারিস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের কতিপয় লোক আমার এই সন্তান (অধঃস্তন পুরুষ) অর্থাৎ হুসাইনকে শহীদ করবে। হযরত জিবরাইল আমাকে তার রক্তে রঞ্জিত মাটির এনে দেখিয়েছেন।"

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আল-হাকিম তাঁর *আল-মুসতাদরাকে* বর্ণনা করেছেন।[৩]

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَخْبَرَنِيْ جِبْرِيْلُ: أَنَّ ابْنِيْ يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْفُرَاتِ، فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلَ: أَرِنِيْ تُرْبَةَ الْأَرْضِ الَّتِيْ يُقْتَلُ فِيْهَا، فَجَاءَ بِهَا، فَهَذِهِ تُرْبَتُهَا».

---

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৪১৯, হাদীস: ৭৫০৩

[২] (ক) ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৪১৭, হাদীস: ৭৪৯৭, হযরত উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত;
(খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৭, হাদীস: ২৮১৪

[৩] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, খ. ৩, পৃ. ১৯৪, হাদীস: ৪৮১৮

'হযরত উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'হযরত জিবরাইল আমাকে অবগত করেছেন যে, ফুরাত-ভূমিতে আমার সন্তান (অধঃস্তন পুরুষ)-কে শহীদ করা হবে। আমি জিবরাইল-কে বললাম, আমাকে সেই জায়গার মাটি এনে দেখান যেখানে তাঁকে শহীদ করা হবে। তিনি তার কিছু নিয়ে এসেছেন আর এ হলো সেই জায়গার মাটি।''

ইমাম ইবনে সা'দ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১]

«إِنَّ ابْنِيْ هَذَا يَعْنِيَ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: كَرْبَلَاءُ، فَمَنْ شَهِدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرْهُ».

'আমার সন্তান (অধঃস্তন পুরুষ) অর্থাৎ হুসাইনকে যেখানে শহীদ করা হবে তার নাম কারবালায়। অতএব যারা সে-সময় তা প্রত্যক্ষ করবে তারা যেন হযরত হুসাইন-এর সহযোগিতা করে।'

হাদীসটি ইমাম আল-বাগাওয়ী[২], ইমাম ইবনুস সাকান, ইমাম আল-বাওয়ারদী, ইমাম ইবনে মুনদা ও ইমাম ইবনে আসাকির[৩] হযরত আনাস ইবনুল হারিস ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আল-বাগাওয়ী বলেছেন, এটি হযরত আনাস ইবনুল হারিস ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন কিনা তা জানা নেই। ইমাম ইবনুস সাকান বলেন, হযরত আনাস ইবনুল হারিস-এর এই সূত্রটি ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এটি বর্ণিত হয়নি। এটি ছাড়া তাঁর কাছ থেকে আর কোনো হাদীসও বর্ণিত হয়নি।[৪]

«إِنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَنِيْ: أَنَّ ابْنِي الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ، وَهَذِهِ تُرْبَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ».

'হযরত জিবরাইল আমাকে অবহিত করেছেন, আমার সন্তান (অধঃস্তন পুরুষ) হযরত হুসাইনকে শহীদ করা হবে। এই মাটিই হলো সেই জায়গার।'

---

[১] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৪১৭, হাদীস: ৭৪৯৭
[২] আল-বাগাওয়ী, *মু'জামুস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ৬৩–৬৪, হাদীস: ৪৬
[৩] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ২২৪
[৪] আলী আল-মুত্তাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৩৪৩১৪

ইমাম আল-খলীলী (রহ.) তাঁর *আল-ইরশাদে* হযরত আয়িশা (রাযি.) ও হযরত উম্মু সালামা (রাযি.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[1]

«إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ مَعَنَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَتُحِبُّهُ؟ فَقُلْتُ: أَمَّا فِي الدُّنْيَا، فَنَعَمْ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُ هَذَا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: كَرْبَلَاءُ، فَتَنَاوَلَ جِبْرِيْلُ مِنْ تُرْبَتِهِ، فَأَرَانِيْهُ».

‘একদিন হযরত জিবরাইল (আ.) ঘরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বললেন, আপনি কি হুসাইনকে ভালোবাসেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইহকালেও। হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন, তাঁকে আপনার উম্মতের কতিপয় লোক এই কারবালা-ভূমিতে শহীদ করে দেবে। অতঃপর হযরত জিবরাইল (আ.) সেই স্থানের মাটি দেখালেন, আমি মাটিগুলো দেখেছি।’

ইমাম আত-তাবারানী (রহ.) তাঁর *আল-মু’জামুল কবীরে* হযরত উম্মু সালামা (রাযি.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[2]

«إِنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَنِيْ: أَنَّ ابْنِيْ هَذَا يُقْتَلُ، وَأَنَّهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ يَقْتُلُهُ».

‘হযরত জিবরাইল (আ.) আমাকে জানালেন যে, আমার এ-সন্তান (অধঃস্তন পুরুষ)-কে শহীদ করে দেওয়া হবে। আর হত্যাকারীদের ওপর আল্লাহর ভয়াবহ গযব নেমে আসবে।’

হাদীসটি ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.) হযরত উম্মু সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন।[3]

«إِنَّ جِبْرِيْلَ أَرَانِيَ التُّرْبَةَ الَّتِيْ يُقْتَلُ عَلَيْهَا الْحُسَيْنُ، فَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ يُسْفِكُ دَمَهُ، فَيَا عَائِشَةُ! وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَيَحْزُنُنِيْ، فَمَنْ هَذَا مِنْ أُمَّتِيْ يَقْتُلُ حُسَيْنًا بَعْدِيْ»؟

---

[1] আল-খলীলী, *আল-ইরশাদ*, الإرشاد في معرفة علماء الحديث، مرسلاته، খ. ১, পৃ. ৭০৩, হাদীস: ৪৭

[2] আত-তাবারানী, *আল-মু’জামুল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৮, হাদীস: ২৮১৯

[3] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ১৯৩

‘হযরত জিবরাইল যেখানে হুসাইন শাহাদাত-বরণ করবেন তার মাটি এনে আমাকে দেখিয়েছেন। যারা তাঁর রক্ত প্রবাহিত করবে তাদের ওপর ওপর আল্লাহর ভয়াবহ গযব আসবে। হে আয়িশা! সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি ভীষণ মনোকষ্ট অনুভব করছি। আমার পরে আমার উম্মতে এমন কোন্ ব্যক্তি হবে যে হুসাইনকে হত্যা করবে’?

হাদীসটি ইমাম ইবনে সা'দ হযরত আয়িশা থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

«إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي: أَنَّ ابْنِي يَقْتُلُهُ أُمَّتِي، فَقُلْتُ: فَأَرِنِي تُرْبَتَهُ، فَأَرَانِي بِتُرْبَةٍ حَمْرَاءَ».

‘হযরত জিবরাইল এসে আমাকে অবহিত করেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোক সন্তান (অধঃস্তন পুরুষ)-কে শহীদ করবে। আমি তাঁকে বললাম, জায়গাটার কিছু মাটি এনে আমাকে দেখান। তিনি আমাকে সেই স্থানের রক্তরাঙা মাটি তুলে এনে দেখিয়েছেন।’

ইমাম আত-তাবারানী তাঁর *আল-মু'জামুল কবীরে* হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২]

«أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيَّ: أَنِّي قَتَلْتُ بِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا سَبْعِيْنَ أَلْفًا، وَإِنِّي قَاتِلٌ بِابْنِ بِنْتِكَ سَبْعِيْنَ أَلْفًا وَّسَبْعِيْنَ أَلْفًا».

‘আমাকে মহান আল্লাহ প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন যে, আমি হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া-এর হত্যার বদলা হিসেবে ৭০ হাজার লোককে হত্যা করেছি, আমি আমার দৌহিত্রের হত্যার বদলা হিসেবে ৭০ হাজারের ৭০ গুণ লোককে হত্যা করবো।’

হাদীসটি ইমাম আল-হাকিম তাঁর *আল-মুসতাদরাকে* হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩]

---

[১] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৪১৮, হাদীস: ৭৫০০

[২] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২৪, পৃ. ৫৪, হাদীস: ১৪১

[৩] আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران, খ. ২, পৃ. ৩১৯, হাদীস: ৩১৪৭

«قَامَ عِنْدِيْ جِبْرِيْلُ مِنْ قَبْلُ، فَحَدَّثَنِيْ: أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ، وَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ أُشِمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَمَدَّ يَدَهُ، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّنْ تُرَابٍ، فَأَعْطَانِيْهَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ أَنْ فَاضَتْ».

'একদিন আগ থেকেই হযরত জিবরাইল (আলায়হিস সালাম) আমার কাছে উপস্থিত ছিলো, এক পর্যায়ে তিনি বললেন, হযরত হুসাইনকে ফোরাতের তীরে শহীদ করা হবে। তিনি বললেন, আপনি যদি তাঁর কবরের মাটি শুঁকতে চান? আমি বললাম, হ্যাঁ। হযরত জিবরাইল (আলায়হিস সালাম) হাত সম্প্রসারণ করে সেই জায়গার মাটি নিয়ে আসলেন এবং আমার সামনে পেশ করলেন। এ-অবস্থায় আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি))[১], ইমাম আবুল ইয়া'লা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)[২], ইমাম ইবনে সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম আত-তাবরানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)[৩] (প্রমুখ) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), হযরত আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), হযরত আনাস (ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) ও হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়াও হযরত উম্মু সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা), হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারিস (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে ইমাম ইবনে আসাকির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে ইমাম ইবনে সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং হযরত যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে ইমাম আবুল ইয়া'লা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেছেন।

«كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ كَلْبٍ أَبْقَعَ يَلِغُ فِيْ دَمِ أَهْلِ بَيْتِيْ».

'আমি যেন কুকুর দেখছি যে আমার অধঃস্তন পুরুষের রক্ত পান করছে।'

এটি ইমাম ইবনে আসাকির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সাইয়িদ হুসাইন ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।'[৪]

«يَا عَائِشَةُ! أَلَا أُعَجِّبُكِ؟ لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ مَلَكٌ آنِفًا مَا دَخَلَ عَلَيَّ قَطُّ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِيْ هَذَا مَقْتُوْلٌ، وَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ تُرْبَةً يُقْتَلُ فِيْهَا، فَتَنَاوَلَ الْمَلَكُ بِيَدِهِ، فَأَرَانِيْ تُرْبَةً حَمْرَاءَ».

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৭৭, হাদীস: ৬৪৮

[২] আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ২৯৮, হাদীস: ৩৬৩

[৩] আত-তাবারানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১০৫, হাদীস: ২৮১১

[৪] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ২৩, পৃ. ১৯০ ও খ. ৫৫, পৃ. ১৬, হাদীস: ১১৫৮২

'হে আয়িশা! খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, এইমাত্র আমার কাছে এমন একজন ফেরেশতা এসেছেন, যিনি ইতঃপূর্বে আমার কাছে কখনো আসেননি। তিনি এসে আমাকে বললেন, আমার এ-সন্তান (অধঃস্তন পুরুষ)-কে শহীদ করা হবে। তিনি আরও বললেন, আপনি চাইলে আমি আপনাকে যে জায়গায় তাঁকে শহীদ করা হবে তার মাটি এনে দেখাতে পারি। একথা বলেই ফেরেশতা হাত তাঁর সম্প্রসারণ করে আমাকে সে-জায়গার রক্তরঞ্জিত মাটি এনে আমাকে দেখালেন।'

বর্ণনাটি ইমাম আত-তাবরানী তাঁর *আল-মু'জামুল কবীরে* হযরত আয়িশা থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

«يَزِيْدُ، لَا بَارَكَ اللهُ فِيْ يَزِيْدَ الطَّعَّانِ اللَّعَّانِ، أَمَا إِنَّهُ نُعِيَ إِلَيَّ حَبِيْبِيْ وَسَخِيْلِيْ حُسَيْنٌ أُتِيْتُ بِتُرْبَتِهِ، وَرَأَيْتُ قَاتِلَهُ، أَمَا إِنَّهُ يُقْتَلُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ، وَلَا يَنْصُرُوْنَهُ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ».

'খুনি অভিশপ্ত ইয়াযিদ; আল্লাহর সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। কারণ সে আমার প্রিয়বৎস হুসাইনের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। হুসাইনের রক্তভেজা মাটি আমাকে দেখানো হয়েছে এবং আমি তাঁর হত্যাকারীকে দেখেছি। অবশ্য হুসাইনকে লোকসম্মুখে হত্যা করা হবে, অথচ তারা কেউ তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসবে না, বিধায় তাদের ওপর সর্বব্যাপী আযাব নেমে এসেছে।'

এ-বর্ণনাটি ইমাম ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন।[২]

«يُقْتَلُ الْحُسَيْنُ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً مِّنْ مُهَاجَرَتِيْ».

'হিজরী ষাটের দশকে হযরত হুসাইন-কে হত্যা করা হবে।'

ইমাম আত-তাবরানী বর্ণনাটি তাঁর *আল-মু'জামুল কবীর* গ্রন্থে[৩], ইমাম খতীব (আল-বগদাদী)[৪] ও ইমাম ইবনে আসাকির[১]

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৭, হাদীস: ২৮১৫

[২] (ক) আলী আল-মুত্তাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৩৪৩২৪; (খ) ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ২, পৃ. ৪৬

[৩] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৫, হাদীস: ২৮০৭

[৪] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১, পৃ. ১৫২

হযরত উম্মু সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী সা'দ ইবনে তরীফ রয়েছেন, যিনি অগ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি হাদীস বানোয়াট করতেন।[২] ইমাম ইবনুল জওযী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনাটিকে তাঁর *আল-মওযূআতে* অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।[৩]

«يُقْتَلُ حُسَيْنٌ حِيْنَ يَعْلُوْهُ الْقَتِيْرُ».

'হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন শহীদ হবেন তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হবেন।'

বর্ণনাটি ইমাম আত-তাবরানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর *আল-মু'জামুল কবীর* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৪] এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন সা'দ ইবনে তরীফ রয়েছেন (হাদীসে বানোয়াটির দায়ে প্রত্যাখ্যাত তিনি)।

«نُعِيَ إِلَيَّ الْحُسَيْنُ، وَأُتِيْتُ بِتُرْبَتِهِ، وَأُخْبِرْتُ بِقَاتِلِهِ».

'হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করা হবে, আমাকে তাঁর শাহাদাতস্থলের মাটি এনে দেখানো হয়েছে এবং তাঁর হত্যাকারী শনাক্ত করে দেওয়া হয়েছে।'

বর্ণনাটি ইমাম আদ-দায়লমী (রাহিমাহুল্লাহ) হযরত মুআয (ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৫]

জামিউল উসূলে ইমাম আত-তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর হাদীস হিসেবে এসেছে,

عَنْ سَلْمَىٰ: امْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ تَبْكِيْ، قُلْتُ: مَا يُبْكِيْكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ الْآنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، وَهُوَ يَبْكِيْ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا».

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ১৯৮
[২] ইবনে হিব্বান, *আল-মজরূহীন*, খ. ১, পৃ. ৩৫৭, ক্রমিক: ৪৬৭
[৩] ইবনুল জওযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪০৮
[৪] আত-তাবারানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১০৫, হাদীস: ২৮০৮
[৫] আদ-দায়লামী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৮৫, হাদীস: ৬৮৪১

'হযরত সালমা নামে এক আনসারী মহিলা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমি উম্মু সালামা -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কান্নারত দেখতে পাই। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এই মাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ -কে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি খুব বেশি কাঁদছেন, তাঁর পবিত্র মাথা ও দাড়িতে মাটি লেগে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কী হয়েছে? তিনি বলেন, 'আমি এই মাত্র হযরত হুসাইনকে শহীদ হতে দেখেছি।''[১]

জামিউল উসূলে ইমাম আল-বুখারী ও ইমাম আত-তিরমিযী -এর হাদীস হিসেবে এও এসেছে যে,

[١] عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ، فَجُعِلَ فِيْ طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِيْ حُسْنِهِ شَيْئًا، فَقَالَ أَنَسٌ: فَقُلْتُ: «وَاللهِ! إِنَّهُ كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مَخْضُوْبًا بِالْوَسْمَةِ».

'(১) হযরত আনাস (ইবনে মালিক) থেকে বর্ণিত আছে, ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছে হযরত হুসাইন -এর ছিন্ন মস্তক এনে একটি তশতরীতে রাখা হয়। এ-অবস্থায় নাড়াচাড়া করলেন এবং তাঁর প্রশংসায় কিছু বললেন। হযরত আনাস (ইবনে মালিক) বললেন, আল্লাহর কসম! তাঁর অবয়ব হযরত রাসূলুল্লাহ -এর সাথে খুব বেশি মিল। তখন হযরত হুসাইন -এর মাথার চুল মেহেদিরাঙা ছিলো।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

[٢] قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ، فَجِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِقَضِيْبٍ فِيْ أَنْفِهِ، وَيَقُوْلُ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا»، فَقُلْتُ: «أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

'(২) তিনি (হযরত আনাস) বলেন, আমি (ওবায়দুল্লাহ) ইবনে যিয়াদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার দরবারে হযরত হুসাইন -

[১] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউস কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৫৭, হাদীস: ৩৭৭১; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৯, পৃ. ৩৫, হাদীস: ৬৫৬৭

এর ছিন্ন মস্তক নীত হলে তিনি তাঁর নাকে একটি লাকড়ি লাগালেন এবং বললেন, আমি জীবনের এর চেয়ে সুদর্শন মানুষ দেখিনি। তখন আমি বললাম, নিশ্চয় তাঁর আকৃতি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ।'

প্রথম হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[১] ও দ্বিতীয়টি ইমাম আত-তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[২] বর্ণনা করেছেন।[৩]

জামিউল উসূলে আরও এসেছে,

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ، فَصُدَّتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحَبَةِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُوْلُونَ: قَدْ جَاءَتْ، فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلُ الرُّءُوْسَ حَتَّىٰ دَخَلَتْ فِيْ مَنْخَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَذَهَبَتْ حَتَّىٰ تَغَيَّبَتْ، ثُمَّ قَالُوْا: قَدْ جَاءَتْ، قَدْ جَاءَتْ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا».

'হযরত উমারা ইবনে ওমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও তার অনুসারীদের ছিন্ন মস্তক আনা হয়। তখন মসজিদ-প্রাঙ্গনে[৪] লোকজনের প্রচ- ভীড় ছিলো। আমিও ভিড় ঠেলে সেখানে পৌঁছে যাই। সমবেত লোকেরা বলছিলো, ওই দেখো বেরিয়েছে; সাপ এসেছে। সাপটি নিহত লোকদের স্তূপিকৃত মস্তকগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের মাথার কাছে এসে থামলো। তার নাক দিয়ে প্রবেশ করে ভেতরে কিছুক্ষণ অবস্থান করে বেরিয়ে আসে। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেলো। এ-দৃশ্য দেখে সমবেত লোকজন বলতে লাগল, ওই দেখো সে এসেছে, সে এসেছে। সাপটি এভাবে কয়েকবার বা তিনবার করলো।'

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।[৫]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ২৬, হাদীস: ৩৭৪৮

[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৫৯, হাদীস: ৩৭৭৮

[৩] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৯, পৃ. ৩৫–৩৬, হাদীস: ৬৫৬৮

[৪] কুফার গভর্নর ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ছিন্নমস্তক প্রথমে কুফার রাজপ্রাসাদে গভর্নও মুখতার ইবনে ওবাইদের সামনে রাখা হয়েছে। অতঃপর এই যালিমকে মুখতারের আদেশে লাশ মসজিদে আনা হয়। যাতে মানুষ ক্ষমতাসীন গভর্নর মুখতারের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

[৫] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৬০, হাদীস: ৩৭৮০; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৯, পৃ. ৩৬, হাদীস: ৬৫৬৯

আল্লামা আস-সুয়ূতী -এর *তারীখুল খুলাফা* ও ইমাম আল-বায়হাকী -এর *দালায়িলুন নুবুওয়াত* গ্রন্থে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نِصْفَ النَّهَارِ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، وَبِيَدِهِ قَارُوْرَةٌ؛ فِيْهَا دَمٌ؛ فَقُلْتُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا هَـذَا؟ قَالَ: «دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمَ»، فَأُحْصِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَوَجَدُوْهُ قُتِلَ يَوْمَئِذٍ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি দুপুরে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (স্বপ্নে) অত্যন্ত বিষণ্ন ও ক্লান্ত অবস্থা দেখলাম। এ-সময় তাঁর হাতে একটি ছোট বোতলে কিছু রক্ত ছিলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। এসব কী (কী হয়েছে আপনার)? তিনি জবাব দিলেন, 'এ হলো হযরত হুসাইন ও তাঁর অনুসারীদের রক্ত, যা আজ পর্যন্ত একত্র করে যাচ্ছি।' লোকেরা এই স্বপ্নের তারিখ মিলিয়ে দেখেছে এটি ছিলো হযরত হুসাইন -এর শাহাদাতের দিন।'[১]

ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী) *দালায়িলুন নুবুওয়াত* গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ الْجِنَّ تَبْكِيْ عَلَى الْحُسَيْنِ، وَتَنُوْحُ.

'হযরত উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত হুসাইন -এর শাহাদাতে জিনজাতি শোকাহত হতে ও কান্না করতে শুনেছি।'[২]

ইমাম সা'লাব তাঁর *আমালী*তে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِيْ حُبَابٍ الْكَلْبِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ كَرْبَلَاءَ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَشْرَافِ بِهَا: بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تَسْمَعُوْنَ نَوْحَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ: مَا تَلْقِيْ أَحَدًا إِلَّا خَبَّرَكَ

---

[১] (ক) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৬, পৃ. ৪৭১, হাদীস: ২৮০৯ ও খ. ৭, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২৯৭৭; (খ) আস-সুয়ূতী, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১৫৮

[২] আস-সুয়ূতী, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১৫৮

أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِيْ مَا سَمِعْتَ أَنْتَ، قَالَ: سَمِعْتُهُمْ يَقُوْلُوْنَ: شِعْرٌ:

مَسَحَ الرَّسُوْلُ جَبِيْنَهُ	*	فَلَهُ بَرِيْقٌ فِي الْخُدُوْدِ
أَبَوَاهُ مِنْ عُلْيَا قُرَيْشٍ	*	وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُوْدِ

'আবু হুবাব আল-কালবী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি কারবালায় পৌঁছে সেখানকার সম্ভ্রান্ত লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আমি জানতে পেরেছি আপনারা হযরত হুসাইন-এর শাহাদাতে জিনজাতির শোকগীতি শুনেছেন? তারা জবাবে বলেছে, আপনি যার সাথে সাক্ষাৎ করেই এ-কথা জিজ্ঞেস করবেন, সবাই আপনাকে ইতিবাচক উত্তরই দেবেন এবং বলবেন, তারা নিজ কানেই জিনজাতির কান্না শুনেছে। আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা কী শুনেছেন তাদের? তারা বলল, আমরা তাদের বলতে শুনেছি: কবিতা

রাসূল যখন বোলালেন হাত হুসাইনের ললাটে
আলোকিত হলো কপোল তাঁহার ঝিকঝিক ঝলমলে।
পিতা-মাতা তাঁর সেরা কুরাইশী সবে
দাদাও তাঁহার শ্রেষ্ঠ জাহান-ভবে।'[১]

ইমাম আবু ইয়া'লা একটি দুর্বলসূত্রে তাঁর মুসনদে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِيْ قَائِمًا بِالْقِسْطِ حَتَّىٰ يَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ يَثْلِمُهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ: يَزِيْدُ».

'হযরত আবু উবায়দা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'আমার উম্মত যেকোনো ব্যাপারে সর্বদা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তবে উমাইয়া বংশের এক লোকই প্রথম যে হঠকারিতার পথে চলবে; তার নাম ইয়াযিদ।''[২]

---

[১] (ক) সা'লব, *আল-মাজালিস*, খ. ৮, পৃ. ১; (খ) আস-সুয়ূতী, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১৫৮
[২] (ক) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ৮৭১; (খ) আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮

ইমাম আর-রূয়ানী তাঁর মুসনদে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِيْ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ أُمَيَّةَ؛ يُقَالُ لَهُ: يَزِيْدُ».

'হযরত আবুদ দারদার থেকে বর্ণিত আছে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'উমাইয়া বংশের এক লোকই প্রথম যে আমার সুন্নাহর পরিবর্তন করবে, তার নাম ইয়াযিদ।'"[১]

وَقَالَ نَوْفَلُ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، فَذَكَرَ رَجُلٌ يَزِيْدَ، فَقَالَ: أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: تَقُوْلُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ! وَأَمَرَ بِهِ، فَضُرِبَ عِشْرِيْنَ سَوْطًا.

'হযরত নওফাল ইবনে আবুল ফুরাত বলেন, একদিন আমি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয-এর দরবারে ছিলাম, জনৈক লোক ইয়াযিদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে আমিরুল মুমিনীন ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া বললো। এর প্রতিক্রিয়ায় হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বললেন, তুমি (ইয়াযিদকে) আমীরুল মুমিনীন বললে? অতএব তাকে শাস্তির নির্দেশ দিলেন তিনি, এর দায়ে বিশটি বেত্রাঘাত করা হয়।'[২]

আল্লামা আস-সুয়ুতী-এর বক্তব্য এখানে সমাপ্ত।

সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান ইবনে আলী ও হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফয়ান-এর মধ্যকার সন্ধি

জেনে রাখুন যে, ৪১ হিজরীতে হযরত মুআবিয়া হযরত হাসান ইবনে আলী-এর মুখোমুখী হন। এতে হযরত হাসান খিলাফতের দাবি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। এ-কারণে এই বছরকে ঐক্যবর্ষ হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ এ-বছর মুসলিম উম্মাহ এক খলীফার

---

[১] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ২০০; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৬, পৃ. ৪৬৬–৪৬৭, হাদীস: ২৮০২, হযরত আবু যর আল-গিফারী থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৭৫; (খ) আস-সুয়ুতী, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১৫৮

নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। একই বছর হযরত মুআবিয়া (রা.) মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মদীনার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেন।

৪৩ হিজরীতে হযরত মুআবিয়া (রা.) সিজিস্তানের রায় ও সুদানের কুওয়ারা জয় করেন এবং সেখানে তিনি যিয়াদ ইবনে উমাইয়াকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এটাই ইসলামি ইতিহাসের প্রথম ঘটনা যেখানে রাসূল (সা.)-এর যুগ থেকে চলে আসা প্রতিষ্ঠিত রীতির পরিবর্তন করা হয়েছে। সা'লবী প্রমুখ এ-কথা উল্লেখ করেছেন।

৫০ হিজরীতে হযরত মুআবিয়া (রা.) সিরিয়াবাসীদেরকে স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী নেতৃত্বের প্রতি বায়আতগ্রহণের আহ্বান জানান[১]। এতে তারা সকলে তার হাতে বায়আত নেন। এটাই প্রথম যিনি তাঁর পুত্রকে খলীফা মনোনীত করলেন। খলীফার সুস্থ অবস্থায় পরবর্তী খলীফা নিয়োগের ক্ষেত্রেও এটা ছিল প্রথম ঘটনা। এরপর মদীনার শাসক মারওয়ানের কাছে মদীনাবাসী থেকে ইয়াযিদের পক্ষে বায়আতগ্রহণের জন্য ফরমান লিখেন। নির্দেশ অনুযায়ী মারওয়ান মদীনাবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের ইচ্ছে হলো তিনি তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব (রা.))-এর সুন্নতের অনুসরণে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করবেন। এর প্রতিক্রিয়ায় আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, বরং বলুন, কায়সার ও কিসরার নীতি অনুসরণে। কেননা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব (রা.)) তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের কাউকে খলীফা মনোনীত করে যাননি।

৫১ হিজরীতে হযরত মুআবিয়া (রা.) হজ পালন করেন এবং নিজের পুত্রের পক্ষে বায়আত নেন। এ-উদ্দেশ্যে তিনি হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর ((রা.))-কে ডেকে পাঠান, সাক্ষাৎ হলে তাঁকে বললেন, হে ইবনে ওমর! আপনি আমাকে বলেছিলেন, নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় আপনি একটি রাতও ঘুমোতে পছন্দ করেন না। তাই আমি আপনাকে মুসলমানের সংহতিভঙ্গ ও তাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা থেকে সতর্ক করছি।

এ-পর্যায়ে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর (রা.) আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বললেন, এ-কথা আপনিও জানেন যে, আপনার আগেও

---

[১] এ অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্যগুলো যুগযুগ ধরে বহুল তর্কিত বিষয় হওয়ায় এর ঐতিহাসিক যথার্থতা যাচাই, বাস্তব সত্য উদঘাটন ও বিস্তারিত সূত্র সন্ধানে আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ও তারিখে ইবনে খালদুন প্রভৃতি ইতিহাসগ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।-অনুবাদক

খলীফা ছিলেন, তাঁদেরও সন্তান ছিলো, তাঁদের করো সন্তানদের চেয়ে আপনার পুত্র উত্তম নয়। তাঁদের সন্তানদের মাঝে এমন খারপ কিছুও দেখা যায়নি যা আপনার পুত্রের মাঝে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও তাঁরা বিষয়টা মুসলমানের স্বাধীন ইখতিয়ারে ছেড়ে দিয়েছেন[১]। আর আপনিই আমাকে সতর্ক করছেন, আমি মুসলমানের সংহতি বিনষ্ট করছি! আমি এমন কিছুই করছি না। আমি সাধারণ মুসলমানের একজন। এ-ব্যাপারে পুরো উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করলে আমিও তাঁদের সাথেই থাকবো। হযরত মুআবিয়া বললেন, আল্লাহ আপনার ওপর কৃপা করুন। এরপর হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর চলে যান।

অতঃপর হযরত মুআবিয়া হযরত (আবদুর রহমান) ইবনে আবু বকর -কেও ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখা করলেন। হযরত মুআবিয়া কথা বলতে শুরু করলেন। হযরত (আবদুর রহমান) ইবনে আবু বকর কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার ধারণা হচ্ছে, আপনার পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত বানানোর জন্যে আমরা আপনাকে আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছি, আল্লাহর কসম! আপনি এমনটি করতে পারেন না। আল্লাহর কসম! অবশ্যই এ-ব্যাপারটিকে মুসলমানের আশুরা-ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়াই আপনার উচিত হবে। নতুবা এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আপনাকেই বহন করতে হবে। এতটুকু বলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ওঠে পড়লেন এবং (সেখান থেকে) চলে গেলেন। এতে হযরত মুআবিয়া বললেন, হে আল্লাহ! আপনার যেমন মর্জি তাঁর ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। তিনি আরও বললেন, হে প্রস্থানোদ্যত ব্যক্তি! থামুন, এখনই সিরিয়াবাসীদের উদ্দেশ্যে যাবেন না। আমার আশঙ্কা সে-ক্ষেত্রে আমাকে আপনার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে বাধ্য করবে। অবশ্য আমি লোকজনকে একথাটি বলে দেই যে, আপনি বায়আত গ্রহণ করে নিয়েছেন। এরপর আপনি যা খুশি করতে পারবেন।

এরপর হযরত মুআবিয়া হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনুয যুবাইর -কে ডেকে বললেন, হে ইবনে যুবায়ের! তুমি সেই শৃগালের মতো ক্ষীপ্র যে কিনা একটি বন থেকে বেরিয়ে অপর জঙ্গলে দ্রুত প্রবেশ করো। নিশ্চয়ই আপনি এই দু'ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছেন এবং আপনি তাঁদের কান ভারি করেছেন। তাঁদেরকে তাঁদের মতের বাইরে পরিচালিত করতে প্ররোচিত

[১] মজলিসে শুরা বা সর্বোচ্চ পরামর্শ পরিষদ কর্তৃক খলিফা মনোনীত হতেন এবং জনগণ তাঁদের হাতে আনুগত্যের শপথ নেয়।

করেছেন। জবাবে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, আপনি যদি নিজেকে খিলাফতের মালিক মনে করেন তবে তা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করুন। এরপরই আপনার পুত্রকে নিয়ে আসুন, আমরা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করবো। যদি একই সাথে আপনার ও আপনার পুত্র উভয়ের কাছে বায়আত গ্রহণ করি তবে কার কথা শুনবো, কাকে মানবো? একই সময়ে আপনারা দু'জনের বায়আত তো চলতে পারে না! এই বলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্থানত্যাগ করেন।

তারপর হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, কিছু লোক এই মর্মে গুজব ছড়াচ্ছে যে, হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, হযরত (আবদুর রহমান) ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ও হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কোনো মূল্যেই ইয়াযিদের খিলাফতের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করবেন না। অথচ তাঁরা তিনজনই কথা শুনেছেন এবং আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেছেন। একথা শুনে সিরিয়াবাসী বললো, যে পর্যন্ত আমরা এই তিন ব্যক্তিকে জনসম্মুখে বায়আত গ্রহণ করতে না দেখবো সে পর্যন্ত আমরা এতে কোনোক্রমেই সন্তুষ্ট হতে পারবো না। অন্যথায় আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেবো। এর প্রতিক্রিয়ায় হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সুবহানাল্লাহ! কুরাইশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এতো দ্রুততা কেন? (এটা ধৃষ্টতার শামিল)। আমি এরপর কোনোদিন তোমাদের মুখে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য আর শুনতে চাই না। এটা বলেই তিনি মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। এতে জনগণের মধ্যে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া দেখা গেল, হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, হযরত (আবদুর রহমান) ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ও হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইয়াযিদের সমর্থনে তাঁরা বায়আত গ্রহণ করেছেন! একদল মানুষ বলল, হ্যাঁ আল্লাহর কসম। অন্য একদল মানুষ বলল, না (এ হতে পারে না)। এ-পরিস্থিতি হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া ফিরে গেলেন।[১]

হযরত হাসান আল-বাসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সে-সময় জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলার পেছনে দু'জন ব্যক্তির কিছু দায় রয়েছে। একজন হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা;[২] তিনি হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কুরআন উর্ধ্বে তুলে ধরার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর তা সেভাবে উত্তোলন করাও

---

[১] (ক) আয-যাহাবী, *তারিখুল ইসলাম*, খ. ৪, পৃ. ১৪৮–১৪৯; (খ) আস-সুয়ুতী, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১৪৯–১৫০

[২] হাসান বসরীর এই উক্তি সম্পর্কে লেখক সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যসূত্র বা প্রমাণ পেশ করেন নি। উক্তিটি বেশ আপত্তিকর ও সাহাবির শানে ধৃষ্টতাপূর্ণ।- অনুবাদক

হয়েছিলো। হযরত ইবনুল ফররা বলেন, অতঃপর খারেজীদেরকে তৃতীয়পক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোও হয়। আর এই তৃতীয়পক্ষ কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। অপর ব্যক্তি হলেন হযরত আল-মুগীরা ইবনে শু'বা; তিনি হযরত মুআবিয়া -এর পক্ষ থেকে কুফায় নিযুক্ত গভর্নর ছিলেন। তাঁর নামে হযরত মুআবিয়া পত্র পাঠিয়েছিলেন, আমার এই বার্তা পাঠমাত্রই আপনি নিজের পদ থেকে অব্যাহতি বরণ করবেন। হযরত মুআবিয়া ফরমান বাস্তবায়নে একটু সময় নিলেন। এরপর যখন তিনি হযরত মুআবিয়া -এর দরবারে উপস্থিত হন। হযরত মুআবিয়া বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একটি সমস্যা ছিলো যা সমাধান করে এবং ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার জন্য দেরি করতে হয়েছে। হযরত মুআবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, বিষয়টা কী? তিনি বললেন, আপনার পরবর্তী খলীফা হিসেবে ইয়াযিদের পক্ষে জনগণের বায়আত গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি। হযরত মুআবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাই করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হযরত মুআবিয়া বললেন, তাহলে আপনি আপনার কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেন (গভর্নর পদে আপনাকে পুনর্বহাল করা হলো।) হযরত আল-মুগীরা ইবনে শু'বা যখন হযরত মুআবিয়া -এর দরবার থেকে কর্মস্থলে ফিরে আসেন তখন তাঁর অনুসারীরা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হলো আপনাকে? তিনি জবাব দিলেন, আমি হযরত মুআবিয়া -কে এমন দিকভ্রান্ত ঘোড়ার পিঠে সওয়ার করে দিয়েছি, যেখানে তিনি কিয়ামত অবধি (উদভ্রান্তের মতো শুধু ঘুরে বেড়াবেন বটে) মনযিলে পৌঁছুতে পারবেন না।

ইমাম ইবনে সিরীন বলেন, আমর ইবনে হাযম দূতের বেশে হযরত মুআবিয়া -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়ে বলুন তো, কেমন ব্যক্তিকে আপনি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার খলীফা নিযুক্ত করে চলেছেন? আপনার উপদেশ শিরোধার্য! তবে আমার ব্যক্তিগত রায় হলো, খিলাফতের উত্তরাধিকারের জন্য যোগ্যতা বিচারে তাঁদের ও আমার সন্তান ব্যতীত আর কোনো বিকল্প ব্যক্তি চোখে পড়ছে না। আর আমার সন্তান সমধিক যোগ্য।

হযরত আতিয়া ইবনে কায়িস বলেন, হযরত মুআবিয়া এক ভাষণে বললেন, হে আল্লাহ! যদি আমি ইয়াযিদকে তার যোগ্যতা বিবেচনায় খলীফা পদে মনোনীত করে থাকি তাহলে আপনি আমার এ-প্রচেষ্টা সফল করুন এবং ইয়াযিদকে সাহায্য করুন। আর যদি আমি সে অযোগ্য

হওয়া সত্ত্বেও শুধু সন্তান হিসেবে স্নেহবাৎসল্যের কারণে তাকে এ পদে মনোনীত করে থাকি তাহলে মসনদে পদার্পণের আগেই তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করো।[1]

২৫ বা ২৬ হিজরীতে হঠকারী ইয়াযিদের জন্ম হয়। জনসাধারণের প্রত্যাখ্যানের মুখেও তার পিতা তাকে খিলাফতের পদে মনোনীত করেন। ৬০ হিজরী মাহে রজবে যখন হযরত মুআবিয়া -এর ইন্তিকাল হয় সিরিয়াবাসীরা ইয়াযিদের হাতে বায়আত গ্রহণ করে। এরপর মদীনাবাসীর পক্ষ থেকে তার বায়আত গ্রহণের সম্মতি আদায় করতে ইয়াযিদ তার একজন প্রতিনিধিকে মদীনায় পাঠালেন। হযরত হুসাইন ও হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনুয যুবাইর ইয়াযিদের আনুগত্যে বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং রাতেই তাঁরা মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনুয যুবাইর ইয়াযিদের হাতে বায়আতও গ্রহণ করেননি, অন্যদিকে নিজের পক্ষে খিলাফতের দাবি করেননি। পক্ষান্তরে হযরত ইমাম হুসাইন -এর ব্যাপার ছিলো; হযরত মুআবিয়া -এর খিলাফত-আমল থেকেই কুফাবাসীরা তাঁর কাছে চিঠি লিখত তাদের সাথে সম্মিলত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে। কিন্তু তিনি এ-আহ্বান বরাবরই নাকচ করে এসেছেন। পরে যখন ইয়াযিদের বায়আত হয়ে যায়, তখন তিনি বেশ দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে গেলেন; কখনে নিজের অবস্থানে থেকে যাবেন বলে চিন্তা করতেন আবার কখনো কুপায় গমনের ইচ্ছা হতো। এ অবস্থায় হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনু যুবাইর তাঁকে কুফা গমনের পরামর্শ দেন। অন্যদিকে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস ঘলেন, আপনি কুফা যাবেন না। হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর বলেছিলেন, আপনি মদীনা ছেড়ে কোথাও যাবেন না। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ -কে ইহ-পরকালের যেকোনো একটি পছন্দ করতে এখতেয়ার দিয়েছিলেন, তিনি পরকালই বেছে নেন। নিশ্চয় আপনি তাঁর কলিজার টুকরো। সুতরাং সেটি অর্থাৎ আপনিও গ্রহণ করবেন না। এসব বলেই তিনি হযরত হুসাইন -কে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন এবং বিদায় জানালেন। তা ছাড়া হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর প্রায় সময় বলতেন, মদীনা ছাড়ার ক্ষেত্রে হযরত হুসাইন -এর ইচ্ছাই জয়ীই হলো। আমার জীবনের কসম! যদি তিনি তাঁর পিতা ও বড় ভাইয়ের সাথে কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা থেকে শিক্ষা নিতেন। এ ছাড়াও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ , হযরত আবু সাঈদ (আল-খুদরী) ও হযরত আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী সহ অনেক সাহাবী তাঁকে কুফা

---

[1] (ক) আয-যাহাবী, *তারিখুল ইসলাম*, খ. ৫, পৃ. ২৭২; (খ) আস-সুয়ূতী, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১৫৬

যাওয়ার ক্ষেত্রে একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো কথা মানেননি। বরং ইরাকের দিকে রওনা হওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিলেন। এতে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস তাঁকে এ-পর্যন্ত বলেছিলেন, হে হুসাইন! আমি আশঙ্কা করি, আপনি নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির সামনে আপনাকে নির্মমভাবে শহীদ হয়ে যাবে যেমনটি হযরত ওসমান-কে শহীদ করা হয়। হযরত হুসাইন তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আপনি হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবাইর-এর চোখ ঠা-া করলেন কেবল। যখন হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবাইর-এর সাথে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস-এর দেখা হওয়া মাত্র বললেন, আপনি যা চেয়েছেন তাই হলো। এই হযরত হুসাইন আপনাকে এবং হিজায ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এরপর তিনি এ-কবিতা আবৃত্তি করেন,

مَا لَكِ مِنْ قُنْبُرَةٍ بِمَعْمَرِ

خَلَا لَكِ الْجَوُّ فَابِيْضِيْ وَاصْفِرِيْ

وَنَقِّرِيْ مَا شِئْتِ أَنْ تُنَقِّرِيْ

صَيَادُكِ الْيَوْمَ عَلَيْكِ فَابْشِرِيْ

হে পাখি! কেবল এই বিস্তৃর্ণ সবুজভূমি নয়;
উন্মুক্ত আকাশও তোমার জন্য অবারিত।
যেখানে খুশি তুমি ডিম দাও, বাচ্চা ফোটাও।
সেখান থেকে ইচ্ছে খাবার সংগ্রহ করো।
কারণ তোমার শিকারী আজ তোমার সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে।

ইরাকবাসীর পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন-কে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে বহু চিঠিপত্র ও দূত পাঠিয়েছিল। এ-কারণে হযরত হুসাইন ১০ যুলহজ মক্কা থেকে ইরাকের পথে রওনা হন। তাঁর সাথে পবিত্র আহলে বায়তের পুরুষ-নারী ও শিশুদের বিশাল একটি দল ছিলেন। অন্যদিকে ইয়াযিদ ইরাকের গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে হযরত হুসাইন-এর সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। যুদ্ধের ৪ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন জন্যে আমর ইবনে সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস। সেই পরিস্থিতিতে কুফাবাসী তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী হযরত হুসাইন-এর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে, যেমনটা ইতঃপূর্বে তারা তাঁর পিতা ও বড় ভাইয়ের

সাথে করেছিলো। সশস্ত্র বাহিনী যখন পথিমধ্যেই হযরত হুসাইন -কে ঘিরে ফেলে তিনি সন্ধি, মক্কার ফিরে যেতে বা সরাসরি ইয়াযিদের মুখোমুখী হওয়ার প্রস্তাব করেন, এতে তিনি ইয়াযিদের হাতে হাত রেখেই বায়আত গ্রহণ করবেন। তারা তাঁর কথা নাকচ করে দিল এবং তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে গেল। অতঃপর তাঁকে শহীদ করা হলো এবং (ইরাকের গভর্নর ওবাইদুল্লাহ) ইবনে যিয়াদের সামনে তাঁর ছিন্ন মস্তক একটি পাত্র করে নিয়ে আসা হলো। তাঁর সকল খুনি বিশেষত ইবনে যিয়াদ উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত হোক, ইয়াযিদের ওপরও।

হযরত হুসাইন কারবালা-প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেছেন। এই ঘটনা বেশ লম্বা। এমন হৃদয়বিদারক যে তার বর্ণনা লেখকের পক্ষে সবিস্তারে আলোচনা সম্ভব নয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। হযরত হুসাইন -এর সাথে আহলে বায়তের সতের জন লোক শাহাদত বরণ করেছিলেন।

হযরত হুসাইন -এর শাহাদতের পর সাত দিন ধরে পৃথিবী অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিলো। সূর্যের মৃয়মান আলো হলুদ বর্ণ ধারণ করে দেয়ালে দৃশ্যমান হতো। আকাশের তারকাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছিলো। তাঁর শাহাদতের দিনটি ছিল আশুরা-দিবস। এই দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তাঁর শাহাদাতের পর ছয়মাস ধরে পশ্চিমাকাশে লাল আভা ছড়িয়ে থাকতো। আর সে-দিন থেকেই (সূর্যের অস্তাচলে) আজো সে-রক্তিমাভা পরিদৃষ্ট হয়, তা হযরত হুসাইন -এর শাহাদাতের পূর্বে কখনো দেখা যেত না।

কথিত আছে, হযরত হুসাইন -এর শাহাদাতের দিন বায়তুল মুকাদ্দাসের যেখানেই যেকোনো পাথর উল্টানো হয় তার নিচে তরতাজা রক্ত দেখা গেছে। পক্ষান্তরে শত্রু-সৈন্যদের তর-তাজা সব শষ্য-ফসল মাটি হয়ে গিয়েছিলো। শত্রু-সেনাদের জন্য যদি কোনো উট যবেহ করা হলে তার গোশতে আগুন দেখা যেতো। গোশতগুলো রান্না করা হলে তা তিক্ত হয়ে যেতো। একদিন জনৈক লোক হযরত হুসাইন সম্পর্কে একটি কটূক্তি করলে সাথে সাথে আসমান থেকে একটি নক্ষত্র নিক্ষেপিত হয় এবং লোকটির চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

ইমাম আস-সা'লাওয়ী বলেন, বেশ কিছু বর্ণনার মধ্যে এও বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ فِيْ هَذَا الْقَصْرِ وَأَشَارَ إِلَى قَصْرِ الْإِمَارَةِ بِالْكُوْفَةِ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ عَلَى تُرْسٍ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَأْسَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ بَيْنَ يَدَيِ الْمُخْتَارِ بْنِ

أَبِيْ عُبَيْدٍ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارَ بَيْنَ يَدَيْ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَأْسَ مُصْعَبٍ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَبْدُ الْمَلِكِ، فَتَطِيْرُ مِنْهُ وَفَارَقَ مَكَانَهُ».

'হযরত আবদুল মালিক ইবনে আমর আল-লায়সী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি কুফার প্রশাসনিক ভবনের দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে বলেন, আমি এই ভবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সম্মুখে হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর ছিন্ন মস্তক একটি গাছের ডালে ঝোলানো দেখেছি। একইভাবে পরে হযরত মুখতার ইবনে আবু ওবায়দের সম্মুখে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কর্তিত মস্তক ঝুলতে দেখেছি। পরবর্তীতে এভাবে মুসআব ইবনুয যুবায়রের সম্মুখে মুখতারের বিচ্ছিন্ন মস্তক ঝুলতে দেখেছি। এরপরে অনুরূপভাবে আবদুল মালিকের সম্মুখে মুসআব (ইবনুয যুবায়র)-এর ছিন্ন মস্তক ঝুলতে দেখেছি। পুরো ঘটনা যখন তৎকালীন প্রশাসক আবদুল মালিকের কাছে আমি বর্ণনা করি। তখন তিনি এই ভবনকে অলক্ষুণে আখ্যায়িত করে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।'[১]

যখন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে তাঁদের ছিন্নমস্তক ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ইয়াযিদের কাছে পাঠায়। এতে তিনি প্রথমে আনন্দিত হন, পরে এ-ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসলমানের ভৎর্সনা, তার প্রতি জনগণের বৈরি মনোভাবের মুখে সে অনুতপ্ত হয়। ইয়াযিদের প্রতি জনগণের বৈরিতা অবশ্য ন্যায়ানুগ ছিল।

৬৩ হিজরীতে ইয়াযিদ জানতে পারলেন যে, মদীনাবাসী ইয়াযিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরুচ্ছে এবং তার বায়আত বাতিল করে দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। একই সাথে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যার করতে মক্কার পথে আরেকটি সেনাদল প্রেরণ করেন। মদীনা অভিমুখে প্রেরিত সেনারা পবিত্র নগরীর কাছে এক ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায় যা হাররা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। হাররা-আগ্রাসন সম্পর্কে কী জানেন আপনারা? সেটা এমন এক ট্রাজেডি যার আলোচনা কোনো হৃদয়বান মানুষ সহ্য করতে পারে না, যার বর্ণনা শোনার

---

[১] আস-সুয়ূতী, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১৫৬–১৫৭

মতো শক্তি মনুষ্যকর্ণের নেই। হাররা-আগ্রাসন সম্পর্কে হযরত হাসান আল-বাসারীর বলেন, আল্লাহর কসম! এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে কেউ রেহাই পায়নি। এতে সাহাবায়ে কেরামসহ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শাহাদাতবরণ করেন। মদীনা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, সহস্রাধিক নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

«مَنْ أَخَافَ الْمَدِينَةَ أَخَافَهُ اللهُ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

'যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর মনে ত্রাসের সৃষ্টি করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ত্রাস ও আতঙ্ক তাকে সর্বদা তাড়া করে ফিরবে। এ ব্যক্তির ওপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও গোটা মানবজাতির অভিশাপ।'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।[১]

মদীনাবাসীর পক্ষ থেকে ইয়াযিদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে, তিনি স্বেচ্ছাচারিতায় সীমা ছাড়িয়েছিলেন।

একাধিক সূত্রে ইতিহাসবেত্তা ইমাম আল-ওয়াকিদী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা ইবনুল গাসীল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«وَاللهِ مَا خَرَجْنَا عَلَىٰ يَزِيْدَ حَتَّىٰ خِفْنَا أَنْ نُرْمَى بِالْحِجَارَةِ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ رَجُلًا يَنْكِحُ أُمَّهَاتَ الْأَوْلَادِ وَالْبَنَاتَ وَالْأَخَوَاتَ، وَيَشْرِبُ الْخَمْرَ، وَيَدَعُ الصَّلَاةَ».

'আল্লাহর কসম! আমরা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেরুতাম না, তবে আমরা আশঙ্কা করছিলাম, কখন জানি আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বর্ষিত হয়। কারণ সে-সময় লোকজন নিজেদের বোন ও কন্যাদের বিয়ে করছিল, মদ্যপান করছিল এবং সালাত বর্জন করছিল।'

ইমাম আয-যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইয়াযিদ মদীনাবাসীর সাথে যা করার করেছে। এ ছাড়াও তিনি মদ্যপায়ী এবং বহুবিধ অপকর্মে লিপ্ত ছিলেন। এ-কারণে মানুষ তার ওপর ক্ষুব্ধ হয় এবং সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের ডাক দেয়। আল্লাহ ইয়াযিদের জীবনকে অশুভ করুন, তিনি হযরত (আবদুল্লাহ)

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৯৯৪, হাদীস: ৪৬৩ ও ৪৬৪ (১৩৬৬)

ইবনুয যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে লড়াইয়ে জন্যে মক্কায় সৈন্য প্রেরণ করেছেন। অতঃপর পথে সেনাপতি মারা যায়। দ্বিতীয় সেনাপতি নিয়োগ করেন তিনি। সে মক্কায় প্রবেশ করে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে অবরোধ করে, তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁকে কামান দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এসব ঘটেছে ৬৪ হিজরীর সফর মাসে। এই কালো দিবসে তাদের ধ্বংসযজ্ঞের অগ্নিস্ফূলিঙ্গে কাবার গিলাফ ও ছাদ এবং হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর ফিদিয়া হিসেবে দেয়া সেই ভেড়া দুই সিংহ যা কাবা শরীফের ছাদে ছিল সবই পুড়ে যায়। এ-বছর রবিউল আউওয়ালের মাঝামাঝি সময়ে ইয়াযিদকে আল্লাহ ধ্বংস করেন। মুহূর্তে এ-খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।[১]

---

[১] (ক) আয-যাহাবী, *তারিখুল ইসলাম*, খ. ৫, পৃ. ৩০; (খ) আস-সুয়ুতী, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১৫৮–১৫৯

মাহে সফর

মনে রাখতে হবে যে, সফরের কুসংস্কার এবং মাসটিকে অলক্ষুণে ভাবার ক্ষেত্রে বহু হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আমরা প্রথমে এ-বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করবো এবং তারপর এ-প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ আলোচনায় আনবো।

জামিউল উসূলের হাদীসসমূহ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُوْلَ».

'হযরত জাবির ইবনে (আবদুল্লাহ ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন, 'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, সফর মাসে কোনো অশুভ নেই, ভূত-প্রেত বলতে কিছুই নেই।'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُوْلَ».

'হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, 'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, সফর মাসে কোনো অশুভ নেই, ভূত-প্রেত বলতে কিছুই নেই।'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।[২]

---

[১] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৫, হাদীস: ১০৯ (২২২২); (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৩–৬৩৪, হাদীস: ৫৮০৮

[২] (ক) আল-বায্যার, *আল-বাহরুয যাখ্খার*, খ. ১৫, পৃ. ৩৪০, হাদীস: ৮৮৯৯ ও পৃ. ৩৬৪, হাদীস: ৮৯৪৮; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৩–৬৩৪, হাদীস: ৫৮০৮

وَرَوَىٰ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، [قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ] قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ»، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا بَالُ إِبِلِيْ، تَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟»

'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, 'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, সফর মাসে কোনো অশুভ নেই, পেঁচায় কুলক্ষণ নেই।' এক বেদুইন বললো, হরিণের মতো ক্ষিপ্র মরুভূমির উটের পালে চর্মরোগী উট প্রবেশ করে সব উটের মাঝে তার রোগ ছড়িয়ে দেয়, এ-সম্পর্কে কী বলবেন? জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন (পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন), 'তাহলে তুমি বলো, প্রথম উটের চর্মরোগটি কোথা থেকে আসলো'?

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী (রহ.)[১], ইমাম মুসলিম (রহ.)[২] ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.)[৩] বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আল-বুখারী (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে,

[١] «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ».

'(১) রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই, পেঁচায় কুলক্ষণ নেই, সফর মাসে অকল্যাণ নেই।'[৪]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে,

[٢] «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا نَوْءَ، وَلَا صَفَرَ».

'(২) রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, পেঁচায় কুলক্ষণ নেই, নক্ষত্র পতনে কোনো অশুভ নেই, সফর মাসে অকল্যাণ নেই।'[৫]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, الطب, لَا صَفَرَ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ, খ. ৭, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৫৭১৭ ও পৃ. ১৩৭, হাদীস: ৫৭৭০

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪২, হাদীস: ১০১ (২২২০)

[৩] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৭, হাদীস: ৩৯১১

[৪] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৫৭০৭ ও পৃ. ১৩৫, হাদীস: ৫৭৫৭

[৫] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৪, হাদীস: ১০৬ (২২২০)

ইমাম মুসলিম-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে,

[৩] «وَلَا غُوْلَ».

'(৩) ভূত-প্রেত বলতে কিছু নেই।'[১]

وَعَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَـدْوَى، وَلَا هَـامَ، وَلَا صَـفَرَ، وَلَا يَحُـلَّ الْـمُمْرَضُ عَلَى الْـمُصِحِّ، وَلْيَحِـلَّ الْـمُصِحُّ حَيْـثُ شَاءَ»، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَذًى».

'হযরত ইবনে আতিয়া () থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, রোগের সংক্রমণ বলে কিছু নেই, পেঁচা অশুভ পাখি নয় এবং সফর মাসে অমঙ্গলজনক কিছু নেই। তবে রোগা উটকে সুস্থ উটের সাথে রেখ না (বেঁধ না)। অবশ্য সুস্থ উটকে যেখানে ইচ্ছা রাখতে পার। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! এ-রকম কেন? তিনি জবাব দিলেন, 'রোগ একটি কষ্ট বিশেষ (এতে অন্য উটদের কষ্ট হয়)।''

হাদীসটি ইমাম মালিক (ইবনে আনাস) তাঁর *মুওয়াত্তায়* বর্ণনা করেছেন।[২]

আল-জামিউল কবীরের হাদীসসমূহ

«لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْـمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ».

'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই, পেঁচায় কুলক্ষণ নেই, সফর মাসে অকল্যাণ নেই। শ্বেতরোগী থেকে সেভাবে দূরত্ব বজায় রাখো যেমনটি তোমরা বাঘ থেকে পালিয়ে বাঁচো।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল) তাঁর *মুসনদে*[৩] ও ইমাম আল-বুখারী[৪] হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৫, হাদীস: ১০৭, ১০৮ ও ১০৯ (২২২২), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবির থেকে বর্ণিত; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৪, হাদীস: ৫৮০৯

[২] (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ৫, পৃ. ১৩৮০, হাদীস: ৭৫০; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৬৪১, হাদীস: ৫৮১৪

[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৫, পৃ. ৪৪৯, হাদীস: ৯৭২২

[৪] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৫৭০৭

«لَا يُعْدِيْ شَيْءٌ شَيْئًا، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ؛ خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا».

'রোগব্যাধি একজন থেকে অন্যজনে সংক্রমিত হয় না। (যদি এমন হতো তবে) প্রথমজন কীভাবে আক্রান্ত হলো? অতএব রোগের কোনো সংক্রমণ নেই এবং সফর মাসে কোনো অকল্যাণ নেই। প্রত্যেক প্রাণীকে সৃষ্টি করে আল্লাহর তার জীবন, জীবিকা ও বিপদাপদ লিখে দিয়েছেন।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল) তাঁর মুসনদে ও ইমাম আত-তিরমিযী হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

«لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُوْلَ».

'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, পেঁচায় কুলক্ষণ নেই, নক্ষত্র পতনে কোনো অশুভ নেই, সফর মাসে অকল্যাণ নেই এবং ভূত-প্রেত বলতে কিছু নেই।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল) ও ইমাম মুসলিম হযরত জাবির (ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[২]

«لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ».

'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, সফর মাসে অকল্যাণ নেই এবং পেঁচায় কুলক্ষণ নেই।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল-এর), ইমাম আল-বায়হাকী ও ইমাম আবু দাউদ হযরত আবু হুরায়রা থেকে এবং ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল) ও ইমাম মুসলিম সায়িব ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩]

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৭, পৃ. ২৫২, হাদীস: ৪১৯৮; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৪৫০–৪৫১, হাদীস: ২১৪৩

[২] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, খ. ২২, পৃ. ১৮–১৯, হাদীস: ১৪১১৭ ও খ. ২৩, পৃ. ৩২২, হাদীস: ১৫১০৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৪, হাদীস: ১০৭, ১০৮ ও ১০৯ (২২২২)

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৩, পৃ. ৫৮, হাদীস: ৭৬২০ ও খ. ২৪, পৃ. ৫০২, হাদীস: ১৫৭২৭; (খ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৩৫২, হাদীস: ১৪২৩৫; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৭, হাদীস: ৩৯১১; (ঘ) মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৩, হাদীস: ১০৩ (২২২০)

«لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا يُعْدِيْ سَقِيْمٌ صَحِيْحًا».

'সফর মাসে অকল্যাণ নেই, পেঁচায় কুলক্ষণ নেই এবং কারো রোগ অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।'

হাদীসটি কাযী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী আল-আনসারী তাঁর *জুযউন মিনাল হাদীস* গ্রন্থে তাঁর শায়খের বরাতে হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

«لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، لَا عَدْوَىٰ، وَلَا يَتِمُّ شَهْرَانِ سِتِّيْنَ يَوْمًا وَمَنْ خَفَرَ ذِمَّةُ اللهِ لَمْ يَرُحْ رِيْحَ الْجَنَّةِ».

'সফর মাসে কোনো অকল্যাণ নেই, পেঁচায় কুলক্ষণ নেই, রোগের কোনো সংক্রমণ নেই। কোনো মাস ষাট দিনে হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর যিম্মাদারিতে অর্পণের ক্ষেত্রে নিজে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।'

হাদীসটি ইমাম আত-তাবরানী তাঁর *আল-মু'জামুল কবীরে*[২] এবং ইমাম ইবনে আসাকির[৩] আবদুর রহমান ইবনে আবু আমীরা আল-মুযানী-এর থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আত-তাবরানী হযরত আবু উমামা থেকে নিম্নোক্ত ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন,

«لَا عَدْوَىٰ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَ، وَلَا يَتِمُّ شَهْرَانِ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا، وَمَنْ خَفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ لَمْ يَرُحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, সফর মাসে কোনো অকল্যাণ নেই, পেঁচায় কুলক্ষণ নেই। দুই মাস কখনো ত্রিশ দিনে হয় না। আর যে ব্যক্তি নিজের নিরাপত্তার বিষয়টি আল্লাহর জিম্মায় অর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।'[৪]

«لَا عَدْوَىٰ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا،

---

[১] (ক) আবু মুসহির আল-গাস্সানী, *নুসখা*, পৃ. ৬৩, হাদীস: ৭৬; (খ) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৩৩৮–৩৩৯, হাদীস: ৪৩০ ও ৪৩১; (গ) ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তাহযীবুল আসার*, খ. ৩, পৃ. ৩–৪, হাদীস: ২

[২] নুরুদ্দীন আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, খ. ৩, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ৪৮২০

[৩] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৩৫, পৃ. ২৩১, হাদীস: ৭১৫০

[৪] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৮, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ৭৭৬১

وَمَوْتَهَا، وَمُصِيبَاتِهَا، وَرِزْقَهَا».

'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, পেঁচায় কোনো কুলক্ষণ নেই, সফর মাসে কোনো অকল্যাণ নেই। প্রত্যেকটি প্রাণীকে আল্লাহ সৃষ্টি করে তার জীবন-মরণ, বিপদাপদ ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল)[১] ও ইমাম খতীব (আল-বগদাদী)[২] হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

«لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ».

'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই, পেঁচায় কোনো কুলক্ষণ নেই, সফর মাসে কোনো অকল্যাণ নেই। (যদি থাকতোই তবে) রোগী প্রথমবার কিভাবে আক্রান্ত হয়।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল)[৩], ইমাম ইবনে মাজাহ[৪] ও ইমাম আত-তাবারানী তাঁর *আল-মু'জামুল কবীরে*[৫] হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

«لَا عَدْوَى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحِلَّ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ». قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ أَذًى».

'রোগের সংক্রমণ বলে কিছু নেই, পেঁচা অশুভ পাখি নয় এবং সফর মাসে অমঙ্গলজনক কিছু নেই। তবে রোগা উটকে সুস্থ উটের সাথে রাখা উচিত নয়। অবশ্য সুস্থ উটকে যেখানে ইচ্ছা রাখতে পার। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! এ-রকম কেন? তিনি জবাব দিলেন, 'রোগ একটি কষ্ট বিশেষ (এতে অন্য উটদের কষ্ট হয়)।''

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী[৬] হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৪, পৃ. ৮৫, হাদীস: ৮৩৪৩
[২] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারিখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: ৩৬৯৩
[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৪৬–২৪৭, হাদীস: ২৪২৫
[৪] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১১৭১, হাদীস: ৩৫৩৯
[৫] আত-তাবারানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১১, পৃ. ২৮৮, হাদীস: ১১৭৬৪
[৬] আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৩৫৪, হাদীস: ১৪২৪০

«لَا عَدْوَىٰ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ وَاتَّقُوا الْمَجْذُوْمَ كَمَا تَتَّقُوْنَ الْأَسَدَ».

'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, পেঁচায় কোনো কুলক্ষণ নেই, সফর মাসে কোনো অকল্যাণ নেই। তবে শ্বেতরোগী থেকে এভাবে দূরে থেকো যেমন মানুষ বাঘ থেকে পালিয়ে বাঁচে।'[1]

«لَا عَدْوَىٰ، وَلَا هَامَةَ وَلَا غُوْلَ، وَلَا صَفَرَ».

'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, পেঁচায় কোনো কুলক্ষণ নেই, ভূত-প্রেত বলতে কিছুই নেই এবং সফর মাসে কোনো অকল্যাণ নেই।'

হাদীসটি ইমাম ইবনে জরীর (আত-তাবারী)[2] হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيْدَ الْحِمَّانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا يُعْدِيْ سَقِيْمٌ صَحِيْحًا». قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ سَمْعُ أُذُنِيْ، وَبَصَرُ عَيْنِيْ.

'হযরত সা'লাবা ইবনে ইয়াযিদ আল-হিম্মানী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী-কে বলতে শুনেছি, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'সফর মাসে অকল্যাণ নেই, পেঁচায় কুলক্ষণ নেই এবং কারো রোগ অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।' আমি প্রশ্ন করি, এসব কি আপনি নিজে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমার নিজের কানে শুনেছি এবং নিজের চোখে দেখেছি।'

হাদীসটি ইমাম ইবনে জরীর (আত-তাবারী)[3] বর্ণনা করেছেন এবং তার বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

আমরা এখন হাদীসসমূহের আলোচনা শেষ করে صَفَر শব্দের অর্থ-উদ্দেশ্য কী তার আলোচনা শুরু করবো।

---

[1] আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ১৪২৪৬
[2] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তাহযীবুল আসার*, খ. ৩, পৃ. ৮, হাদীস: ৯
[3] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩, হাদীস: ১ ও ২

ইমাম ইবনুল আসীর রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *আন-নিহায়া* গ্রন্থে বলেছেন, আরবদের ধারণা মতে, মানুষের পরিপাকতন্ত্রের কিছু কীট (বা ক্রিমি) যা ক্ষুধা পেলে কামড়াতে থাকে এবং কষ্ট দেয়। ফলে মানুষ অসুস্থ হয়। কিন্তু ইসলাম এ-ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে।[১]

আল-কিরমানী শরহুল বুখারী গ্রন্থে এসেছে, صَفَر শব্দটি ص ও ف উভয়ে যবর-সহকারে এর অর্থ পেটের কীট (ক্রিমি) বিশেষ। এই কীট চর্মরোগের চেয়েও অধিক সংক্রামণ করে বলে মানুষের ধারণা।[২]

আত-তীবী শরহুল মিশকাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, আরবদের ধারণা মতে, মানুষের উদরস্থ কীট যা ক্ষুধা পেলে পেটের ভেতরে কামড়াতে থাকে। মানুষের ক্ষুধার সময় যে-যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় তা এই কামড়ানো কারণে।[৩]

কারো কারো মতে, তা প্রসিদ্ধ একটি মাস। আরবদের ধারণা হচ্ছে, এ-মাসে মানুষ বেশিমাত্রায় বিপদাপদে নিপতিত হয়। ইসলাম এমন ধারণা নাকচ করে দিয়েছে।

আন-নিহায়া গ্রন্থে আছে, কেউ কেউ বলেছে, এর অর্থ-উদ্দেশ্য হলো বিলম্ব। অর্থাৎ মুহার্‌রমকে কয়েকদিন বিলম্ব করে সফর মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া এবং সফর মাসকে মুহার্‌রম মাস আখ্যায়িত করে মাসটিকে বিশেষভাবে মর্যাদাসম্পন্ন বলে অভিহিত করা।[৪]

মুসলিম শরীফের ওপর ইমাম নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এসেছে, اَلصَّفَرُ শব্দের হচ্ছে পরিপাকতন্ত্রের সেসব دَوَابٌّ কীট যা ক্ষুধা পেলে কেঁচোর মতো মোচড় দিতে থাকে, অনেক সময় ওদের যন্ত্রণায় মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।[৫]

دَوَابٌّ সর্বসম্মতভাবে বিন্দুবিহীন د ও এক বিন্দুবিশিষ্ট ب-সহযোগে একটি শব্দ। অবশ্য বিন্দুবিশিষ্ট ذ উপরে বিন্দুসহকারেও বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যাও রয়েছে।[৬]

আন-নিহায়া গ্রন্থে আছে, আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করতে গিয়ে صَفْرَةٌ (চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করা) অবলম্বন অর্থাৎ উপবাস থাকা একটি হৃষ্টপুষ্ট

---

[১] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৩, পৃ. ৩৫
[২] আল-কিরমানী, *আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শরহুল বুখারী*, খ. ২১, পৃ. ৩
[৩] আত-তীবী, *আল-কাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান*, খ. ৯, পৃ. ২৯৮০
[৪] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৫
[৫] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ*, খ. ১৪, পৃ. ২১৫
[৬] আন-নাওয়াওয়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৪, পৃ. ২১৮

লাল রঙের উটের মালিক হওয়ার চেয়ে উত্তম। আর কলিজা ও ফুসফুসের মাঝে সৃষ্ট কীটকেও صَفَر বলে। এতে মানুষের শরীরের রঙ একেবারে হলুদ হয়ে যায়। অনেক সময় এর কারণে মানুষের মৃত্যুও ঘটে থাকে। (এটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় জন্ডিস বা হেপাটাইটিস বলে।)[১]

কাযী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *মাশারিকুল আনওয়ার* গ্রন্থে এসেছে, হাদীসের ভাষ্য: «لَا صَفَرَ»; কারো কারো মতে, এতে বিখ্যাত সফর মাস উদ্দেশ্য। জাহেলি যুগে লোকেরা যার হুকুম ও ঋতু-স্বভাব বদলে দিত এবং মুহার্‌রমকে প্রলম্বিত করে সফরকেও মুহাররমের মতো বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখতো। এ-বক্তব্য ইমাম মালিক (ইবনে আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রমুখের।

আর কেউ কেউ বলেছেন, বরং «لَا صَفَرَ»-এর অর্থ হচ্ছে, পেটের এক জাতীয় কীট যা ক্ষুধা পেলে কামড়াতে থাকে এবং মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। ইসলাম এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।[২]

জামিউল উসূল গ্রন্থে এসেছে, ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বাকিয়া বলেছেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে রাশিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে হাদীসের ভাষ্য «لَا هَامَ» সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, জাহেলি যুগে লোকেরা বলতো, মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফনের পর সেখান থেকে هَامَةٌ (অলক্ষুণে আত্মা) বের হয়।

হাদীসের অন্য ভাষ্য: «لَا صَفَرَ» সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তখনকার লোকেরা সফর মাসের আগমনকে অলক্ষুণে বলে বিশ্বাস করতো। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, «لَا صَفَرَ» (সফর মাসে কোনো অলক্ষণ নেই)। হযরত মুহাম্মদ ইবনে রাশিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেন, আমি অনেককে বলতে শুনেছি, সফর পেটের পীড়া; যা মানুষকে অসুস্থ করে তোলো বলে তাদের ধারণা।[৩]

ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেন, ইমাম মালিক (ইবনে আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, জাহেলি যুগে লোকেরা সফর মাসকে এক বছর হালাল এবং এক বছর নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, «لَا صَفَرَ» (সফর মাসে কোনো অলক্ষণ নেই)।[৪]

---

[১] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৩, পৃ. ৩৬

[২] কাযী আয়ায, *মাশারিকুল আনওয়ার*, খ. ২, পৃ. ৪৯

[৩] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৮, হাদীস: ৩৯১৫

[৪] (ক) আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৭, হাদীস: ৩৯১৪; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৬–৬৩৭

জামিউল উসুলে সাদ বর্ণের অধীন শব্দাবলির বিশ্লেষণে আরও এসেছে, «لَا صَفَرَ»-এর ব্যাখ্যায় হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, আরবরা মনে করতো পেটে কিছু কীট রয়েছে যা ক্ষুধার সময় মানুষকে কামড়ায় ও কষ্ট দেয়। এতে মানুষ অসুস্থ হয়। ইসলাম এসব ভ্রান্ত ধারণাকে নাকচ করে দেয়।[১]

দুর্বল বান্দা—আল্লাহ তাঁকে সর্বসুস্থ রাখুন এবং তাঁর জন্য সব বোঝাকে সহজ করে দিন—বলেন, «صَفَر»-এর মর্মার্থ আরও অনেক মতামত এসেছে, এসবের সারাংস মোটামুটি তিনটি। যথা–

১. একটি নির্দিষ্ট মাস,
২. পরিপাকতন্ত্রের কীটবিশেষ,
৩. উপর্যুক্ত বিলম্বন (অর্থাৎ কোনো মাসবিশেষকে পিছিয়ে দিয়ে অন্য মাসে গণ্য করা এবং সে মাসের মর্যাদায় উন্নীত করা)।

অলক্ষণ অর্থে «صَفَر» উল্লিখিত হয়ে থাকলে তা প্রথম বক্তব্যেরই সমর্থন করে। আর সংক্রামক ব্যাধি অর্থ হলে তা দ্বিতীয় বক্তব্যের সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই ভালো জানেন। «صَفَر» শব্দটির বিশ্লেষণের এবার আমরা হাদীসে উল্লেখিত অন্যান্য শব্দাবলির ব্যাখ্যা করবো।

اَلْعَدْوَى

বলা হয়ে থাকে যে, أَعْدَى الْمَرَضُ (রোগ সংক্রমণ করল) অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কারো সংশ্রব, তার সাথে উঠা-বসা, কথা-বার্তা ও পানাহার ইত্যাদি কারণে যখন অসুস্থ হয়! ইসলামে এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এমনটিই এসেছে *জামিউল উসূলে*।[২]

اَلطِّيَرَةُ

জামিউল উসূলের গ্রন্থকার শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখেন, اَلطِّيَرَةُ হচ্ছে হাতের রেখা ইত্যাদি গুণে শুভ-অশুভ শনাক্ত করা এবং বিভিন্ন পাখিকে অলুক্ষণে মনে করা। আরবরা কাক ও টিয়া ইত্যাদি পাখিকে অলুক্ষণে মনে করতো এবং এসব পাখিকে অশুভ ভাবতো তারা। এদেরকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। ইসলাম এসব অমূলক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে

---

[১] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৪
[২] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৬৩১

বলেছে, «لَا طِيَرَةَ» (শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই)। শব্দটি ক্রিয়ামূল; যেমন- اَلتَّطَيُّر؛ تَطَيَّرَ الرَّجُلُ تَطَيُّرًا وَطِيَرَةً (কুলক্ষণ মনে করা; লোকটি কুলক্ষণ মনে করল, অশুভ ও কুলক্ষণ মনে করা)। যেমন বলা হয়ে থাকে, تَخَيَّرْتُ الشَّيْءَ تَخَيُّرًا وَخِيَرَةً (জিনিসটি আমি পছন্দ করেছি, পছন্দ করা, পছন্দসই হওয়া)। অবশ্য এই দুটো ছাড়া অনুরূপ আর কোনো ক্রিয়ামূল নেই।[১]

اَلْفَأْلُ

মূলত শব্দটি হামযাবিশিষ্ট, পরে উচ্চারণে সহজ করা হয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে, কোনো লোক অসুস্থ হলো, অন্য কেউ শুনে বলল, হে সুখী! অথবা কেউ কিছু খুঁজছিল, অন্য কেউ শুনে বলল, হে পাওনিয়া! এ-ধরণের আশাসঞ্চারী কথায় লোকটি সুস্থ হয়ে ওঠবে এবং তার হারানো বস্তুটি পেয়ে যাবে বলে আশা পোষণ করে। এই ধরনের আশাসঞ্চারী কথা ভালো। এর প্রকৃতি-বিশ্লেষণে সামনে আলোচনা আসছে।

ইমাম ইবনুল আসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, اَلْعَدْوَى শব্দটি اَلْإِعْدَاءُ থেকে উৎসারিত একটি বিশেষ্য। যেমনটি اَلْبَقْوَى শব্দটি اَلْإِبْقَاءُ থেকে উৎসারিত। أَعْدَاهُ الدَّاءُ অর্থাৎ লোকটি সেই রোগে আক্রান্ত হলো যা তার সহাবস্থানকারীর মধ্যে ছিলো। যেমনটি বলা হতো যে, চর্মরোগাক্রান্ত উটের কাছে সুস্থ উটকে যেতে সর্তকতা অবলম্বন করা হয়। এতে সুস্থ উটটিও সেই রোগে আক্রান্ত হবে এই ভয়ে। তাদের ধারণা হচ্ছে, এই অসুস্থ উটটিই রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একমাত্র দায়ী। ইসলাম এই ধারণাকে বাতিল করেছে।

এ জন্য নবী করীম ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন, 'রোগ-বালাই আল্লাহই দেন এবং তিনিই তার ওষুধপত্রও অবতীর্ণ করেছেন।'[২] তাই তিনি ইরশাদ করেন, «فَمَنْ أَعْدَى الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ؟» (তবে প্রথম উটটিকে কে রোগাক্রান্ত করল?) অর্থাৎ কোথা থেকে সে চর্মরোগ আক্রান্ত হলো?[৩]

আল্লামা আত-তূরবুশ্তী রহিমাহুল্লাহ তাঁর *শরহুল মিশকাত* গ্রন্থে বলেছেন, اَلْعَدْوَى হচ্ছে অভ্যাস ও রোগব্যাধি যা অন্যের দিকে সংক্রামিত হয়। চিকিৎসকগণের ধারণা অনুযায়ী এ জাতীয় ছোঁয়াচে রোগ ৭টি। যথা- ১. কুষ্ঠ,

---

[১] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৭, পৃ. ৬২৮
[২] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ৭, হাদীস: ৩৮৪৭
[৩] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৯২

২. চর্মরোগ, ৩. বসন্ত রোগ, ৪. হাম, ৫. মুখের দুর্গন্ধ, ৬. চোখ ওঠা ও ৭. মহামারী।[১]

কাযী আয়ায رحمه الله-এর *মাশারিকুল আনওয়ার* গ্রন্থে এসেছে, জাহিলি যুগের লোকেরা মনে করতো যে, সংশ্রব ও সহাবস্থানের ফলে অসুস্থ লোকের রোগ অন্যদের মাঝে সংক্রামিত হয়—এমন ধারণাই হচ্ছে اَلْعَدْوَى। শরীয়ত এই অমূলক ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর 'لَا عَدْوَى' (রোগের কোনো সংক্রমণ নেই) ঘোষণায় এমন অসার আকিদা-বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে অথবা এসব ধারণা সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভিত্তিহীন বলে বোঝানো হয়েছে। তা ছাড়া তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, 'কেউ কাউকে সংক্রমণ করে না।'[২] তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'প্রথম অসুস্থ ব্যক্তির রোগটি কার কাছ থেকে সংক্রামিত হয়ে এসেছে'? দুটো অর্থই শরীয়তের বিধিবদ্ধ।[৩]

اَلْهَامُ

শব্দটি هَامَةٌ-এর বহুবচন। এক জাতীয় পাখি; আরবরা ধারণা করতো, এই পাখি মৃত ব্যক্তির হাড় থেকে সৃষ্ট হয়ে হামা হয়ে উড়ে যায়। জাহিলি যুগে আরবরা বলতো, হামা নিহত ব্যক্তির শৃঙ্গ তথা মাথা থেকে বের হয়ে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায় আর আমাকে পানি দাও আমাকে পানি করাও ডাকতে থাকে। যে পর্যন্ত খুনিকে হত্যা করা না হয়।[৪]

আন-নিহায়া গ্রন্থে এসেছে, اَلْهَامَةُ হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুর মাথা, এক জাতীয় পাখি। হাদীসে শব্দটির এ-অর্থই উদ্দেশ্য। এর কারণ হচ্ছে, আরবরা এটাকে অশুভ বলে ধারণা করতো। হামা রাতজাগা পাখিদের অন্যতম। কারো মতে, হামা হলো পেঁচা। কারো কারো বক্তব্য হচ্ছে, আরবদের ধারণা মতে নিহত ব্যক্তির আত্মা যতদিন খুনের প্রতিশোধ না নেওয়া হয় ততদিন হামা হয়ে উড়ে বেড়ায় এবং 'আমাকে পান করাও'—রবে ডেকে যায়। প্রতিশোধ নেওয়া হলে সে উড়ে যায়।

কারো মতে, আরবরা ধারণা করতো, হামা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির হাড়। কেউ কেউ মনে করে, হামা মৃত ব্যক্তির আত্মা; যা হামা হয়ে উড়ে বেড়ায়।

---

[১] আত-তূরবুশতী, *আল-মায়সির*, খ. ৩, পৃ. ১০১০
[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৪৫০, হাদীস: ২১৪৩
[৩] কাযী আয়ায, *মাশারিকুল আনওয়ার*, খ. ২, পৃ. ৭০
[৪] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৭

লোকেরা একে اَلصَّدَى নামেও ডাকতো। ইসলাম এসব (অবাস্তর ও অহেতুক) ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছে এবং এ-ধরনের বিশ্বাস লালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।[১]

ইমাম আত-তীবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হামা মানুষের একটা কু-ধারণার নাম। আরবরা বিশ্বাস করতো, মৃত মানুষের হাড়গোড় জীর্ণ-শীর্ণ ও পচে গেলে হামার রূপ ধারণ করে, কবর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এ-বিশ্বাসকে অমূলক এবং অবাস্তব বলে ঘোষণা করেছেন।

অনেকের বিশ্বাস হামা হলো পেঁচা, এটা কারো ঘরের চালে বসলে তখন সে এটাকে নিজের বা পরিবারের কারো মৃত্যুর আগাম সংবাদ হিসেবে ধারণা করে কাঁদতে থাকে। শব্দটির প্রসিদ্ধি অনুসারে মীম বর্ণ সহজ উচ্চরণ হবে হামা। অবশ্য কেউ কেউ দ্বিত্বসহকারে হাম্মা উচ্চারণ করে।[২]

কাজী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হামা কবরস্থান আর মৃতদের সংশ্রবে থাকতে পছন্দ করে এমন একটি নিশাচর পাখি। এটাকে اَلصَّدَىও বলা হয়ে থাকে। এটা ঠিক পেঁচা নয়, তবে দেখতে পেঁচার মতো। আরবদের বিশ্বাস, যখন কোনো মানুষ খুন হয় এবং যে-পর্যন্ত তার খুনের প্রতিশোধ নেওয়া না হয় তার হামা অর্থাৎ মাথার উপরিভাগ থেকে একটা পাখি বের হয়ে তার কবরের ওপর 'আমাকে পান করাও, আমি তৃষ্ণার্থ' বলে চেঁচামেচি করতে থাকে। এ-ধারণার ওপর অনেক আরবী কবিতাও রচিত হয়েছে।

আর কারো মতে, মৃতের মাথা থেকে একটা পোকা বের হয় সেটি পাখির রূপ ধারণ করে রক্তপাতের ডাক দিয়ে যায়। নবী করীম ﷺ এই ভিত্তিহীন ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতে বলেছেন। এটিই প্রবলভাবে অনুমেয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ওলামা কেরামও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। আল-হারবী ও আবু ওবায়দ প্রমুখের রায়ও একই।

মালিক তাঁর *তাফসীর* গ্রন্থে বলেছেন, এটা এমন এক পাখি যাকে হামা বলা হয়ে থাকে। কাজী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, খুব সম্ভব তিনি হয়তো এর দ্বারা অশুভ-অলক্ষণ ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করেছেন। কারণ আরবরা হামা খ্যাত পাখিকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক ধারণা করতো।

আবার অনেকে হামা থেকে শুভ লক্ষণ অর্থের প্রবক্তা। তাদের মধ্যে শিম্‌র ইবনে হামদুওয়াইহ এর সুলক্ষণ অর্থের পক্ষে একজন শক্তিশালী

---

[১] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া,* খ. ৩, পৃ. ২৮৩
[২] আত-তীবী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৯, পৃ. ২৯৭৯

প্রবক্তা। তাঁর নিকট ইমাম ইবনুল আরাবী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবু ওবায়দুল্লাহ বলেন, আরবরা ধারণা করতো, মৃত মানুষের হাড়গোড় হামার রূপ ধারণ করে উড়ে যায়। সেটা এমন এক পাখির নাম যা মৃত মানুষের জীর্ণ-শীর্ণ ও পচা মাথার উপরিভাগের থেকে বের হয়। এটাকে اَلصَّدَى'ও বলা হয়।'[১]

اَلْغَوْلُ

জামিউল উসূলের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, আরবদের ধারণা মতে, একটা জন্তুবিশেষ যা বিভিন্ন সময় পথে-প্রান্তে হঠাৎ করে মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ করে এবং নিরীহ মানুষজনকে ধ্বংস করে দেয়। এটা এক শ্রেণির শয়তান। নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য: «وَلَا غُوْلَ»-এ এই ধরনের দুষ্ট দানব ও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি। বরং এই জাতীয় দুষ্ট উপদ্রব ও তাদের বিভিন্ন রূপ ধারন বিষয় আরবদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে এখানে অপনোদন করেছেন তিনি। তিনি ইরশাদ করেন,

«لَا تُصَدِّقُوْا بِذَلِكَ».

'তোমরা এসব বিশ্বাস করো না।'[২]

আন-নিহায়া গ্রন্থে এসেছে, اَلْغَوْلُ শব্দটি একবচনের। اَلْغِيْلَانُ এর বহুবচন। বস্তুত اَلْغَوْلُ হলো এক জাতীয় দুষ্ট দানব ও শয়তানি অপচ্ছায়া। আরবদের ধারণা করতো, গাওল বনজঙ্গলে হঠাৎ মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ করে, অতঃপর يَتَغَوَّلُ تَغَوُّلًا (অর্থাৎ ওরা বহুরূপ ধারণ করে), يَغُوْلُهُمْ (অর্থাৎ তাদের পথ ভুলিয়ে দেয়) এবং তাদেরকে জীবনঝুকিতে ফেলে দেয়। নবী করীম ﷺ এমন ধারণা ও বিশ্বাসকে নাকচ করে দিয়েছেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কারো কারো বক্তব্য হচ্ছে, নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য: «وَلَا غُوْلَ»-এ জিন ও শয়তানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি, বরং পথেঘাটে বিভিন্ন আকৃতি ধরে এক জাতীয় দুষ্ট দানবের উপদ্রব অর্থাৎ পথে বিভ্রাট তৈরির ব্যাপারে আরবদের বিশ্বাসের মূলে নবী করীম ﷺ কুঠারাঘাত করেছেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ: «لَا غُوْلَ، وَلَكِنِ السَّعَالِيْ» (অপচ্ছায়া বলতে কিছু নেই, তবে সাআলীর অপতৎপরতা অনস্বীকার্য) থেকে তা বেশ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

---

[১] কাযী আয়াষ, *মাশারিকুল আনওয়ার*, খ. ২, পৃ. ২৭২-২৭৩

[২] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৮, পৃ. ৬৩৪

সাআলী হচ্ছে দুষ্ট দানবজাতির জাদু, অর্থাৎ দানবজাতির মধ্যে অনেকেই ভেল্কিবাজিতে পারদর্শী। তারা বহুরূপ ধারণ এবং মানুষকে সম্মোহিত করতে সিদ্ধহস্ত। এ-প্রেক্ষাপটে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

«وَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ، فَنَادُوْا بِالْأَذَانِ».

'তোমরা যখন জাদুকর দানবের খপ্পরে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে আযান দেবে।'[১]

অর্থাৎ তোমরা তাদের উপদ্রবকে আল্লাহর যিকর দ্বারা প্রতিরোধ কর। এতে তারা বিপ্রস্ত হয়ে পড়বে। নবী করীম ﷺ-এর এই হাদীস প্রমাণিত করে যে, এসব দুষ্ট দানবজাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

ইমাম আল-বাগাওয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বস্তুত প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে ভূত-প্রেতাত্মরা মানুষকে বিভ্রান্ত ও হত্যার কোনো ক্ষমতা রাখে না। যা ঘটে আল্লাহর হুকুমেই ঘটে।

বলা হয়েছে, اَلْغِيْلَانُ হলো দুষ্ট দানবজাতির জাদু; এর মাধ্যমে তারা মানুষকে পথভ্রান্ত করে।[২]

আল-মাফাতীহ শরহুল মাসাবীহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শব্দটি ফাতাহ-সহকারে একটি ক্রিয়ামূল। غَالَهُ: أَهْلَكَهُ (তাকে ধ্বংস করল)। শব্দটি যাম্মা-সহকারে হলে একটি বিশেষ্য; আরবদের ধারণা মতে, তা হঠাৎ মানুষজনের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। শরীয়ত এ-জাতীয় বিশ্বাসকে নাকচ করেছে। এও হতে পারে যে, নবী করীম ﷺ-এর আগমনের ফলে এই জাতীয় দুষ্ট দানবজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমনটি আসমানের নিকটে গিয়ে শয়তানের আঁড়িপাতার পথ রুদ্ধ হয়েছে।[৩]

ইমাম আত-তীবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, «أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ» (অর্থাৎ আমি গুপ্ত হত্যা থেকে আশ্রয় কামনা করছি।[৪]) শীর্ষক হাদীসটিও গূল-বিষয়ক। বস্তুত কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধ্বংস করাকে গূল বলা হয়।[৫]

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২২, পৃ. ১৭১, হাদীস: ১৪২৭৭ ও খ. ২৩, পৃ. ৩১৫, হাদীস: ১৫০১১, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত

[২] আল-বাগাওয়ী, *শরহুস সুন্নাহ*, খ. ১২, পৃ. ১৭৩

[৩] মোল্লা আলী আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, খ. ৭, পৃ. ২৮৯৫

[৪] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৮, পৃ. ২৮২, হাদীস: ৫৫৩০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত

[৫] আত-তীবী, *শারহ*, খ. ৬, পৃ. ১৮৮২

আমি বলবো, উপর্যুক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে নিম্ন বর্ণনাটির ভাষ্য থেকে সমর্থন পাওয়া যায়,

«وَأَعُوذُ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي».

'আর আমি ভূগর্ভে ধসে যাওয়া থেকে আশ্রয় কামনা করছি।'[১]

অর্থাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাটির নীচে ধসে যাওয়া, এখানে এর অর্থ ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়া। এ-বক্তব্য *আন-নিহায়া* গ্রন্থের।[২]

কাজী আয়ায রহিমাহুল্লাহ তাঁর *আল-মাশারিক* গ্রন্থে বলেন, নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র ইরশাদ: «وَلَا غُوْلَ» গইন বর্ণে যাম্মা-সহকারে—এই হাদীসের ব্যাখ্যায় এসেছে, اَلْغُوْلُ الَّتِيْ تَغَوَّلَ তা ও গইন বর্ণে ফাতহ-সহকারে (গূল হচ্ছে যা মানুষকে পথ ভুলিয়ে দেয়)। অর্থাৎ এরা অপচ্ছায়ার মতো দ্রুত বহুরূপ ধারণ করে, এটা মূলত দুষ্ট দানবদের এক ধরনের ভেল্কিবাজি। আরবদের বিশ্বাস মতে, এরা হঠাৎ মানুষজনের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর تَغَوَّلَ تَغَوُّلًا (অর্থাৎ ওরা বহুরূপ ধারণ করে) এবং বিপথে নিয়ে মেরে ফেলে। নবী করীম ﷺ এসব ধারণা সম্পূর্ণভাবে নাকচ করেছেন।[৩]

اَلنَّوْءُ

জামিউল উসূলের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, اَلنَّوْءُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে اَلْأَنْوَاءُ। এটি ২৮টি তারকার সমষ্টি। এসবকে চন্দ্রের মনযিল বলা হয়। তারকাগুলোর মধ্যে ১৩ তারিখ রাতে ঊষালগ্নে পশ্চিমদিকে একটি মনযিল অস্ত যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তারকা পূর্বদিকে উদিত হয়। অতএব এই ২৮টি তারকার আবর্তনে এক বছর পূর্ণ হয়।

আরবরা ধারণা করতো যে, তারকারাজির একটি মনযিল অস্ত গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মনযিল উদিত হওয়ার সময় বৃষ্টিপাত হয়। তাই তারা বৃষ্টির কারণ হিসেবে তারকাসমূহের আবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে জ্ঞান করতো আর সেজন্য তারা বলতো, مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا (অস্তগামী তারকার প্রভাবে আমাদের এলাকায়

---

[১] আন-নাসায়ী, আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৮, পৃ. ২৮২, হাদীস: ৫৫৩০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৩, পৃ. ৪০৩

[৩] কাযী আয়ায, *মাশারিকুল আনওয়ার*, খ. ২, পৃ. ১৪০

বৃষ্টিপাত হয়েছে)। نَوْءٌ নামকরণের কারণ হচ্ছে, এসব তারকার মধ্যে যখন একটি পশ্চিমদিকে অস্তমিত হয়, نَاءَ الطَّالِعُ بِالْمَشْرِقِ (সে-সময় অপরপক্ষে পূর্বদিগন্তে অপরটি উদিত হয়)। يَنُوْءُ نَوْءً অর্থ: نَهَضَ وَطَلَعَ (অপরপক্ষে দাঁড়ালো এবং উদিত হলো।)

কারো মতে, اَلنَّوْءُ অর্থ অস্তমিত হওয়া, তবে শব্দটি এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আবু ওবায়দ তিনি বলেন, এই একটি জায়গা ছাড়া কোথাও اَلنَّوْءُ-এর অর্থ 'পশ্চিমদিকে অস্তমিত হওয়া' শোনা যায়নি।

নবী করীম ﷺ জাহেলি সমাজের এই অলীক বিশ্বাসকে কঠোরভাবে বাতিল ঘোষণা করেছেন। কেননা আরবরা বৃষ্টিপাতকে তারকার আবর্তনের প্রভাব বলে বিশ্বাস করতো। অবশ্য কেউ যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, বৃষ্টি আল্লাহর হুকুমেই হয়। مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا বক্তব্য দ্বারা শুধু সময় উদ্দেশ্য করে থাকে; فِيْ وَقْتِ كَذَا (অর্থাৎ অমুক সময় বৃষ্টি হয়েছে) বলে থাকে তাহলে অনুমতি আছে।

বলা হয়েছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ؓ একবার বৃষ্টিকামনার নামায আদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আর হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ؓ-কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

كَمْ بَقِيَ مِنْ نَوْءِ الثُّرَيَّا؟ فَقَالَ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ بِهَا يَزْعُمُوْنَ أَنَّهَا تَعْتَرِضُ فِي الْأَرْضِ سَبْعًا بَعْدَ وُقُوْعِهَا، فَمَا مَضَتْ تِلْكَ السَّنَةُ حَتَّىٰ غِيْثَ لِلنَّاسِ.

'সুরাইয়া-তারকা তার আবর্তন পথে কোন জায়গায় অবস্থান করছে? তিনি জবাব দিলেন, বিশেষজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণের মতে সুরাইয়া এখন তার কক্ষপথে সপ্তম মনযিলে রয়েছে। এরপর সে-বছরটি পার না হতেই বৃষ্টিপাত হয়েছিলো।'[১]

এখানে স্পষ্টত كَمْ بَقِيَ দ্বারা হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) ؓ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি নিয়মমাফিক সে বছরের বৃষ্টিপাতের মওসুম আর কতো দিন বাকি সে-কথা অবগত হতে চেয়েছেন—যেহেতু আল্লাহ সাধারণ নিয়মে বৃষ্টি দিয়ে থাকেন।[২]

---

[১] (ক) আল-হুমায়দী, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ২০১, হাদীস: ১০০৯; (খ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৫০১, হাদীস: ৬৪৫৫, হযরত আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত

[২] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৮—৬৩৯

আন-নিহায়া গ্রন্থে «أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ: ... الْأَنْوَاءُ» (জাহিলি যুগের অপসংস্কৃতির অন্যতম হচ্ছে, নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি কামনা)[১] হাদীস প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি আটাশটি মনযিলসমষ্টির নাম। এর মধ্য থেকে চন্দ্র প্রতি রাতে একটি মনযিল অতিক্রম করে। এদিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনের ইরশাদ:

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ ۝

'আমি চাঁদের জন্য নির্ধারণ করেছি তার পরিভ্রমণ পথ।'[২]

আন-নিহায়া গ্রন্থের এর পরের আলোচনা *জামিউল উসূলের* অনুরূপ, তবে সেখানে আবু ওবায়দের বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়নি।

সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম আল-কিরমানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, اَلنَّوْءُ শব্দটি ن বর্ণে আ-কার, و বর্ণে হসন্ত এবং এরপর ء-সহকারে; জাহেলি সমাজে লোকেরা মনে করতো, বৃষ্টিপাতের কারণ হচ্ছে, أَنَّ الْكَوَاكِبَ نَاءَ অর্থাৎ غَرَبَ أَوْ طَلَعَ (গ্রহ-নক্ষত্র অস্তমিত হয়েছে বা উদয় হয়েছে, আর এর প্রভাবেই বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে)। অবশ্য যদি এর দ্বারা কেউ 'সময়' বোঝাতে চায় সে-ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এমন কোনো সময় নেই যাকে আল্লাহর বান্দারা তার কোনো না কোনো উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে নামকরণ করেনি।[৩] এ-প্রসঙ্গে ইমাম আল-কিরমানী রাহিমাহুল্লাহ হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়কার বৃষ্টিকামনায় নামাযের ঘটনাটি *জামিউল উসূলের* অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

কাযী ইবনুল আরাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যেসব লোক গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনে বৃষ্টিপাতের প্রত্যাশী অথবা এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করলো সে কাফির বলে গণ্য হবে। কেননা জগতের প্রত্যেকটি কাজের স্রষ্টা তো একমাত্র আল্লাহ। অবশ্য যদি কেউ সরাচর প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনে বৃষ্টিপাতের প্রত্যাশী হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করাও মাকরুহ। কারণ এটাও কুফরের আলামত এবং এতে ক্রমশঃ কুফর সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ আছে।

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৩৮৫০
[২] (ক) আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসিন*, ৩৬:৩৯; (খ) ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৫, পৃ. ১২২
[৩] আল-কিরমানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৫, পৃ. ৭৬

ইমাম আত-তীবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করা মাকরুহে তানযীহী পর্যায়ের।[১]

কাজী আয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের তত্ত্ব একটা জাহেলি ভ্রান্ত ধারণা। যেমন কেউ বলল, مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا (নক্ষত্রবিশেষের আবর্তনের ফলে আমাদের এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে)। এখানে আরবদের কাছে اَلنَّوْءُ বলতে গ্রহ-নক্ষত্রের ২৮টি আবর্তন স্তরের যেকোনো একটিতে তারকাসমূহের অস্তমিত যাওয়া। যে-সময় পশ্চিমাকাশের তারকা অস্ত যায় ঠিক সে-সময় উষা হয় এবং অস্তমিত তারকার পরিবর্তে পূর্বাকাশে অন্য তারকা উদিত হয়। তাদের ধারণা মতে, সে-সময় প্রচ- বৃষ্টি নামে এবং দমকা বাতাস বয়ে যায়। আর বৃষ্টি-বাতাসকে কেউ অস্তমিত তারকার কেউ উদিত তারকার প্রভাব বলে দাবি করে। কারণ তারকা এখানে نَاءَ অর্থ نَهَضَ (স্বপ্রভাবে জেগে ওঠেছে।) আরবরা বৃষ্টিপাতকে এই গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়-অস্তের প্রভাব বলে ধারণা করে। নবী করীম ﷺ এ-ধরনের বিশ্বাস গ্রহণে কঠোর নিষেধ করেছেন।

«وَكَفَرَ قَائِلُهُ» (গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতে বিশ্বাসী কাফির) বলা হয়েছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য আছে। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম একমত এ-ব্যাপারে একমত হয়েছেনে যে, গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনকে মূলচালিকা বলে বিশ্বাস নিঃসন্দেহে কুফরি এবং তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য এ-আবর্তনকে নিচক মৌসুম বোঝাতে বলে হলে সেক্ষেত্রে কুফরি প্রযোজ্য নয়। কারো কারো মতে, নিষেধাজ্ঞার নূন্যতম বিধান হিসেবে এটা সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণভাবে মাকরুহ হবে। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে, কুফর অর্থ এখানে আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা। এ-বিষয়ে আমরা অন্য একটি গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।[২]

সংক্রমণ ও অশুভ ধারণা সমাজে বহুলপ্রচলিত এবং এতে সাধারণ লোকজন কর্মে ও বিশ্বাসে চরমভাবে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আছে। যেহেতু এসব অমূলক ধারণা খ-নে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আমি সেসব দুটো পৃথক অধ্যায়ে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তাবোধ করছি।

---

[১] আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ২৯৯১
[২] কাযী আয়ায, *মাশারিকুল আনওয়ার*, খ. ৩, পৃ. ৩১

প্রথম অধ্যায়: اَلطِّيَرَةُ

ইমাম আত-তীবী রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা মতে, اَلطِّيَرَةُ শব্দটি ط বর্ণ ই-কার ও ي বর্ণে আ-কার-সহকারে, ي বর্ণ কখনো হসন্তপূর্ণও হয়ে থাকে—এর অর্থ হচ্ছে, কোনো বস্তুকে অলক্ষুণে মনে করা। تَطَيَّرَ طِيَرَةً-এর মতো تَخَيَّرَ خِيَرَةً হচ্ছে ক্রিয়ামূল। এ-দুটো ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ এ-ধরনের ক্রিয়ামূল হিসেবে আরবিতে ব্যবহৃত হয় না।

বস্তুত اَلطِّيَرَةُ হচ্ছে শিকারে গমনের পূর্বে পাখি বা হরিণ ইত্যাদি দিয়ে শুভ কিংবা অশুভ যাচাই করে নেওয়া। সে-অনুযায়ী লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে যেত। শরীয়ত এই ধরনের লক্ষণ বিচারকে নাকচ করে দিয়েছে। এ-ধরনের প্রচলন বাতিল এবং তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে লাভ-লোকসানের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ও কার্যকরিতা নেই।[১]

اَلْفَأْلُ শব্দটি مَهْمُوْزٌ (শব্দের মূল ধাতুর দ্বিতীয় পদ হামযা বিশিষ্ট) শুভ-অশুভ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু اَلطِّيَرَةُ কেবল অশুভ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কদাচিৎ শুভ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[২]

আমার বক্তব্য হচ্ছে, উপর্যুক্ত অর্থসমূহ আভিধানিক। পক্ষান্তরে শরীয়তে اَلْفَأْلُ-এর ব্যবহার সাধারণভাবে কেবল শুভ নির্ধারিত এবং اَلطِّيَرَةُ ব্যবহৃত নেতিবাচক অর্থে। অবশ্য কোনো বিশেষণবন্দী হয়ে অশুভ অর্থেও ব্যবহৃত হয। যেমন– বলা হয়: اَلْفَأْلُ السَّيِّءُ وَالْفَأْلُ الْمَكْرُوْهُ (মন্দ ফাল বা মাকরূহ ফাল)।

এদিকে ইমাম আত-তীবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হযরত আনাস (ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নিম্ন হাদীস থেকে اَلطِّيَرَةُ ও اَلْفَأْلُ-এর মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়:

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ»، قَالُوْا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ».

---

[১] (ক) ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৩, পৃ. ১৫২; (খ) আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ২৯৭৮

[২] (ক) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪০৫; (খ) আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইরশাদ করেন, 'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। তবে الفَأْل আমাকে মুগ্ধ করে।' সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, الفَأْل কী? তিনি উত্তর দিলেন, 'الفَأْل হচ্ছে ইতিবাচক ধারণা।''[১]

ইমাম আল-কিরমানী رحمه الله-এর *শরহুল বুখারী* গ্রন্থে এসেছে, বস্তুত জাহেলি যুগে লোকেরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে কোনো হরিণ- পাখিকে উন্মুক্তভাবে ছেড়ে দিতো। প্রাণীটা ডান দিকে চলে গেলে শুভলক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হতো। বামদিকে গেলে মনে করা হতো অশুভ লক্ষণ।[২]

(*সহীহ*) *মুসলিমের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম আন-নাওয়াওয়ী رحمه الله বলেন, এ-ধরনের বিশ্বাস স্পষ্টত শিরক। এর নিয়ম হচ্ছে, যে-নীতি-বিশ্বাসে কোনো ক্ষতি নেই এবং কোনো কিছু সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে এর বিশেষ বা সাধারণ কোনো বিশেষত্বও নেই, তাহলে সে-নীতি-বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়। আর الطِّيَرَة এমনই একট ভ্রান্ত বিশ্বাসের নাম। আর যেখানে সাধারণভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, অবশ্য তা স্থায়ী নয়, এমনটা কখনো-সখনো ঘটতে পারে, বারবার নয়; যেমন– মহামারী। এ-ধরনের এলাকায় বাইরে থেকে কারো প্রবেশও করা যাবে না আবার সে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়াও না। যা নির্দিষ্ট বা ব্যাপাকভাবে মানুষের জন্য ক্ষতিক্ষর নয়, যেমন– বাড়ি, ঘোড়া ও নারী। এসব এড়িয়ে চলা মুবাহ।[৩]

আন-নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, الفَأْل শব্দটি ء-বিশিষ্ট। এটি শুভ-অশুভ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু الطِّيَرَة শব্দটি সাধারণত শুভ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে মাঝে-মধ্যে শুভ অর্থেও ব্যবহার হয় বটে। অবশ্য লোকজন সহজের জন্যে শব্দটির ء বর্জন করে মিলিয়েও উচ্চারণ করে থাকে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ الفَأْل পছন্দ করতেন। কেননা মানুষ যখন আল্লাহর কাছে কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করেন, তখন তারা তাদের প্রত্যেকটি ছোট-বড় সব প্রত্যাশার ক্ষেত্রে শুভপরিণতিই কামনা করে। যদিও তাদের প্রত্যাশাপদ্ধতি সঠিক নাও হয়। যাবতীয় প্রত্যাশা আল্লাহর কাছে কামনাই মানুষের জন্য

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ৫৭৭৬; (খ) আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ২৯৭৮

[২] আল-কিরমানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২১, পৃ. ৩১

[৩] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ*, খ. ১৪, পৃ. ২১৯ ও ২২২

একমাত্র সঠিক। মানুষের আশা-প্রত্যাশা যখন আল্লাহমুখী না হয় তখন সেটা অবশ্যই কু-চিন্তাপ্রসূত হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে اَلطِّيَرَةُ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি একটা মন্দধারণা, এতে মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ-ধরনের বিশ্বাস বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় এবং শরীয়তের তরফেও তা নিষিদ্ধ। আর اَلتَّفَاؤُلُ (সুলক্ষণ গ্রহণ) হচ্ছে, যেমন– কোনো অসুস্থ বা কিছু হারিয়ে তার খোঁজকারী ব্যক্তি কারো মুখে শুনতে পেল (তাকে উদ্দেশ্য করে কেউ বলছে), !يَا سَالِمُ (হে সুস্থ ব্যক্তি) বা يَا وَاجِدُ (তোমার জিনিস তো পেয়েই গেছো)—এতে রুগ্ণ ব্যক্তি সুস্থতার ক্ষেত্রে আর কিছু হারিয়ে তার খোঁজকারী ব্যক্তি হৃত বস্তুটি পাওয়ার বেলায় আশান্বিত হলো।[১]

আমার মতে, এটিই হাদীসের ভাষায়: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ»-এর তাৎপর্য।

আন-নিহায়া গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, اَلطِّيَرَةُ শব্দটি ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক আর اَلْفَأْلُ বিশেষ অর্থবাচক। যেমনটি বলা হয়ে থাকে, أَصْدَقُ الطِّيَرَةِ الْفَأْلُ (اَلطِّيَرَةُ-এর মধ্যে اَلْفَأْلُ-ই হচ্ছে সঠিক)।[২]

আমার অভিমত হচ্ছে, উভয় শব্দ প্রায় সমার্থক। অবশ্য অভিধানে اَلطِّيَرَةُ শব্দটি সন্দেহাতীতভাবে মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং সেই সাথে اَلْفَأْلُ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আল-কামূস গ্রন্থে বলা হয়েছে, اَلطِّيَرَةُ হলো যা সাধারণভাবে অলক্ষুণে ভাবা হয়।[৩]

اَلتَّطَيُّرُ (শুভ-অশুভ ধারণা) ও اَلتَّفَاؤُلُ (শুভ লক্ষণ গ্রহণ)-এর অর্থ বোঝার পর এ-অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা পেশ করছি।

উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে বেশ কিছু হাদীসে اَلْعَدْوَى (রোগ-বালাইয়ে সংক্রমণের ধারণা) ও اَلْفَأْلُ (শুভ লক্ষণ গ্রহণ) উভয়ের আলোচনা এসেছে। অতএব এর মধ্যে যেকোনোটি ব্যাপারে সেসব হাদীস আমরা একবার আলোচনা করেছি তা দ্বিতীয়বার আবারো আলোচনায় আনাবো না। সফর মাসের অশুভ ধারণার খণ্ডনে আলোচিত হাদীসসমূহের ক্ষেত্রেও একই কথা

---

[১] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৩, পৃ. ৪০৫–৪০৬
[২] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪০৬
[৩] আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, খ. ১, পৃ. ৪৩২

প্রযোজ্য। অবশ্য বিষয়ের প্রয়োজনে ও প্রেক্ষাপটে কিছু হাদীসের পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হতেও পারে।

জামিউল উসূলের হাদীসসমূহ

عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا يَسْأَلُ عَنِ اسْمِهِ، فَإِذَا أَعْجَبَهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِيْ وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رَأَيْتُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِيْ وَجْهِهِ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا، فَإِذَا أَعْجَبَهُ فَرِحَ بِهَا وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِيْ وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رَأَيْتُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِيْ وَجْهِهِ».

'হযরত বুরায়দা থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ কোনো বস্তুকে অলক্ষুণে মনে করতেন না। তিনি যখন কোনো এলাকায় কাউকে গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠাতেন তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। নাম সুন্দর হলে তাঁর চেহারায় প্রসন্নভাবে পরিদৃষ্ট হতো আর নামের শব্দগুলো ভালো না হলে তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ লক্ষ করা যেতো। আর যখন তিনি এলাকায় প্রবেশ করতেন তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। নাম সুন্দর হলে তাঁর চেহারায় প্রসন্নভাবে পরিদৃষ্ট হতো আর নামের শব্দগুলো ভালো না হলে তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ লক্ষ করা যেতো।'

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ! يَا نَجِيْحُ!.

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ যখন কোনো কাজে বেরুতেন, কারো মুখ থেকে হে সৎকর্মপরায়ণ! হে সফল ব্যক্তি!—এরূপ সম্বোধন শুনলে তাঁকে খুশি মনে হতো।'

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।[১]

[১] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৯, হাদীস: ৩৯২০; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬২৮, হাদীস: ৫৭৯৮

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلِ: «اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

'হযরত ওরওয়া ইবনে আমির আল-কুরাশী ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে اَلطِّيَرَةُ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তার চেয়ে اَلْفَأْلُ উত্তম। এটি মুসলমানকে দ্বিধা-দ্বন্ধে ফেলে না। তোমরা কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেলে তাহলে বলবে:

«اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

'হে আল্লাহ! সৌন্দর্য ও কল্যাণ তোমার নির্দেশেই আসে এবং আমাদের যাবতীয় মন্দ ব্যাপার তুমিই দূরীভূত করে থাকো। সর্বপ্রকার শক্তি-সামর্থ্য তোমার হাতে সংরক্ষিত।"

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ﵀ বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، لَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ».

'কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক, কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক'—একথা তিনি তিন বার বলেছেন। 'যদি (পরোক্ষভাবে হলেও) সাধারণত অধিকাংশ লোক কুলক্ষণ ধারণায় বিশ্বাস করে, কিন্তু আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের বরকতে এর কাল্পনিক প্রভাব থেকে আল্লাহ মানুষকে হিফাযত করেন।"

---

[১] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ১৬১, হাদীস: ১৬১৬; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬২৯, হাদীস: ৫৮০০

[২] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৮—১৯, হাদীস: ৩৯১৯; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬২৯, হাদীস: ৫৮০১

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[১]

ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.)-এর বর্ণনায় এসেছে,

قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلٰكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ».

'তিনি (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক। যদি (পরোক্ষভাবে হলেও) সাধারণত অধিকাংশ লোক কুলক্ষণ ধারণায় বিশ্বাসী। কিন্তু আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের বরকতে এর কাল্পনিক প্রভাব থেকে আল্লাহ মানুষকে হিফাযত করেন।'

ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) বলেন, আমি হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (রহ.)-কে বলতে শুনেছি যে, হযরত সুলাইমান ইবনে হারব (রহ.) এ-হাদীস: «وَمَا مِنَّا وَلٰكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»-এর ব্যাপারে বলেছেন, আমার মতে এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বক্তব্য।[২]

وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ»، قَالُوْا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ».

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক (রা.)) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। তবে اَلْفَأْلُ আমাকে মুগ্ধ করে।' সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, اَلْفَأْلُ কী? তিনি উত্তর দিলেন, 'اَلْفَأْلُ হচ্ছে ইতিবাচক ধারণা।''

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[৩]

ইমাম আল-বুখারী (রহ.)-এর অনুরূপ অন্য একটি বর্ণনা আছে, এতে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

---

[১] আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৭, হাদীস: ৩৯১০

[২] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ১৬১, হাদীস: ১৬১৪; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬৩০, হাদীস: ৫৮০২

[৩] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ৫৭৭৬; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৬, হাদীস: ১১২ (২২২৪)

«يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ».

'ভালো الْفَأْلُ আমাকে মুগ্ধ করে; তা একটি কল্যাণধর্মী ধারণা।'[১]

অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহও বর্ণনা করেছেন, আর এতে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

«الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

'একটি ইতিবাচক ধারণা।'[২]

ইমাম আল-বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর অনুরূপ ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩] আর প্রথম হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহও বর্ণনা করেছেন।[৪]

[١] [وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ،] قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ».

'(১) [হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে,] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। অবশ্য অলক্ষুণে হলে এ-তিনটাই হতে পারে, ঘোড়া, নারী এবং বাড়ি।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

[٢] ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِيْ شَيْءٍ؛ فَفِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ».

'(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অলক্ষণ প্রসঙ্গে উত্থাপন করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, 'অলক্ষণ বলে কিছু থাকলে তা ঘোড়া, নারী ও বসতবাড়িতে থাকতো।''

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।[১]

---

[১] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ১৩৫, হাদীস: ৫৭৫৬
[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৬, হাদীস: ১১১ (২২২৪)
[৩] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৮, হাদীস: ৩৯১৬
[৪] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ১৬১, হাদীস: ১৬১৫; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬৩১, হাদীস: ৫৮০৩

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে,

[٣] «فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ».

'(৩) (অলক্ষণ বলে কিছু থাকলে তা) নারী, ঘোড়া এবং বাসগৃহেই থাকতে পারে।'[২]

হাদীসটি *আল-মুওয়াত্তার* গ্রন্থকার[৩], ইমাম আবু দাউদ (রহ.)[৪], ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.)[৫] এবং ইমাম আন-নাসায়ী (রহ.)[৬] প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি রোগের সংক্রমণ ও কুলক্ষণ বিশ্বাসের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেননি।[৭]

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ» يَعْنِي الشُّؤْمَ.

'হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'যদি কোনো বস্তুতে কুলক্ষণ থাকা সম্ভব হতো তবে তা ঘোড়া, নারী এবং বসতবাড়িতে থাকতো।''

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী (রহ.)[৮], ইমাম মুসলিম (রহ.)[৯] বর্ণনা করেছেন এবং *আল-মুওয়াত্তায়*[১০]ও বর্ণিত হয়েছে।[১১]

[হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে,] তিনি তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন,

«فَفِي الرَّبْعِ، وَالْخَادِمِ، وَالْفَرَسِ».

'যদি কুলক্ষণ থেকে থাকে তবে তা চারটা জিনিসে: এর মধ্যে সেবক ও ঘোড়া অন্যতম।'

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* খ. ৭, পৃ. ১৩৮–১৩৯, হাদীস: ৫৭৭২ ও পৃ. ৮, হাদীস: ৫০৯৪; (খ) মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ১৭৪৭, হাদীস: ১১৬ ও ১১৭ (২২২৫)

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ,* খ. ৪, পৃ. ১৭৪৭, হাদীস: ১১৮ (২২২৫)

[৩] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা,* খ. ৫, পৃ. ১৪১৬, হাদীস: ৭৯২

[৪] আবু দাউদ, *আস-সুনান,* খ. ৪, পৃ. ১৯, হাদীস: ৩৯২২

[৫] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর,* খ. ৫, পৃ. ১২৭, হাদীস: ২৮২৪

[৬] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান,* খ. ৬, পৃ. ২২০, হাদীস: ৩৫৬৯

[৭] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল,* খ. ৭, পৃ. ৬৩১–৬৩২, হাদীস: ৫৮০৪

[৮] আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* খ. ৭, পৃ. ৮, হাদীস: ৫০৯৫

[৯] মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ১৭৪৮, হাদীস: ১১৯ (২২২৬)

[১০] মালিক ইবনে আনাস, *প্রাগুক্ত,* খ. ৫, পৃ. ১৪১৬, হাদীস: ৭৯১

[১১] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত,* খ. ৭, পৃ. ৬৩২, হাদীস: ৫৮০৫

হাদীসটি ইমাম মুসলিম [1] ও ইমাম আন-নাসায়ী [2] বর্ণনা করেছেন।[3]

وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُوْنُ الْيُمْنُ فِي الدَّارِ وَالْـمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ».

'হযরত হাকিম ইবনে মুআবিয়া থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'অলক্ষণ বলতে কিছু নেই। বরং ঘরবাড়ি, নারী ও ঘোড়ার বেলায় সুখ-সৌভাগ্য হয়।"

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।[4]

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ»، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «اَلْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ».

'হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'অলক্ষণের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই তবে, শুভলক্ষণ গ্রহণ ভালো।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! শুভলক্ষণ গ্রহণ কী? তিনি জবাবে ইরশাদ করেন, 'এটা হলো তোমরা যেসব ভালো কথা শোন তা-ই।"

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী [5] ও ইমাম মুসলিম [6] বর্ণনা করেছেন।[7]

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَلْعِيَافَةُ، وَالطِّيَرَةُ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْـجِبْتِ».

---

[1] মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৮, হাদীস: ১২০ (২২২৭)

[2] আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ২২০, হাদীস: ৩৫৭০

[3] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৩, হাদীস: ৫৮০৬

[4] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ১২৭, হাদীস: ২৮২৫; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৩, হাদীস: ৫৮০৭

[5] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৩৫, হাদীস: ৫৭৫৪ ও ৫৭৫৫

[6] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৫, হাদীস: ১১০ (২২২৩)

[7] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৫–৬৩৬, হাদীস: ৫৮০৯

'হযরত সা'দ ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'রেখা টেনে, পাখি উড়িয়ে এবং পাথর নিক্ষেপ করে শুভাশুভ নির্ধারণ মূর্তিপূজার শামিল।''

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, اَلطَّرْقُ অর্থ: اَلزَّجْرُ (পাখি উড়িয়ে ডানদিকে গেলে সুলক্ষণ এবং বামদিকে গেলে কুলক্ষণ গ্রহণ করা) এবং اَلْعِيَافَةُ অর্থ: اَلْخَطُّ (রেখা টানা)।[১]

ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে اَلْعِيَافَةُ অর্থ পাখি উড়িয়ে ডানদিকে গেলে সুলক্ষণ গ্রহণ করা। আরবের লোকেরা এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা করতো। عَافَ الطَّيْرَ يَعِيفُهُ বলা হয় যখন পাখি উড়িনো হয়।

اَلطَّرْقُ অর্থ পাথর নিক্ষেপ। কারো কারো মতে, বালুময় জমিতে রেখা টানা। ভাগ্য গণনার জন্য জ্যোতিষীগণ তা এঁকে থাকে।

اَلْجِبْتُ অর্থ আল্লাহ ব্যতীত যেসবের ইবাদত করা হয়। কারো মতে, এর অর্থ জ্যোতিষী ও শয়তান।[২]

ইমাম আত-তীবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, اَلْعِيَافَةُ অর্থ পাখি উড়িয়ে তাদের নাম, বুলি ও যাতায়াতের ওপর ভিত্তি করে শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা। আরবের লোকেরা সফরের প্রাক্কালে এসব প্রথা খুব বেশি প্রতিপালন করতো। عَافَ، يَعِيفُ عَيْفًا বলা হয় যখন পাখি উড়ায়ে আন্দাজে শুভাশুভ পূর্বাভাস ধারণা পোষণ করা হয়।

اَلطَّرْقُ অর্থ পাথর ছোঁড়া। মেয়েরা ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে এরকম পাথর ছুঁড়ে মারতো। কারো মতে, বালুময় জায়গাতে রেখা অঙ্কণ।

اَلْجِبْتُ অর্থ জাদু ও জ্যোতিষ। কারো মতে, এর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেসবের ইবাদত করা হয়। কারো মতে, এর অর্থ জাদুকর। হাদীসের বক্তব্য: «مِنَ الْجِبْتِ»। এর অর্থ হচ্ছে, পৌত্তলিক কর্মকাণ্ড। তাঁদের মতে, শব্দটি আরবি নয়।

---

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৬, হাদীস: ৩৯০৭
[২] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬৩৯–৬৪০, হাদীস: ৫৮১০

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত, এটি ইথিওপিয় শব্দ। কুতরুব বলেন, ٱلْجِبْتُ হচ্ছে যেখানে কোনোই কল্যাণ নেই।[১]

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! إِنَّا كُنَّا فِيْ دَارٍ كَثِيْرٌ فِيْهَا عَـدَدُنَا، وَكَثِيْرٌ فِيْهَا أَمْوَالُنَـا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَىٰ دَارٍ أُخْرَىٰ، فَقَلَّ فِيْهَا عَدَدُنَا، وَقَلَّتْ فِيْهَا أَمْوَالُنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً».

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক বলল, হে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা প্রথমে পরিবারের সবাই একটি ঘরেই বসবাস করতাম। জনসংখ্যা ও ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলাম। পরবর্তীতে বসবাসের জন্য আরেকটি ঘরে যখন স্থানান্তরিত হই তখন আমাদের মানুষজন ও ধন-সম্পত্তিতে অবনতি দেখা দিলো। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'এটি ছেড়ে দাও, এটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়।''

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ﷺ বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: دَارٌ سَكَنَّاهَا، وَالْعَدَدُ كَثِيْرٌ، وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَتَحَوَّلْنَا إِلَىٰ دَارٍ أُخْرَىٰ، فَقَلَّ الْعَدَدُ، وَذَهَبَ الْمَالُ، فَقَالَ: «دَعُوْهَا ذَمِيْمَةً».

'হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক মহিলা এসে আরয করল, আমরা প্রথমে পরিবারের সবাই একটি ঘরেই বসবাস করতাম, জনসংখ্যা বেশি ছিল ও ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলাম। পরবর্তীতে বসবাসের জন্য আরেকটি ঘরে যখন স্থানান্তরিত হই তখন আমাদের মানুষজন কমে গেল ও ধন-সম্পত্তিতে অবনতি দেখা দিলো। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'সেটা ছেড়ে দাও, তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়।''

হাদীসটি *আল-মুওয়াত্তায়* বর্ণিত হয়েছে।[২]

---

[১] (ক) আত-তূরবুশতী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১০১২–১০১৩; (খ) আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ২৯৮২–২৯৮৩

[২] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২০, হাদীস: ৩৯২৪; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৭, পৃ. ৬৪০, হাদীস: ৫৮১২

«اَلطِّيَرَةُ تَجْرِيْ بِقَدَرٍ».

'শুভাশুভের ধারণা তাকদীরের সাথে সংশ্লিষ্ট।'

হাদীসটি ইমাম আল-হাকিম তাঁর *আল-মুসতাদরাকে* হযরত আয়িশা থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩]

«اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ».

'শুভাশুভের বিশ্বাস শিরক।'

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী[৪], ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল)[৫], ইমাম আল-বুখারী *আল-আদাবুল মুফরাদে*[৬], ইমাম ইবনে মাজাহ[৭] ও ইমাম আল-হাকিম *আল-মুসতাদরাকে*[৮] হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

«وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ».

'জাহেলি যুগে লোকেরা বলতো, নারী, ঘোড়া ও ঘরে অলক্ষণ থাকা সম্ভব।'

ইমাম আল-হাকিম তাঁর *আল-মুসতাদরাকে*[৯] ও ইমাম আল-বায়হাকী তাঁর *শুআবুল ঈমানে*[১০] হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

«اَلشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالدَّابَّةِ».

'অলক্ষণ তিন জিনিসে : নারী, বসতঘর ও বাহনের পশুতে।'

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী[১] ও ইমাম আন-নাসায়ী[২] হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

[১] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ৫, পৃ. ১৪১৭, হাদীস: ৭৯৩

[২] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৬৪১, হাদীস: ৫৮১৩

[৩] আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮৬, হাদীস: ৮৯

[৪] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ১৬০–১৬১, হাদীস: ১৬১৪

[৫] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৬, পৃ. ২১৩, হাদীস: ৩৬৮৭ ও খ. ৭, পৃ. ২৫০, হাদীস: ৪১৯৪

[৬] আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, পৃ. ৩১৩, হাদীস: ৯০৯

[৭] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১১৭০, হাদীস: ৩৫৩৮

[৮] আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬৪, হাদীস: ৪৩

[৯] আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫২১, হাদীস: ৩৭৮৮

[১০] আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৮, পৃ. ২৪১, হাদীস: ১৬৫২৫

«إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ؛ فَفِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ».

'অলক্ষুণে বলে কিছু থাকলে তা বসতবাড়ি, নারী ও ঘোড়াতেই থাকতো।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল)[৩] ও ইমাম আল-বুখারী[৪] হযরত সাহল ইবনে সা'দ থেকে, ইমাম আল-বায়হাকী[৫] হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর থেকে এবং ইমাম আন-নাসায়ী[৬] হযরত জাবির (ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

«فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثَةٌ: اَلطِّيَرَةُ، وَالظَّنُّ، وَالْحَسَدُ، فَمَخْرَجُهُ مِنَ الطِّيَرَةِ أَنْ لَا يَرْجِعَ، وَمَخْرَجُهُ مِنَ الظَّنِّ أَنْ لَا يُحَقِّقَ، وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَسَدِ أَنْ لَا يَبْغِيَ».

'মানুষের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ কুলক্ষণে বিশ্বাস, সন্দেহপ্রবণতা ও হিংসা। কুলক্ষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তার কল্পনাও মনে প্রশ্রয় দেবে না, সন্দেহপ্রবণতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে (সন্দেহের বশীভূত হয়ে) নিরীক্ষণ ও অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা এড়িয়ে চলবে আর হিংসা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে প্রতিহিংসা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করবে।'

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী তাঁর *শুআবুল ঈমানে*[৭] হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইবনে সাসাসারা তাঁর *আমালী*তে ও ইমাম আদ-দায়লমী *মুসনদুল ফিরদাউসে* হাদীসটি এভাবেও বর্ণনা করেছেন,

«فِي الْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ خِصَالٍ ...».

'মুমিনের তিনটা বৈশিষ্ট্য...।' আল-হাদীস।[৮]

---

[১] আত-তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ১২৬, হাদীস: ২৮২৪
[২] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৬, পৃ. ২২০, হাদীস: ৩৫৬৮
[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৭, পৃ. ৪৮৯, হাদীস: ২২৮৩৬
[৪] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ৮, হাদীস: ৫০৯৪
[৫] আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৮, পৃ. ২৪১, হাদীস: ১৬৫২৪
[৬] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৬, পৃ. ২২০, হাদীস: ৩৫৭০
[৭] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ২, পৃ. ৪০১, হাদীস: ১১৩০
[৮] আদ-দায়লামী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৩৬, হাদীস: ৪৩৬৭

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا مَنْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ تُسُحِّرَ لَهُ».

'যে-লোক অশুভে বিশ্বাস করে এবং যারা অশুভকে সত্যায়ন করে, ভবিষ্যদ্বাণী করে বা ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে কিংবা জাদু করে এবং জাদুতে বিশ্বাস করে সে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

হাদীসটি ইমাম আত-তাবরানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর *(আল-মু'জামুল) কবীরে* হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)[১] থেকে বর্ণনা করেছেন।

«مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَدْ أَشْرَكَ».

'যে-লোক কোনো প্রয়োজনে অলক্ষণে বিশ্বাস করে সে শিরক করে।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল)[২] ও ইমাম আত-তাবরানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর *আল-মু'জামুল কবীরে* হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)[৩] থেকে বর্ণনা করেছেন।

«اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ».

'কুলক্ষণে বিশ্বাস রাখা শিরক, কুলক্ষণে বিশ্বাস রাখা শিরক ও কুলক্ষণে বিশ্বাস রাখা শিরক।'[৪]

«مَنْ خَرَجَ يُرِيْدُ السَّفَرَ، فَرَجَعَ مِنْ طَيْرٍ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ».

'যে-লোক সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর অলক্ষণের ধারণায় ফেরত আসে সে যেন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর বিধি-বিধানকে অস্বীকার করলো।'[৫]

«لَا شُؤْمَ، فَإِنْ يَكُ شُؤْمٌ؛ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ».

'কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। যদি থাকতো তবে ঘোড়া, নারী ও বাড়িতেই থাকতো।'[১]

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১৮, পৃ. ১৬২, হাদীস: ৩৫৫
[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১১, পৃ. ৬২৩, হাদীস: ৭০৪৫
[৩] আত-তাবারানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৩, পৃ. ২২, হাদীস: ৩৮
[৪] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৮, হাদীস: ৩৯১০; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত
[৫] আদ-দায়লামী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৮১, হাদীস: ৫৪৯২; হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত

«مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ»، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

'যে-লোক কোনো প্রয়োজনে কুলক্ষণ বিশ্বাস করে তাহলে সে শিরক করলো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে এর কাফফারা কী? হযরত রাসূলুল্লাহ বললেন, 'তবে সে বলবে,

«اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

হে আল্লাহ! ভালো-মন্দ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সবই তোমার হাতে। তুমি ছাড়া কেউ ইবাদতদের যোগ্য নন।''[২]

«اَلْفَأْلُ مُرْسَلٌ، وَالْعُطَاسُ شَاهِدُ عَدْلٍ».

'শুভ ধারণা আল্লাহ-প্রেরিত এবং হাঁচি হচ্ছে ন্যায়ের প্রতীক।'[৩]

«لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُوْنُ الْيُمْنُ فِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ».

'অলক্ষণ বলতে কিছু নেই। বরং ঘরবাড়ি, নারী ও ঘোড়ার বেলায় সুখ-সৌভাগ্য হয়।'

হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত হাকিম ইবনে মুআবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪]

«يَا لَبَّيْكَ نَحْنُ أَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فِيْكَ».

'হ্যাঁ! লাব্বাইক হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে সৌভাগ্যের সম্ভাবনা প্রার্থনা করি।'[১]

---

[১] (ক) আত-তাবারানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ১২২, হাদীস: ৫৭০৭; হযরত সহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১১, পৃ. ৬২৩, হাদীস: ৭০৪৫; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১৩, পৃ. ২২, হাদীস: ৩৮; (গ) ইবনুস সুন্নী, *আমলুল য়াওমি ওয়াল লায়ল*, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ২৯২; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত

[৩] আল-হাকীমুত তিরমিযী, *নাওয়াদিরুল উসূল*, খ. ৩, পৃ. ৬; হযরত আর-রুওয়াইহিব আস-সুলায়মী থেকে বর্ণিত

[৪] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪; পৃ. ১২৭, হাদীস: ২৮২৫; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৬৪২, হাদীস: ১৯৯৩

«وَلَا شَيْءَ فِي الْهَامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأَصْدَقُ الطِّيَرَةِ الْفَأْلُ».

'পেঁচায় কোনো কুলক্ষণ নেই। দৃষ্টিপড়া সত্য, সৌভাগ্যের আগাম অনুমান একটি ইতিবাচক ধারণা।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম আত-তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জাবির (ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।[২]

«لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ؛ اَلْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ».

'অলক্ষণের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই তবে, এর তুলনায় সৌভাগ্যের আগাম অনুমান ভালো। আর তা হলো তোমরা যেসব ভালো কথা শোন তা-ই।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।[৩]

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ».

'হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, 'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। তবে শুভ লক্ষণ গ্রহণ আমার কাছে পছন্দনীয়।''

হাদীসটি ইমাম আদ-দারাকুতনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর *আল-মুত্তাফিক আলায়হি* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৪]

وَعَنْ ابْنَ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ تَرَىٰ فِيْ جَارِيَةٍ لِّيْ فِيْ نَفْسِيْ مِنْهَا شَيْءٌ؟ فَإِنِّيْ سَمِعْتُهُمْ يَقُوْلُوْنَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كَانَ شَيْءٌ، فَفِي الرَّبْعِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ»، قَالَ: فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُوْنَ سَمِعَ ذَٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ النَّكَرَةِ.

---

[১] (ক) আত-তাবারানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৭, পৃ. ২০, হাদীস: ২৩; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *আত-তিব্বুন্নবওয়ী*, খ. ১, পৃ. ৩১১, হাদীস: ২১৯; হযরত আমর ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৭, পৃ. ১৮১, হাদীস: ১৬৬২৭ ও খ. ৩৮, পৃ. ২৫৯, হাদীস: ২৩২১৬; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৭, হাদীস: ২০৬১; মূলত হযরত হাবিস আত-তামীমী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৩, পৃ. ৫৭, হাদীস: ৭৬১৮, খ. ১৫, পৃ. ১৪৯, হাদীস: ৯২৬২ ও খ. ১৬, পৃ. ৪৬০, হাদীস: ১০৭৯০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৫, হাদীস: ১১০ (২২২৩); হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[৪] আল-খতীবুল বগদাদী, *আল-মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক*, খ. ১, পৃ. ২৬২, হাদীস: ১১০

ইবনে আবু মুলায়কা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বললাম, আমার দাসী সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? তার ব্যাপারে আমার মনে একটু খটকা রয়েছে। কারণ আমি লোকমুখে বলতে শুনেছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যদি অশুভ বলতে কিছু থাকে তবে ঘরবাড়ি, ঘোড়া ও নারীতে থাকতে পারে।' ইবনে আবু মুলায়কা বলেন, একথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন বলে যে দাবি করা হয়েছে তা তিনি (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَهُ، وَأَنْ يَكُوْنَ الشُّؤْمُ فِيْ شَيْءٍ، وَقَالَ: إِذَا وَقَعَ فِيْ نَفْسِكَ مِنْهَا شَيْءٌ فَفَارِقْهَا: بِعْهَا أَوْ أَعْتِقْهَا.

'কোনো বস্তুবিশেষ অলক্ষুণে হওয়া এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর্যুক্ত কথা বলেছেন বলে যে দাবি রয়েছে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। বরং তিনি বলেন, যখন তোমার মনে তার সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তবে তাকে অব্যাহতি দিয়ে দাও; বিক্রি বা মুক্ত করে দাও।'

হাদীসটি ইমাম ইবনে জরীর (আত-তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ حَسَّانَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَحَدَّثَاهَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ»؛ فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيْدًا، وَقَالَتْ: مَا قَالَ؟ إِنَّمَا قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُوْنَ مِنْ ذَٰلِكَ».

'হযরত কাতাদা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবু হাসসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন, দুইজন লোক হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নারী, ঘোড়া ও ঘরবাড়িতে অলক্ষণ রয়েছে।' একথা শুনে হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ভীষণ রাগান্বিত

[১] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তাহযীবুল আসার*, খ. ৩, পৃ. ২৭, হাদীস: ৭০ ও ৭১

হয়ে বললেন, এসব কে বলেছেন? বরং তিনি বলেছেন, 'জাহিলি যুগের লোকেরা এসব অলক্ষুণে বলে বিশ্বাস করতো।''

হাদীসটি ইমাম ইবনে জরীর (আত-তাবারী রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! سَكَنَّا دَارًا وَّنَحْنُ ذُوْ مَالٍ وَافِرٍ، فَاحْتَجْنَا، وَسَاءَتْ ذَاتُ بَيْنِنَا، وَاخْتَلَفْنَا، فَقَالَ: «بِيْعُوْهَا، أَوْ ذَرُوْهَا، وَهِيَ ذَمِيمَةٌ».

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, একদিন জনৈক মহিলা নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা একটি বাড়িতে বসবাস করছি। (তার আগে) আমরা বেশ সম্পদশালী ও সুখী-সমৃদ্ধ ছিলাম। এখন অভাব-অনটন আমাদের কাবু করে ফেলেছে। পরিবারের সদস্যদের সদস্যদের মাঝে মনোমালিন্য তার কারণে সবাই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, 'বাড়িটি তোমাদের জন্য ভালো নয়, সেটি বিক্রি বা বদলে ফেল।''

হাদীসটি ইমাম ইবনে জরীর (আত-তাবারী রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন।[২]

উল্লেখ্য, এ-প্রসঙ্গে আরও অনেক হাদীস আছে। আমরা যা উল্লেখ করেছি বিষয়-প্রসঙ্গে তা যথেষ্ট বেশি হয়েছে। এসবের প্রায় হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে কুলক্ষণের প্রভাব সম্পূর্ণ অমূলক এবং সাধারণভাবে এই ধরনের বিশ্বাসও নিষিদ্ধ। অবশ্য কিছু কিছু হাদীসে নারী, যানবহন ও ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে এর সত্যতা পাওয়া যায়। তাও নিচক সম্ভাবনা মাত্র।

হ্যাঁ, এই সম্ভাবনা কি এখনো বিদ্যমান? নাকি তা জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কার মাত্র। উভয় অবস্থায় এ-জাতীয় ধারণাকে সম্পূর্ণ নাকচ এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথবা (কিছু কিছু হাদীসে নারী, যানবহন ও ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে কুলক্ষণের যে সত্যতা পাওয়া যায় তা অবশ্য) শর্তসাপেক্ষে। যেমন– 'যদি কোনো বস্তুতে কুলক্ষণ থেকে থাকে তবে এসব বস্তুতেই থাকতো।' এর মর্মার্থ এমনটাই। আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

বস্তুত কোনো জিনিসে কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। যদি মেনেই নেওয়া হয় যে, উপর্যুক্ত জিনিসে কুলক্ষণ রয়েছে তবে তা জিনিসসমূহের অবস্থান,

---

[১] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৭, হাদীস: ৩৭

[২] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তাহযীবুল আসার*, খ. ৩, পৃ. ২৬, হাদীস: ৬৯

পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের কারণে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্যেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

«لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».

'তাকদীরকে অতিক্রম করার মতো যদি কিছু থাকতো তবে তা হতো মানুষের দৃষ্টি।'[১]

এর ওপর কাযী আয়ায বিশদ আলোচনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য: «لَا طِيَرَةَ»-এর পর 'যদি' শর্তারোপ থেকে বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে উপর্যুক্ত হাদীস (নারী, ঘোড়া ও ঘরবাড়িতে কুলক্ষণ সম্পর্কিত হাদীস) থেকেও কুলক্ষণের ধারণারই নাকচ করা হয়েছে। অর্থাৎ অলক্ষণের যদি কোনো অস্তিত্ব থেকে থাকত তাহলে তা উল্লিখিত বস্তুসমূহের মধ্যেই থাকতো। কারণ এসব বস্তুই কুলক্ষণের উপযোগী। কিন্তু এসবের মধ্যেও তার কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কুলক্ষণেরই কোনো অস্তিত্ব নেই। এখানে কাযী আয়াযে বক্তব্য সমাপ্ত।[২]

বস্তুত হযরত আয়িশা ও হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস উল্লিখিত বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে কুলক্ষণের ব্যাপারটা বেশ জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে প্রমাণিত। পক্ষান্তরে যেসব হাদীস অলক্ষণের পক্ষে পাওয়া যায় সেসবের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো বস্তুর নিজস্ব কোনো প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নেই। প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত ক্রিয়াশীলতা আল্লাহর হাতেই। আর সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি ও অদৃষ্টের অন্তর্ভুক্ত। এখন এই যেসব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ রয়েছে তা আল্লাহ সুবহানাহুর প্রদত্ত স্বভাব-প্রকৃতি যা তার মধ্যে তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ বস্তুর স্বভাব-প্রকৃতিকে উপর্যুক্ত প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কারণ বানিয়েছেন। যেমন– আগুনের স্বভাব হলো জ্বালানো। বস্তুত এখানে কোনো বস্তুর মৌলিকভাবে নিজস্ব প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থাকার ব্যাপাটি অস্বীকার করা হয়েছে। আর যে-প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত তা মূলত স্বভাব-প্রকৃতিগত। তবে নবী করীম ﷺ উপর্যুক্ত বস্তুসমূহকে বিশেষভাবে উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রকৃত হিকমত সম্পর্কে শরীয়ার প্রবর্তকই সার্বিকভাবে জ্ঞাত।

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭১৯, হাদীস: ৪২ (২১৮৮), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত

[২] মোল্লা আলী আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, খ. ৭, পৃ. ২৮৯৯

কেউ কেউ বলেন, নারীর মন্দ লক্ষণগুলো হচ্ছে, বন্ধ্যাত্ব ও স্বামীর অবাধ্যতা অথবা স্বামীর চোখে অপছন্দনীয় ও কুৎসিত হওয়া। ঘরের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ ও ছোট হওয়া, পর্যাপ্ত আবহাওয়ার অভাব এবং প্রতিবেশী খারাপ হওয়া। ঘোড়ার বেলায় মন্দ লক্ষণ ধরা হয়, অবাধ্যতা, চড়ামূল্য আর প্রভুর জন্য সুবিধাজনক না হওয়া ইত্যাদি।

এখানে কুলক্ষণ বস্তুত রূপক অর্থে। কোনো জিনিস-পত্রে যেকোনো বিষয় শরীয়ত বা মানুষের অভিরুচির পরিপন্থী হওয়ার দরুন যা অপছন্দনীয় তাই মূলত অলক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

একথার সমর্থনে *শারহুস সুন্নাহে* উল্লেখ করা হয়েছে; গ্রন্থকার বলেন, যদি তোমাদের কারো কাছে বসবাসের জন্য নিজের বাড়ি পছন্দ না হয় বা স্ত্রীর সাথে সান্নিধ্য বিরক্তিকর মনে হতে থাকে অথবা নিজের ঘোড়াটি আর ভালো না লাগে তখন তা বাড়ি পরিবর্তন, স্ত্রীকে তালাক এবং ঘোড়াটি বিক্রি করার মাধ্যমে তা থেকে নিস্কৃত করবে। যাতে মনের অস্বস্তি ও অশান্তি বিদূরিত হয়। যেমন– এক লোক প্রশ্ন করেছিলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! إِنَّا كُنَّا فِيْ دَارٍ كَثِيْرٌ فِيْهَا عَدَدُنَا....

'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা যে বাড়িতে বসবাস করি তাতে আমরা লোকসংখ্যা খুব বেশি।'

জবাবে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

«ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً».

'তাহলে এটি পরিত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়।'[১]

অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বাড়িটি পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাতে তারা বাড়িটির ক্ষেত্রে তাদের আত্ম-অস্বস্তি দূর হয়ে যায়। এই নির্দেশ এই কারণে নয় যে, বাড়িটিই এই অস্বস্তির কারণ ছিল।[২]

অতএব কুলক্ষণ ও অশুভ ধারণা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে। বাকি প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

---

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২০, হাদীস: ৩৯২৪, হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত.

[২] আল-বাগাওয়ী, *শরহুস সুন্নাহ*, খ. ১২, পৃ. ১৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: اَلْعَدْوَىٰ

ইতঃপূর্বে সংক্রামক ব্যাধি ও ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কিত ধারণার অসারতা বিষয়ক হাদীসগুলো আমরা উল্লেখ করেছি যাতে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো পোষণের ব্যাপারে বারণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সাধারণ লোকদের একটি প্রশ্ন হলো, ছোঁয়াচ সংক্রমণকে নাকচ করার পরও রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ» (শ্বেতরোগী থেকে সেভাবে দূরত্ব বজায় রাখো যেমনটি তোমরা বাঘ থেকে পালিয়ে বাঁচো।)[১] তিনি আরও ইরশাদ করেন, «وَلَا يَحِلُّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ» (রোগা উটকে সুস্থ উটের সাথে রাখা উচিত নয়।)[২] অন্য এক বর্ণাতে এসেছে, «وَلَا يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ» (কেউ যেন কখনো রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উঠের সাথে না রাখে)[৩] এখানে অসুস্থ বলতে রুগ্ণ উটের মালিক এবং সুস্থ বলতে সুস্থ উটের মালিক। অথচ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, «لَا يُعْدِيْ شَيْءٌ شَيْئًا» (একজনের রোগবালাই অন্যের কাছে পার হয় না।)[৪]

জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে বলল,

فَمَا بَالُ إِبِلٍ، يَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيُجْرِبُهَا؟

'এ-ব্যাপারে আপনার মত কি যে, হরিণের ন্যায় সুস্থ উপ প্রান্তরে থাকে। পরে কোনো চর্মরোগগ্রস্থ উট এদের সাথে মিশে সবগুলোকে চর্মরোগে আক্রান্ত করে।'

বেদুঈনের বক্তব্য খ-ন করে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

«فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟»

'তা যদি হয় তবে প্রথমটিকে কে রোগাক্রান্ত করল?'[৫]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৫৭০৭, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ৫, পৃ. ১৩৮০, হাদীস: ৭৫০, হযরত আবু আতিয়্যা আল-আশজায়ী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ৫৭৭১, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৪] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৪৫০–৪৫১, হাদীস: ২১৪৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৫] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৫৭১৭ ও পৃ. ১৩৭, হাদীস: ৫৭৭০, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلنُّقْبَةُ تَكُوْنُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيْرِ، أَوْ بِعَجْبِهِ، فَيَشْتَمِلُ الْإِبِلَ كُلَّهَا جَرَبًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَىٰ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمُصِيْبَاتِهَا وَرِزْقَهَا».

'জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! চর্মরোগ প্রথমে উটের ঠোটে বা লেজে দেখা যায়, এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উটের শরীরেও তা ছড়িয়ে পড়ে। একথার প্রতিক্রিয়ায় রাসূলে ﷺ ইরশাদ করেন, 'প্রথম যে-উটের শরীরে রোগটি হয়েছে তা কোথা থেকে এসেছিলো? মনে রেখো! রোগের মধ্যে কোনো সংক্রামক শক্তি নেই, পেঁচায় কোনো অশুভ নেই এবং সফর মাসের মধ্যে অমঙ্গলের কিছু নেই। আল্লাহ প্রত্যেকটি প্রাণী সৃষ্টির পর তার জীবন, বিপদাপদ ও রিযক নির্ধারণ করে দিয়েছেন।''[১]

বর্ণিত আছে যে, প্রথম প্রথম হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه নবী করীম ﷺ-এর দুটো হাদীস বর্ণনা করতেন: «لَا عَدْوَىٰ» (রোগের মধ্যে কোনো সংক্রামক শক্তি নেই) ও «لَا يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ» (কেউ যেন কখনো রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উঠের সাথে না রাখে।) পরে «لَا عَدْوَىٰ» হাদীসটি বর্ণনা থেকে তিনি নিরবতা অবলম্বন করেন এবং «لَا يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ» হাদীসটিই কেবল বর্ণনা করতেন তিনি। বরং হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه প্রথম হাদীসটি অস্বীকার করেন। লোকজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি «لَا عَدْوَىٰ» হাদীসটি বর্ণনা করেননি? এ-সময় তিনি হাবশি ভাষায় কি যেন বললেন। হযরত আবু সালামা رضي الله عنه বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه এ-হাদীসটি ভিন্ন অন্য কোন হাদীস ভুলে যেতে দেখিনি।[২]

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৪, পৃ. ৮৫, হাদীস: ৮৩৪৩; (খ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ১৩, পৃ. ৪৮৭, হাদীস: ৬১১৯, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ৫৭৭১; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৩, হাদীস: ১০৪ (২২২১), হযরত আবু সালামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

হযরত আবু হুরায়রা -এর চাচাতো ভাই হযরত হারিস বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তুমি তো এ-হাদীসটির অন্য হাদীসটিও বর্ণনা করতে, এখন দেখছি সে ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করছ! তুমি বলতে, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, ‹لَا عَدْوَى› (রোগের মধ্যে কোনো সংক্রামক শক্তি নেই)। প্রতিক্রিয়ায় হযরত আবু হুরায়রা হাদীসটি সম্পর্কে তাঁর জানাশোনার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। বরং তিনি বলেন, ‹لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ› (কেউ যেন কখনো রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে না রাখে।) এ-নিয়ে হযরত হারিস -এর বিতর্কে হযরত আবু হুরায়রা একপর্যায়ে রেগে যান এবং হাবশি ভাষায় কি যেন বলেন। হযরত আবু সালামা বলেন, আমার প্রাণের শপথ! হযরত আবু হুরায়রা অবশ্যই আমাদেরকে এ-হাদীসটি বর্ণনা করতেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, ‹لَا عَدْوَى› (রোগের মধ্যে কোনো সংক্রামক শক্তি নেই)। জানি না, হযরত আবু হুরায়রা কি ভুলে গেলেন? নাকি এ-দুটো হাদীসের একটি রহিত হয়ে গেল।[1]

যদি আপনি প্রশ্ন তুলেন যে, যেহেতু হযরত আবু হুরায়রা নিজে বর্ণনাটি অস্বীকার করেছেন সেহেতু সেটি আর হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। এ-ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এখানে উসুলে হাদীসের বিধান হচ্ছে, সাধারণত যদি কোনো বর্ণনাকারী তাঁর কোনো হাদীস বর্ণনা অস্বীকার করেন তাতে হাদীসটির প্রমাণ্যতা বাতিল হয়ে যায় না। যদি আমরা মেনেও নিই তবুও ‹لَا عَدْوَى› (রোগের মধ্যে কোনো সংক্রামক শক্তি নেই) হাদীসটি অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত অনেক হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত। সে-ধরনের হাদীসও আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

রোগে সংক্রমণ নাকচকারী ও শ্বেতরোগীকে এড়িয়ে চলতে নির্দেশক হাদীসদুটোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে ‹لَا يَحُلُّ...› (রোগা উটকে সুস্থ উটের সাথে বাঁধা উচিত নয়)[2] বা ‹وَلَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ

[1] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৩, হাদীস: ১০৪ (২২২১), হযরত আবু সালামা থেকে বর্ণিত

[2] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ৫, পৃ. ১৩৮০, হাদীস: ৭৫০, হযরত আবু আতিয়া আল-আশজায়ী থেকে বর্ণিত

مُصِحٍّ» (কেউ যেন কখনো রোগাক্রান্ত উটকে সুস্থ উটের সাথে না রাখে)[১] হাদীসদুটোর মধ্যেও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। সুতরাং রোগে সংক্রমণ নাকচকারী ও শ্বেতরোগীকে এড়িয়ে চলতে নির্দেশক হাদীসদুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ ও প্রণিধানযোগ্য অভিমতসমূহ উল্লেখ করবো। এতে দ্বিতীয় হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের তথ্য-সূত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন।

অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে, নবী করীম ﷺ-এর ইরশাদ: «لَا عَدْوَى» (রোগের মধ্যে কোনো সংক্রামক শক্তি নেই)-এর বিশ্লেষণে *সহীহ আল-বুখারী*র ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, 'স্বভাবভাবে রোগব্যাধি সংক্রমিত হতে পারে না। এটি বস্তুত আল্লাহ তাআলার হুকুম ও তাঁর পরিচালিত প্রাকৃতিক নিয়ম।'[২]

এ কারণেই নবী করীম ﷺ অসুস্থ উটের কাছে সুস্থ উটকে যেতে নিতে নিষেধ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ» (শ্বেতরোগী থেকে দূরত্ব বজায় রেখো... ।)[৩] কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটি «لَا عَدْوَى» থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র (এ-দুটোর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে।)

ইমাম আত-তূরবুশ্‌তী رحمه الله বলেন, 'নবী করীম ﷺ-এর ইরশাদ: «لَا عَدْوَى»-এর মর্মার্থ বিশ্লেষণে ওলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেন, স্পষ্ট হাদীসের বক্তব্য এবং ছোঁয়াচের ওপর পূর্বে আলোচিত আলামত দ্বারাই রোগের সংক্রমণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসার একথা সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব এখানে এটিই উদ্দেশ্য।

আর কারো কারো রায় হচ্ছে, এখানে রোগের সংক্রমনশক্তি নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» (শ্বেতরোগী থেকে দূরে থাকো যেমটি মানুষ বাঘ থেকে পালিয়ে বাঁচে।)[৪] তিনি আরও ইরশাদ করেন,

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ৫৭৭১, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] আল-কিরমানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২১, পৃ. ৩

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৫, পৃ. ৪৪৯, হাদীস: ৯৭২২; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৫৭০৭, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৪] আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*

«لَا يُوْرَدَنَّ ذُوْ عَاهَةٍ عَلَىٰ مُصِحٍّ» (কেউ যেন কখনো উন্মাদ উটকে সুস্থ উটের সাথে না রাখে)। এসব দ্বারা প্রকৃতিবাদীদের বিশ্বাসই মূলত নাকচ করা হয়েছে। যারা বিভিন্ন অশুভ প্রভাবের অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। এখানে তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে, তারা যেমন ধারণা ব্যাপারটি ঠিক সে-রকম নয়। বস্তুত ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে সেটা কারো শরীরে ক্রিয়া করবে, না চাইলে করবে না। এ-দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟» (তাহলে প্রথম অসুস্থ উটটিকে কে রোগাক্রান্ত করল?) অর্থাৎ যদি তোমাদের ধারণা অনুযায়ী এখানে অসুস্থতার একমাত্র কারণ সংক্রমণই প্রতিক্রিয়াশীল হয় তাহলে প্রথম অসুস্থ উটটিকে কে রোগাক্রান্ত করল?

অবশ্য নবী করীম ﷺ এও ইরশাদ করেছেন যে, «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ» (শ্বেতরোগী থেকে দূরত্ব বজায় রেখো... ।)[1] তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, «لَا يُوْرَدَنَّ ذُوْ عَاهَةٍ عَلَىٰ مُصِحٍّ» (কেউ যেন কখনো উন্মাদ উটকে সুস্থ উটের সাথে না রাখে)। এসব অসুস্থতার কারণসমূহ হেলেপড়া দেয়াল এবং ভাঙা নৌকো থেকে দূরে থাকার নির্দেশের সাথে তুলানা রাখে।

উদ্ধৃত হাদীসদুটো প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের দাবিকে রদ করেছেন। হাদীসদুটোতে শ্বেতরোগী ও অসুস্থ উট যেকারো সাথে মেলামেশা করতে নিষেধের ব্যাপারটি সহানুভূতিমূলক। কেউ যেন ঘটনাক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা উট রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে সংক্রামিত হওয়ার প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

তিনি আরও বলেন, উপর্যুক্ত বিশ্লেষণদুটোর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্লেষণটিই অধিক যথার্থ। কেননা এতে সেসব হাদীসের মধ্যেই সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে যা প্রসঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য প্রথম বিশ্লেষণ দ্বারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো অসার করে দেয়। তবে ইসলামে চিকিৎসাবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো বাতিল করা হয়নি। বরং শরীরবৃত্তীয় অনেক বক্তব্য ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ। অতএব এখানে এমনভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে যাতে, তাওহীদী বিশ্বাসের বিপরীতও যেন না হয় এবং আমরা উপরে যা বলেছি তারও বিপরীত না হয়।

---

[1] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৫৭০৭, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত

অবশ্য রোগের সংক্রমণে ধারণা ভিত্তিহীন প্রমাণে তাঁরা বিভিন্ন আলামতকে ভিত্তি করে যে-দলিল উপস্থাপন করেছেন তার জবাবে বলা যায় যে, সাহেবে শরীয়তের অনেক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একই সাথে একটি বিষয়কে হারাম ও মাকরুহ বলা হয়েছে। কোনো বিষয় যা একটি মাত্র কারণে নিষিদ্ধ এবং আরেকটি বিষয় যা অনেকগুলো কারণে নিষিদ্ধ উভয়কেও এক করে ফেলা হয়েছে। আমাদের এ-বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায় নবী করীম ﷺ-এর হাতে বায়আত গ্রহণে ইচ্ছুক এক শ্বেতরোগীর উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ-এর এ-পবিত্র ইরশাদ «قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ» (তোমাকে আমি বায়আত করে নিলাম, তুমি যাও)[১] থেকে। অথচ খোদ নবী করীম ﷺ অন্য সময় এক শ্বেতরোগী হাত ধরে তা একটি খাবারের পাত্রে রেখে ইরশাদ করেন, «كُلْ ثِقَةً بِاللهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ» (আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রেখে খাও)[২]। এ-উভয় হাদীসের মাঝে সুসঙ্গতির কোনো পথ খোলা নেই, তবে প্রথম হাদীসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপসর্গসমূহ থেকে সতর্কতা অবলম্বন আর দ্বিতীয় হাদীসের ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতিকর কারণসমূহ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লে কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—এ-ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। অতএব প্রথম হাদীস দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির কারণসমূহ থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রমাণিত হয়, এটি সুন্নতও বটে। দ্বিতীয় হাদীস থেকে বিশেষ প্রেক্ষাপটে ক্ষতির কারণসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশনা প্রমাণিত হয়।'[৩]

আর ইমাম আত-তীবী রহ. হযরত আমর ইবনে শারিদ রাযি. বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, বনী সাকীফের প্রতিনিধি দলে একজন শ্বেতরোগী ছিলেন, লোকটিকে নবী করীম ﷺ ফেরত পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, «قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ» (তোমার আমি মঞ্জুর করে নিলাম এবার তুমি ফিরে যাও)। হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন।[৪] এ-হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ-এর পক্ষ থেকে এটি একটি মঞ্জুরি সেসব লোকের জন্য যারা

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৫২, হাদীস: ১২৬ (২২৩১), হযরত শারীদ ইবনে সুওয়াইদ আস-সাকাফী রাযি. থেকে বর্ণিত

[২] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২০, হাদীস: ৩৯২৫, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত

[৩] আত-তূরবুশ্তী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১০১০–১০১১

[৪] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৫২, হাদীস: ১২৬ (২২৩১), হযরত শারীদ ইবনে সুওয়াইদ আস-সাকাফী রাযি. থেকে বর্ণিত

তাওয়াক্কুলের কাঙ্ক্ষিত স্তরে তখনো পৌঁছাতে পারেনি এবং বিভিন্ন কার্যকারণকেই মূলত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অবশ্যই একথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ রেখেছেন।[১]

আর ইমাম আল-বাগাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কারো কারো বক্তব্য হচ্ছে, শ্বেতরোগীর শরীরের একধরণের দুর্গন্ধ থাকে। তার সাথে উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া এবং চলাফেরা করলে তাই অনুভূত হয়। এর সাথে কিন্তু সংক্রমণ শক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। এসব তো বরং স্বাস্থ্য ও অভিরুচির ব্যাপার। বাসি ও পঁচা খাবারগ্রহণ এবং অরুচিকর পরিবেশে বসবাস যেমন স্বাস্থ্য-উপযোগী নয় (শ্বেতরোগীর শরীরের দুর্গন্ধও তেমন, এটি স্বাস্থ্যগত সমস্যা। এটা সংক্রমক শক্তির প্রভাব নয়)। প্রকৃত সত্য হলো, পৃথিবীতে যা কিছুই ঘটে কেবল আল্লাহর হুকুমেই ঘটে।

وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

'বস্তুত তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুরই কারো ক্ষতি সাধণের ক্ষমতা নেই।'[২]

শায়খ ইমাম হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ *শরহু নুখবাতিল ফিকার* গ্রন্থে বলেন, উপর্যুক্ত দু'ধরনের হাদীসের মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই, বরং সামঞ্জস্য আছে। প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ আপনা আপনি সংক্রমিত হয় না। তবে আল্লাহ তাআলা অসুস্থ মানুষের সাথে সুস্থ মানুষের সংশ্রবকে রোগবালাইয়ের একটি পার্থিব কার্যকারণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতএব কখনো এ-ধরনের সংশ্রবে রোগবালাই ছড়াতেও পারে। আবার কখনো কখনো এসব কারণের উপস্থিতিতেও রোগ ছড়ায় না। ইবনুস সালাহও এভাবে সামঞ্জস্য বর্ণনা করেছেন।[৩]

উভয় হাদীসের মধ্যকার সামঞ্জস্য বিধানে আমাদের বলা উচিত হবে যে, নবী করীম ﷺ-এর সংক্রমণ সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা পোষণ থেকে বারণ করা সাধারণভাবে যথাস্থানে ঠিকই আছে। সেই সাথে «لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا» (একজনের রোগ অন্যজনের প্রতি ছড়ায় না) মর্মে যে-বক্তব্য দিয়েছেন তাও সম্পূর্ণ সঠিক। নবী করীম ﷺ এও বলেছেন যে, «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟» (তবে কে প্রথম

---

[১] আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ২৯৮২

[২] (ক) আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১০২; (খ) আল-বাগাওয়ী, *শরহুস সুন্নাহ*, খ. ১২, পৃ. ১৭১–১৭২

[৩] (ক) ইবনুস সালাহ, *মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস*, পৃ. ২৮৫; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *নুযহাতুন নযর*, পৃ. ৯২ ও ২১৬

লোকটিকে অসুস্থ করল?) অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তিকে যেমন আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসুস্থ করেছেন ঠিক অনুরূপভাবেই তিনি অপরাপর লোকগুলোকে অসুস্থ করেন।

শ্বেতরোগী এড়িয়ে চলার এ-নির্দেশনা ভ্রান্তি নিরসনের জন্যে। কারণ হতে কোনো ব্যক্তি শ্বেতরোগীর সংশ্রবের পর ঘটনাক্রমে আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী অসুস্থ হয়ে পড়ে, যা কখনো নিন্দিত সংক্রমক শক্তির প্রভাবে হয়েছে এমন নয়। তবুও সে ধারণা করে বসতে পারে যে, এটা শ্বেতরোগীর সাথে সংশ্রবের ফলে সংক্রমিত হয়েছে। ফলে সে ভ্রান্ত সংক্রমণ ধারণাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করবে। এতে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অতএব হাদীসে এ-ভ্রান্ত বিশ্বাস সমূলে উপড়ে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন সবকিছু।[1]

এই ছিল শায়খ ইবনে হাজার আল-আসকলানী ﵀-এর বক্তব্য যা *নুখবাতুল ফিকারের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। টীকায় বলা হয়েছে, তিনি আরও বলেন, একজন শ্বেতরোগীর সাথে নবী করীম ﷺ একপাত্রে একসাথে খাওয়ার ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে না। নবী করীম ﷺও আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে বিন্দুপরিমাণ সন্দিহান হবেন তা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এটা মূলত আত্মবিশ্বাসে দোদুল্যমান, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ব্যাপার যারা কোনো রোগ দেখা দিলে তা অন্য কারো থেকে সংক্রমিত বলে ধারণা পোষণ করে। বস্তুত নবী করীম ﷺ ছিলেন সমগ্র জগতের জন্য রহমত। তিনি এর মধ্য দিয়ে যাতে মানুষ শিরকের সাগরে সামান্যটুকুও পতিত না হয় সে জন্য তিনি কাজটি করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর নবীর অপরিসীম অনুগ্রহের এই বিস্তৃত ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের পূণ্য-আমলের তওফীক দিন। দয়া ও মমতার আধার নবী করীম ﷺ-এর ওপর অগুণিত শুভেচ্ছা ও সালাম প্রেরণ করছি।

এসব বক্তব্য হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকালানী ﵀-এর। তিনি নবী করীম আলায়হিস সালাত ওয়াস সালামের সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে প্রসঙ্গটির ইতি টেনেছেন। আমিও সেভাবেই আলোচনার সমাপ্তি টানলাম। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী।

---

[1] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪ ও ২১৬-২১৭
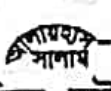
মাহে রবিউল আউওয়াল

এ-পর্বে নবী করীম ﷺ-এর আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং সে-প্রাসঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানের আলোচনাই অধিকতর উত্তম ও উচিৎ হবে বোধ করি। এরপর স্বপ্নযোগে নবী করীম আলায়হিস সালাত ওয়াস-সালামের সাক্ষাৎ-বিষয়ে আলোচনা করে পর্বটি শেষ করবো। এ-পর্বে দুটো অধ্যায় থাকবে।

প্রথম অধ্যায় :
নবী করীম সালাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আলোচনা

ওহে সত্যিকারের বন্ধুমহল! জেনে রেখ—আল্লাহ তোমাদেরকে বিশ্বাসের বিভাসায় সাহায্য করুন, নবী করীম ﷺ-এর আলোচনায় তোমাদের হৃদয়-অন্তর উদ্ভাসিত করুন—সালাম নিবেদন করছি রাসূল-সরদার ও তাঁর পূত-পবিত্র পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবাদের প্রতি।

যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিয়সী আমিনা (আলায়হাস সালাম)-এর গর্ভে আসলেন তখন তাঁর গর্ভধারনে বহু বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে। যেসব বিস্ময়ভরপুর আলোচনা এসেছে সিরাতগ্রন্থ এবং বর্ণিত হয়েছে ইতিহাসসমগ্রে। আমরা সেই সব থেকে প্রকৃত ঘটনা-সম্পর্কে প্রসিদ্ধ, ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য সূত্রে সঠিক হাদীসের বর্ণনাসমূহের চুম্বক উদ্ধৃত করছি—কাজটি সম্পাদনের জন্য আল্লাহর তওফীক কামনা করি।

বর্ণিত হয়েছে,

وَإِنَّهُ كَانَتْ قُرَيْشٌ فِيْ جَدْبٍ شَدِيْدٍ، وَضِيْقٍ عَظِيْمٍ. فَلَمَّا حَمَلَتْ بِهِ ﷺ أَخْضَرَتِ الْأَرْضُ، وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارُ، وَأَتَاهُمُ الْوَجْدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. فَسُمِّيَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِيْ حَمَلَتْ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَنَةَ الْفَتْحِ وَالْإِبْتِهَاجِ.

'সে-সময় কুরায়শরা প্রচ- দুর্ভিক্ষ ও মহামন্দায় বিধ্বস্ত ছিলো। মায়ের গর্ভে নবী করীম ﷺ-এর আগমণের পর মরুভূমি সবুজ-সজীব হয়ে ওঠে, গাছপালা ফল-ফসলে সুফলা-সুজলা হয়ে ওঠে। কুরায়শরা সার্বিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ-কারণে এ-যে-বছর নবী করীম ﷺ মায়ের গর্ভে আগমন করেন তাকে কুরায়শরা সাফল্য ও সমৃদ্ধির বছর হিসেবে আখ্যায়িত করে।'[১]

ইমাম (মুহাম্মদ) ইবনে ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,

إِنَّ آمِنَةَ تُحَدِّثُ: أَنَّهَا أُتِيَتْ حِيْنَ حَمَلَتْ بِهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهَا: إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

'হযরত আমিনা আলাইহাস সালাম বলতেন, নবী করীম ﷺ যখন তাঁর গর্ভে আসেন তখন তাঁর কাছে একদল ফেরেশতা আসলেন। তাঁকে বলা হলো: তুমি এ-জাতির সরদারকে গর্ভে ধারণ করছো।'[২]

তিনি আরও বলেন,

مَا شَعِرْتُ بِأَنِّيْ حَمَلْتُ بِهِ، وَلَا وَجَدْتُ لَهُ ثِقَلًا وَّلَا وَحَمًا كَمَا تَجِدُ النِّسَاءُ إِلَّا أَنِّيْ أَنْكَرْتُ رَفْعَ حَيْضَتِيْ.

'আমি বুঝতে পারিনি যে, আমি তাঁকে গর্ভেধারণ করছি। গর্ভাবস্থায় সাধারণত অন্যান্য মহিলারা যে-ধরনের কষ্টভোগ করে আমার সে-রকম কোনো কষ্ট অনুভব হতো না, না কোনো কিছু খাওয়ারও ইচ্ছা হতো। তবে আমার রজঃস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছিলাম না।'[৩]

কয়েকটি হাদীসে মারফু-সূত্রে এসেছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

«حَمَلَتْ بِيْ أُمِّيْ كَأَثْقَلِ مَا تَحْمِلُ النِّسَاءُ، وَجَعَلَتْ تَشْتَكِيْ إِلَىٰ صَوَاحِبَاتِهَا ثِقَلَ مَا تَجِدُ، ثُمَّ إِنَّ أُمِّيْ رَأَتْ فِي الْمَنَامِ أَنَّ الَّذِيْ فِيْ بَطْنِهَا نُوْرٌ».

[১] আল-কাসত্বাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া*, খ. ১, পৃ. ৭২; কা'আব আল-আহবার রহ. থেকে বর্ণিত

[২] ইবনে ইসহাক, *আস-সিয়ার ওয়াল মাগাযী*, পৃ. ৪৫

[৩] আল-কাসত্বাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭৩

'অন্যান্য মহিলারা যেমন গর্ভাবস্থায় কষ্টভোগ করে অনুরূপভাবে আমার মা আমায় গর্ভধারণ করেন। তিনি তাঁর এই কষ্টভোগের কথা নিজের সখি-বান্ধবীদের অবহিত করেছিলেন। অতঃপর আমার মা রাতে স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তাঁর গর্ভে আবির্ভাব হয়েছে এক মহাজ্যোতির।'[১]

আল-হাদীস। এ-হাদীসেই নবী করীম আলায়হিস সালাত ওয়া-সালামের মাতা হযরত আমিনা তাঁর গর্ভাবস্থায় কষ্টভোগ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তবে অন্যান্য হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন মাতা আমিনার কোনো কষ্টভোগ করতে হয়নি।

হাফিয আবু নুআইম (আল-আসবাহানী) হাদীসদুটোর মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন যে, 'গর্ভ সঞ্চারের প্রথম প্রথম কিছুটা কষ্ট অনুভব হয়েছিলো কিন্তু শেষের দিকে তা আর হয়নি। এটা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।'

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আয়িয থেকে বর্ণিত,

وَبَقِيَ ﷺ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كَمَلًا لَا تَشْكُوْ وَجَعًا، وَلَا مَغْصًا، وَلَا رِيْحًا، وَلَا مَا يَعْرِضُ لِلنِّسَاءِ ذَوَاتِ الْحَمْلِ. وَكَانَتْ أُمُّهُ تَقُوْلُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ حَمْلٍ هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ، وَلَا أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْهُ.

'নবী করীম ﷺ তাঁর মায়ের গর্ভে পূর্ণ নয় মাস অবস্থান করেন। ওই সময় সাধারণ মহিলাদের মতো গর্ভকালীন ব্যথা-বেদনা, মোচড় ও নড়াচড়াজনিত কোনো কষ্ট অনুভূত হয়নি মা আমিনার। নবী করীম ﷺ-এর মহিয়ষী মা বলতেন, আল্লাহর কসম! আমি এতো সহজ গর্ভসঞ্চার আর কোনোটি দেখিনি আর এর চেয়ে মর্যাদাময় কোনো গর্ভ হয় না।'[২]

'মায়ের গর্ভে নবী করীম ﷺ-এর দু'মাসের সময় পিতা আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে পিতার মৃত্যুর সময় তিনি লালিত-পালিত হচ্ছিলেন।[৩] তবে প্রথমোক্তটি প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধ মত; মদীনা থেকে মক্কা

---

[১] আল-আজুররী, *আশ-শরীআ*, খ. ৩, পৃ. ১৪২৩, হাদীস: ৯৬২; হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস থেকে বর্ণিত।

[২] আল-কাসৃতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭৪

[৩] আস-সুহায়লী, *আর-রাওযুল আনফ*, খ. ২, পৃ. ৯৯; তিনি লিখেন, এই অভিমতটি হাফিয দুলাবীর।

ফেরার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং আবওয়া নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।'[১]

ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-সূত্রে বর্ণনা করেন,

كَانَتْ آمِنَةُ تُحَدِّثُ وَتَقُوْلُ: أَتَانِيْ آتٍ حِيْنَ مَرَّ بِيْ مِنْ حَمْلِيْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فِي الْمَنَامِ، وَقَالَ لِيْ: يَا آمِنَةُ! إِنَّكِ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِيْنَ. فَإِذَا وَلَدْتِيْهِ فَسَمِّيْهِ مُحَمَّدًا، وَاكْتُمِيْ شَأْنَكِ. قَالَتْ: ثُمَّ لَمَّا أَخَذَنِيْ مَا يَأْخُذُ النِّسَاءَ، وَذَكَرَتْ عَجَائِبَ مِمَّا رَأَيْتُ مِنَ الطُّيُوْرِ الْبِيْضِ مَنَاقِيْرُهَا مِنَ الزُّمُرُّدِ وَأَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَوَاقِيْتِ، وَرِجَالًا وَنِسَاءً فِي الْهَوَىٰ بِأَيْدِيْهِمْ وَأَبَارِيْقُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَشَفَ لِيْ عَنْ بَصَرِيْ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ: عَلَمًا فِي الْمَشْرِقِ وَعَلَمًا فِي الْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَىٰ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَأَخَذَنِي الْمَخَاضُ، فَوَضَعْتُ مُحَمَّداً ﷺ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، وَقَدْ رَفَعَ إِصْبَعَيْهِ كَالْمُتَضَرِّعِ الْمُبْتَهِلِ، ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بَيْضَاءَ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّىٰ غَشِيَتْهُ فَغُيِّبَتْهُ عَنِّيْ، فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِيْ: طُوْفُوْا بِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَأَدْخِلُوْهُ الْبِحَارَ؛ لِيَعْرِفُوْهُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُوْرَتِهِ، وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ سُمِّيَ فِيْهَا الْمَاحِيَ؛ لَا يَبْقَىٰ شِرْكٌ مِنَ الشِّرْكِ إِلَّا مُحِيَ بِهِ فِيْ زَمَنِهِ، ثُمَّ تَجَلَّتْ عَنْهُ فِيْ أَسْرَعِ وَقْتٍ.

'হযরত আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, আমার গর্ভকালের মাস ছয়টি অতিবাহিত হবার পর স্বপ্নে এক আগন্তুক এসে আমাকে বললো, ওহে আমিনা! তুমি গর্ভে ধারণ করছো সারা জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবকে। জন্মের পর তাঁর নাম রাখবে 'মুহাম্মদ' এবং তোমার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখবে। তিনি বলেন,

---

[১] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭৫

অতঃপর যখন অন্যান্য মহিলাদের মতো আমার প্রসবকাল ঘনিয়ে এলো, ওইসময়ের অনেক বিস্ময়কর ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেন, এর মধ্যে একটি হলো আমি এমন সাদা রঙের পাখিদের দেখতাম যাদের ঠোঁট ছিল পান্নার এবং পাখা ছিলো পদ্মরাগ মণির। দেখতাম আকাশে কিছু ছেলে-মেয়ে উড়ছে যাদের হাতে থাকতো ঝলমলে রূপার পাত্র। আল্লাহ আমার চোখের সামনের পর্দা উঠিয়ে দিলেন, আমি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অবলোকন করলাম। এছাড়াও তিনটি পতাকা দেখলাম যার একটি পৃথিবীর পূর্বে, একটি পশ্চিমে এবং আরেকটি কাবাগৃহের ওপর স্থাপিত। অতঃপর আমার প্রসববেদনা শুরু হয় আর আমি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে ভূমিষ্ট করি। আমি দেখতে পেলাম তিনি সাজদারত। তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলি উপরের দিকে ওঠানো ছিলো, তিনি প্রভুর দরবারে কাঁদোকাঁদোভাবে বিনয়াবনত ছিলেন। এরপর আমি আকাশে একটি সাদা মেঘখ- দেখলাম, এটি আকাশ থেকে এসে তাঁকে ঢেকে নিলো; একপর্যায়ে তাঁকে আমার আড়ালে নিয়ে যাওয়া হলো। এরপর একজন ঘোষকের কণ্ঠ শুনতে পেলাম যিনি ঘোষণা দিচ্ছেন, তাঁকে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত প্রদক্ষিণ করিয়ে এনো, সাগর-মহাসাগর অঞ্চলে নিয়ে যাও। যাতে এরা সকলে তাঁর নাম-পরিচয়, মহত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়। এরা আরও জানবে যে, তিনি পৃথিবীর সকল প্রকার অন্ধকার বিতাড়িত করতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর আগমনে কোনোপ্রকার বহুত্ববাদ চলবে না, তাঁর যুগে তিনি এসবের নাম-নিশানা মুছে ফেলবেন। এরপর দ্রুতই সে-মেঘখ- সরে যায়।'[১]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা'দ রহিমাহুল্লাহ একদল মুহাদ্দিস-সূত্রে—যাঁদের মধ্যে আতা রহিমাহুল্লাহ ও হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অন্যতম—বর্ণনা করেন,

أَنَّ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ، قَالَتْ: لَمَّا فَصَلَ مِنِّيْ تَعْنِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مَعَهُ نُوْرٌ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ثُمَّ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَىٰ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً مِّنَ التُّرَابِ، فَقَبَضَهَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

[১] আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *দালায়িলুন নুবুওয়াহ*, খ. ১, পৃ. ৬১০–৬১১, হাদীস: ৫৫৫

'হযরত আমিনা বিনতে ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমার গর্ভমুক্ত হন সেই সময় একটি আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিলো যার ছটায় পূর্ব ও পশ্চিম পুরো পৃথিবী মুহূর্তে আলোকিত হয়ে ওঠে। অতঃপর তিনি হাতের ওপর ভর দিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং একমুষ্টি মাটি হাতে নেন। পরপরই তা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করেন এবং আকাশের দিকে মাথা ওঠান।'[১]

ইমাম আত-তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ لَـمَّا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَقَعَ مَقْبُوضَـةً، أَصَابِعُ يَدَهِ مُشِيْرًا بِالسَّبَّابَةِ كَالْمُسَبِّحِ بِهَا.

'নবী করীম ﷺ যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন তিনি মুষ্টিবদ্ধ ছিলেন, তাঁর হাতের শাহাদত-অঙ্গুলি এমনভাবে ইঙ্গিতবহ ছিলো যেন তিনি তাসবীহ পড়ছিলেন।'[২]

ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম আল-বাযযার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আত-তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আল-হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আল-বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন,

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي عَبْدُ اللهِ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ أَنَا دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ، وَبِشَارَةُ عِيْسَىٰ بِيْ، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِيْ رَأَتْ، وَكَذٰلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ يَرَيْنَ، وَإِنَّ أُمَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْهُ نُوْرًا أَضَاءَ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ».

'হযরত আল-ইরবায ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা ও শেষনবী; আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম মাটির অন্তর্গত ছিলেন। খুব শিগগিরই আমি এসব ব্যাপারে তোমাদের অবগত করবো। আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আবদার, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সুসংবাদ এবং আমার মাতার দেখা স্বপ্ন। অনুরূপই

---

[১] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮১, হাদীস: ১৯১
[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭৮

নবীবর্গের মাতাগণ দেখতেন। আর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহিয়সী মাতা তাঁর জন্মের সময় এমন একটি নুর দেখতে পেয়েছিলেন যার আলোতে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা গিয়েছিলো।'[১]

হাফিয ইবনে হাজর (আল-আসকলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'ইমাম ইবনে হিব্বান রহমাতুল্লাহি আলাইহি[২] ও ইমাম আল-হাকিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি[৩] হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন।'[৪] এটির বেশকটি বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে[৫]।

আর এ-দিকে ইঙ্গিত করে হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কবিতায় বলেন এভাবে: কবিতা

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ

وَأَضَـــاءَتْ بِنُــوْرِكَ الْأُفُـــقُ

فَـنَحْنُ فِي ذٰلِـكَ الـضِّيَاءِ وَالنُّـوْرِ

وَسَـــبِيْلِ الرَّشَـــادِ نَخْـــتَرِقُ

'আপনি যখন জন্ম নিলেন এমন সময় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠেছিলো, আপনার আলো-ছটায় বিভাসিত হয়ে ওঠেছিলো চার দিগন্ত। আর আমরা সে আলোক-দীপ্তিতে সত্যের পথ খুঁজে পেয়েছি।'[৬]

---

১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৮, পৃ. ৩৯৫, হাদীস: ১৭১৬৩; (খ) আল-বাযযার, *আল-বাহরুয যাখ্খার*, খ. ১০, পৃ. ১৫৩, হাদীস: ৪১৯৯; (গ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১৮, পৃ. ২৫২, হাদীস: ২২৯ ও ২৩০; (ঘ) আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৫৩, হাদীস: ৩৫৬৬ ও পৃ. ৬৫৬, হাদীস: ৪১৭৫; (ঙ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ২, পৃ. ৫১০, হাদীস: ১৩২২

২ ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ১৪, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৬৪০৪

৩ আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৫৩, হাদীস: ৩৫৬৬ ও পৃ. ৬৫৬, হাদীস: ৪১৭৫

৪ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী*, খ. ৬, পৃ. ৫৮৩

৫ যেমন- ওমর ইবন মুহাম্মদ>ইবরাহিম ইবন আস-সিনদি>আন নাসর ইবন সালামা>মুহাম্মদ ইবন মূসা-সূত্রে আবু নুআয়ম কর্তৃক-দেখুন: আবু নুআয়ম, *দালায়িল আন-নুবুওয়াত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৭, হাদিস: ৭৯ এবং আমর ইবন আসিম আল কিলাবি>হাম্মাম ইবন ইয়াহইয়া>ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ-সূত্রে ইবন সাদ কর্তৃক-দেখুন: ইবন সাআদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১০২, হাদিস: হাদিসটির বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গি এসেছে।

৬ আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯, হাদীস: ৫৪১৭; হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

তাঁর আলোর ছটায় বিশেষত সিরিয়ার কথা গুরুত্ব-সহকারে আসার কারণ হলো এটি নবী করীম ﷺ-এর রাজধানী। যেমনটা হযরত কাআব রহ. বলেন,

إِنَّ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ: مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُتُهُ بِيَثْرَبَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ.

'প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আছে: আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ; তাঁর আবির্ভাব হবে মক্কায়, তাঁর হিজরতস্থল হবে ইয়াসরাব (মদীনা) এবং তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হবে সিরিয়া পর্যন্ত।'[১]

'এ-কারণেই মিরাজের সময় নবী করীম ﷺকে সিরিয়ার পথে বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। অনুরূপভাবে ইতঃপূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সিরিয়া হিজরত করেছিলেন আর এখানেই হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালাম আর্বিভূত হবেন।'[২] আর

«هِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ».

'সিরিয়া হলো কিয়ামতের সমাবেশ ও সম্মেলনভূমি।'[৩]

উপরন্তু বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে:

«عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِيْ إِلَيْهِ خِيَرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ».

'সিরিয়া তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমগ্র পৃথিবীতে এটি আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়। তাঁর প্রিয় বান্দারাও এলাকাটি খুব বেশি ভ্রমণ করেন।'[৪]

নবী করীম ﷺ-এর জন্মকালীন বিস্ময়কর ঘটনাবলি

ইমাম আল-বায়হাকী রহ. ও ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী রহ.) বর্ণনা করেন,

---

[১] আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬৭৮, হাদীস: ১০০৪৬
[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭৮
[৩] আত-তাবারানী, *মুসনদুশ শামিইয়ীন*, খ. ৪, পৃ. ৫৪, হাদীস: ২৭১৪, হযরত আবু যর আল-গিফারী রাযি. থেকে বর্ণিত
[৪] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৪, হাদীস: ২৪৮৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রাযি. থেকে বর্ণিত

إِنَّهُ كَانَ يَهُوْدِيٌّ سَكَنَ مَكَّةَ لِلتِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُوْدِ! طَلَعَ نَجْمُ أَحْمَدَ الَّذِيْ يُوْلَدُ فِيْ هَـٰذِهِ اللَّيْلَةِ.

'ওই সময়টায় এক ইহুদি ব্যবসার কাজে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শুভ-আবির্ভাবের রাতটি ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন, ওহে ইহুদি জাতি! মহামানব আহমদের তারকা উদিত হয়েছে, আজ রাতেই তিনি জন্মলাভ করবেন।'[১]

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَهُوْدِيٌّ قَدْ سَكَنَ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ وَلَدَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! هَلْ وَلَدَ فِيْكُمْ مَوْلُوْدٌ؟ قَالُوْا: لَا نَعْلَمُ، قَالَ: انْظُرُوْا فَإِنَّهُ وَلَدَ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَبِيُّ هِذِهِ الْأُمَّةِ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَامَةٌ، فَانْصَرَفُوْا، فَسَأَلُوْا، فَقِيْلَ لَـهُمْ: وَلَدَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ غُلَامٌ، فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ مَعَهُمْ إِلَىٰ أُمِّهِ، فَأَخْرَجَتْهُ لَـهُمْ، فَلَمَّا رَأَى الْيَهُوْدِيُّ الْعَلَامَةَ خَرَّ مُغْشِيًّا عَلَيْهِ، وَقَالَ: ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ. يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَمَا وَاللهِ لَيَسْطُوْنَ بِكُمْ سُطْوَةً، يَخْرُجُ خَبَرُهَا مِنَ الْـمَشْرِقِ وَالْـمَغْرِبِ.

'হযরত আয়িশা رضي الله عنها বলেন, সে-সময় এক ইহুদি মক্কায় অবস্থান করছিলেন। যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শুভ-আবির্ভাবের রাতটি ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আজ কি তোমাদের বংশে কোনো নবজাতকের জন্ম হয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, দেখ দেখ, নিশ্চয় আজ রাতে জন্ম নেবেন এ-জাতির নবী; তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে এর নিদর্শন রয়েছে। একথা শুনে কুরাইশের লোকেরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং খবরাখবর

[১] (ক) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১০৯-১১০, হাদীস: ৪৬; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদীস: ৩৫, হযরত হাসসান ইবনে সাবিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

নিতে লাগলো। অতঃপর খবর পাওয়া গেল, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ঘরে এক নবজাতক জন্ম নিয়েছে। কুরাইশের লোকজনকে সাথে নিয়ে ইহুদি তাঁর মায়ের কাছে হাজির হলেন। মাতা আমিনা তাঁর সদ্যোজাত শিশুটিকে দেখাতে সম্মত হন। ইহুদি নুবুওয়াতের নিদর্শন দেখে চমকে গেলেন এবং বলে ওঠলেন, ইসরাইলের বংশে নুবুওয়তের ধারা শেষ হয়ে গেছে। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! খোদার কসম! এই শিশুটির মাধ্যমে গোটা পৃথিবীতে তোমরা সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। তাঁর জীবনাদর্শ সমগ্র দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করবে।'[১]

এটি ইমাম ইয়াকুব ইবনে সুফ্য়ান (রহ.) হাসান স্তরের সনদে বর্ণনা করেছেন। *ফতহুল বারী*তে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।

নবী করীম ﷺ-এর জন্ম মুহূর্তে কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবল কম্পনের সৃষ্টি, এর চৌদ্দটা ইট খসে পড়া, রাজকীয় লেক শুকিয়ে যাওয়া এবং পারস্য অগ্নিশিখা নিভে যাওয়া—যে-অগ্নিশিখা হাজার বছর থেকে কেউ নেভায়নি। এ-ধরনের ঘটনাবলিও বেশ বিস্ময়কর। এ-প্রসঙ্গে আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন, এটি একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা।[২]

চৌদ্দটা ইট খসে পড়ার মধ্যে খসে পড়া ইটের সমপরিমাণ তারা এ সাম্রাজ্যে রাজত্ব করতে পারবে—এমন ইঙ্গিত নিহিত ছিলো। বাস্তবত (নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়) চার বছরে তাদের দশজন সম্রাট রাজত্ব করে এবং অন্যরা হযরত ওসমান (ইবনে আফ্ফান (রা.))-এর খিলাফত পর্যন্ত সময়ে ক্ষমতায় ছিলো।[৩] একথা *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়ায়* উল্লেখ রয়েছে।

---

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী*, খ. ৬, পৃ. ৫৮৩

[২] (ক) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১২৬–১২৭, হাদীস: ৬১; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ৮২; (গ) আল-খারায়িতী, *হাওয়াতিফুল জিনান*, পৃ. ৫৭, হাদীস: ১৪; (ঘ) ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৩৭, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ৪৪০৪; হানি ইবন হুরায়রা (রা.) বলেন,

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ- ارْتَجَسَ إِيوَانُ كِسْرَى، وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةً وَخَمَدَتْ نَارُ فَارِسَ، وَلَمْ تَخْمُدْ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَلْفِ عَامٍ، وَغَاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةَ.

'যে রাতটিতে আল্লাহর রাসুল ﷺ জন্মলাভ করেন ওই রাতে কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবল কম্পনের সৃষ্টি হয়, এর চৌদ্দটি ইট খসে পড়ে, পারস্য অগ্নিশিখা নিভে যাওয়া- যে অগ্নিশিখা হাজার বছর থেকে কেউ নেভায় নি এবং রাজকীয় লেক শুকিয়ে যাওয়া।'

[৩] ইবনে সাইয়িদুন নাস, *উয়ূন আল-আসার ফি ফুনুন আল-মাগাযি ওয়া আশ-শামায়িল ওয়া আস-সিয়ার*, খ. ১, পৃ: ৩৬

'এছাড়া আকাশের নিরাপত্তার জন্য শিহাব নামক অগ্নিগোলক মোতায়েন, শয়তানের আনাগোনার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া এবং ওঁৎপেতে উর্ধ্বজগতের বার্তা শোনার ক্ষেত্রে শয়তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘটনাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।'[১]

নবী করীম ﷺ বিশেষ অঙ্গব্যবচ্ছিন্ন তথা খতনাকৃত এবং ডিম্বক নাড়ি তথা নাভিকর্তিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কর্তৃক নবী করীম ﷺ থেকে[২] এবং হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে[৩] ইমাম ইবনে আসাকিরের নিকট বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও *আল-আওসাত* গ্রন্থে ইমাম আত-তাবারানী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম খতীব আল-বগদাদী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম ইবনে আসাকির রাহিমাহুল্লাহ একাধিক বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مِنْ كَرَامَتِيْ عَلَىٰ رَبِّيْ أَنِّيْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا، وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْءَتِيْ».

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, 'খতনাকৃত অবস্থায় আমি জন্মলাভ করেছি—এটি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে প্রদত্ত বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার একটি এবং কেউ আমার লজ্জাস্থান দেখেনি।[৪]

আল-মুখতারা গ্রন্থে গ্রন্থগার এটিকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫]

ইমাম আল-হাকিম রাহিমাহুল্লাহ *আল-মুস্তাদরিক* গ্রন্থে বলেছেন,

---

[১] আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮০–৮১

[২] ইবনে আসাকির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪১২, হাদীসঃ ৭৬১

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- وُلِدَ مَخْتُوْنًا.

'আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ খতনাকৃত অবস্থায় জন্মলাভ করেন।'

[৩] ইবনে আসাকির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪১৪, হাদীসঃ ৭৬৫

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا مَسْرُوْرًا.

'ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমি খতনাকৃত ও নাভিকর্তিত অবস্থায় জন্মলাভ করেছি।'

[৪] (ক) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৬, পৃ. ১৮৮, হাদীসঃ ৬১৪৮; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১৫৪, হাদীসঃ ৯১; (গ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারিখু বগদাদ*, খ. ২, পৃ. ১৭৯, হাদীসঃ ২৩২; (ঘ) ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৩, পৃ. ৪১৩, হাদীসঃ ৭৬২

[৫] যিয়াউদ্দিন আল-মাকদিসী, *আল-আহাদীসুল মুখতারা*, খ. ৫, পৃ. ২৩৩, হাদীসঃ ১৮৬৪

تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّهُ ﷺ وُلِدَ مَخْتُوْنًا.

'নবী করীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম খতনাকৃত অবস্থায় জন্ম নেওয়ার বিষয়ক বর্ণনাসমূহ ধারাবাহিক সূত্রপরম্পরা স্তরের।'[১]

তাওয়াওতুর বলতে তিনি হয়তো সিরাতগ্রন্থসমূহে এ-ধরনের বর্ণনার প্রসিদ্ধি ও আধিক্যের বিষয়টি বুঝিয়েছেন, এখানে মুহাদ্দিসগণের ব্যবহৃত সনদের বিশেষ পরিভাষাটি উদ্দেশ্য করেননি। কারণ অনেক মুহাদ্দিস এটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিষয়টিকে ইমাম ইবনে কাইয়িম (আল-জওযিয়া) বেশ স্পষ্ট করেছেন, 'এটি নবী করীম ﷺ-এর একক বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ অনেক মানুষই তো খতনাকৃত অবস্থায় জন্ম নেয়।'[২]

ইমাম ইবনে দুরায়দ-এর *আল-বিশাহ* গ্রন্থে এসেছে,

قَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: بَلَغَنَا أَنَّ آدَمَ خُلِقَ مَخْتُوْنًا، وَاثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا مِّنْ بَعْدِهِ

خُلِقُوْا مُخْتَتِنِيْنَ آخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ.

'হযরত ইবনুল কলবী বলেছেন, আমরা জনতে পেরেছি যে, হযরত আদম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে খতনাকৃত অবস্থায়। তাঁর পরবর্তীতে আরও ১২জন নবীকে খতনাকৃত অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে আর হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সেই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ জন।'[৩]

বলা হয়ে থাকে যে,

أَنَّهُ خَتَنَهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَصَنَعَ لَهُ مَأْدُبَةً، وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا.

'নবী করীম ﷺ-এর জন্মের সপ্তম দিন দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর খতনা করান এবং (আকীকা উপলক্ষ্যে) ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করেন আর 'মুহাম্মদ' নামকরণ করেন।'[৪]

কারো মতে

إِنَّ جِبْرِيْلَ خَتَنَهُ حِيْنَ طَهَّرَ قَلْبَهُ.

---

[১] আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬৫৭, হাদীস: ৪১৭৭

[২] ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, *তুহফাতুল মাওদুদ*, পৃ. ২০৪, হাদীস: ৪১৭৭

[৩] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮২

[৪] ইবনে আবদুল বার্‌র, *আত-তামহীদ*, খ. ২১, পৃ. ৬১ ও খ. ২৩, পৃ. ১৪০; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত

'নবী করীম -এর বক্ষবিদারণের সময় হযরত জিবরাইল তাঁর খতনা করিয়েছিলেন।'[১]

ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন, এই মতটি প্রত্যাখ্যাত।[২]

ফায়িদা

জেনে রাখুন! ছেলেদের পুরুষাঙ্গের মাথার অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলা এবং মেয়েদের যোনীপথের অগ্রভাগে বাহুল্য চামড়াটি কেটে নেয়াকে খতনা বলা হয়। ছেলেদের খতনাকে إِعْذَارٌ—বিন্দুবিহীন ع ও সবিন্দু ذ-সহকারে এবং মেয়েদের খতনাকে خِفَاضٌ—সবিন্দু خ, সবিন্দু ف ও ض-সহকারে—বলা হয়।

আলিমদের মাঝে খতনা ওয়াজিব কি সুন্নাত এ-বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আলিমদের মতে খতনা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক (ইবনে আনাস) ও কিছু ইমাম আশ-শাফিয়ী -এর অনুসারী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আশ-শাফিয়ী -এর মতে খতনা ওয়াজিব। মালিকী মতাবলম্বীদের দাবিও এমনটি। কিছু ইমাম আশ-শাফিয়ী -এর অনুসারীর মতে ছেলেদের খতনা ওয়াজিব এবং মেয়েদের সুন্নাত।[৩]

খতনাকে যারা সুন্নাত বলেন তাঁরা নিম্ন হাদীস দিয়ে দলিল দেন:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ».

'আবুল মালীহ ইবনে উসামা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ইরশাদ করেছেন, 'ছেলেদের খতনা সুন্নাত এবং মেয়েদের জন্য পছন্দনীয়।'

এটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল) তাঁর *মুসনদে*[৪] এবং ইমাম আল-বায়হাকী[১] বর্ণনা করেছেন।

---

[১] (ক) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৬, পৃ. ৭০, হাদীস: ৫৮২১; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১৫৫, হাদীস: ৯৩; হযরত আবু বাকারা আস-সাকাফী থেকে বর্ণিত

[২] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১, পৃ. ৩৭

[৩] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮৩

[৪] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৪, পৃ. ৩১৯, হাদীস: ২০৭১৯

এর জবাবে যারা ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা তারা বলেন, এখানে সুন্নাত শব্দটি ওয়াজিবের সাথে বিপরীত এমনটা উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে সুন্নাত বলতে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে। খতনা ওয়াজিব হবার সপক্ষে তারা আল্লাহ তাআলার এই ইরশাদ দ্বারা দলিল পেশ করেন:

أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۞

'ইবরাহীমের দীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন।'[২]

সহীহ আল-বুখারী ও *(সহীহ) মুসলিমের* হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ».

'হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, হযরত ইবরাহীম -এর আশি বছর বয়সে খতনা করিয়েছেন।'[৩]

ইমাম আবু দাউদ -কর্তৃক খতনা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে নবী করীম ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

«أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ».

'তোমার থেকে কুফরের চিহ্ন বিদূরিত করো এবং খতনা করো।'[৪]

এছাড়া ইমাম আল-কাফ্ফাল ও খতনা ওয়াজিব হওয়ার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, পুরুষাঙ্গের উপরি অংশের চামড়াটি রেখে দেওয়া হলে এর ভেতরে নাপাকির জটলা বাঁধবে। যার ফলে সালাত শুদ্ধ হয় না, তাই এটা কেটে ফেলতে হবে।

খতনা করার সময় নিয়ে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। খতনা ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাগণ বলেন, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক হলেই শরীয়া-বিধান প্রযোজ্য হয় তাই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেই খতনা ওয়াজিব।

---

[১] (ক) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুস সগীর*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ২৭১৭; (খ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৮, পৃ. ৫৬৩, হাদীস: ১৭৫৬৫, ১৭৫৬৬, ১৭৫৬৭ ও ১৭৫৬৮

[২] আল-কুরআন, *সুরা আন-নাহল*, ১৬:১২৩

[৩] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৪০, হাদীস: ৩৩৫৬ ও খ. ৮, পৃ. ৬৬, হাদীস: ৬২৯৮; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৯৩, হাদীস: ১৫১

[৪] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৪, পৃ. ১৬৩, হাদীস: ১৫৪৩২; হযরত কুলায়ব আল-জাহ্নী থেকে বর্ণিত

কোনো কোনো ইমাম আশ-শাফিয়ী -এর অনুসারী বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে সন্তান-সন্ততির খতনা করানো অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব।

যারা খতনাকে সুন্নাত বলেছেন তাদের অভিমত সুস্পষ্ট, প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই খতনা করার উপযুক্ত সময়। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হলে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ওয়াজিব, যা সুন্নাতের কারণে কোনোভাবেই পরিহার করা যাবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

নবী করীম -এর জন্মসাল নিয়ে বেশ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে আমুল ফিল'ই তাঁর জন্মসাল—এ-ব্যাপারে অধিকাংশ একমত। হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য ওলামা এ-বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এর বিপরীত সবগুলো মতই ধারণাপ্রসূত।

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, হস্তিবাহিনী ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর নবী করীম -এর জন্ম হয়েছে—ইমাম আস-সুহায়লী ও তাঁর অনুগামীরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২]

ইমাম আদ-দিময়াতী তাঁর *আখিরাইন* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ঘটনার ৫৫ দিন পর নবী করীম জন্মলাভ করেছেন।[৩]

অনুরূপভাবে তাঁর জন্মের মাস নিয়েও বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে, রবিউল আউওয়াল মাসেই তিনি ভূমিষ্ট হয়েছেন। ইমাম ইবনুল জওযী এ-ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণ একমত বলে দাবি করেছেন।[৪]

একইভাবে মাসের কোন দিনে তিনি জন্মলাভ করেছেন তা নিয়েও মতভিন্নতা রয়েছে। কারো কারো মতে, কোনো দিন-তারিখ নির্ধারিত নয়। তবে রবিউল আউওয়ালের কোনো এক সোমবারে নবী করীম জন্মলাভ করেছেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ওলামার মত হলো, তারিখটা সুনির্দিষ্ট, তবে কারো মতে ২ রবিউল আউওয়াল আর কারো মতে আটই রবিউল আউওয়াল নবী করীম জন্মলাভ করেছেন।

শায়খ কুতুবউদ্দীন আল-কাসতাল্লানী বলেছেন, অধিকাংশ মুহাদ্দিসও এ-ধরনের মত পোষণ করেন। ইবনে আব্বাস ও জুবায়র ইবনে

---

[১] আবরাহার হস্তিবাহিনী-কর্তৃক কাবা শরীফ আক্রান্ত হবার বছরকে আম আল-ফিল হস্তির বছর বলা হয়।

[২] আস-সুহায়লী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৯৮; সনটি ছিল ৫৭০ খ্রি.

[৩] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮৩-৮৪

[৪] ইবনুল জওযী, *তালকীহ ফুহুমি আহলিল আসর*, পৃ. ১৪

মুতয়িম থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। শায়খ আল-হামীদী ও তাঁর শায়খ ইবনে হাযমও এই মতকে সমর্থন করেছেন।

ইমাম আল-কুযায়ী *উনওয়ানুল ম'আরিফ* গ্রন্থে লিখেছেন, সকল সিরাত-বিশেষজ্ঞের ঐকমত্য রয়েছে এ-মতের ওপর।

ইমাম আয-যুহরী হযরত মুহাম্মদ ইবনে জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম বংশসূত্র ও আরব-ইতিহাসে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।[১]

কেউ কেউ বলেন, দশই রবিউল আউওয়াল নবী করীম ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন। আবার কারো মতে, বারই রবিউল আউওয়াল। এ-মতটি প্রসিদ্ধ। মক্কাবাসী এখনো এই তারিখে নবী করীম-এর জন্মের জায়গাটি পরিদর্শন করে থাকেন।[২]

ইমাম আত-তীবী বলেন, বারই রবিউল আউওয়ালই নবী করীম-এর জন্ম—এ-ব্যাপারে সর্বজন স্বীকৃত। ইমাম আত-তীবী-এর 'সর্বজন স্বীকৃত' এ-বক্তব্যে উপরে আমাদের আলোচিত বর্ণনাসমূহের কারণে কিছুটা মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[৩]

নবী করীম-এর জন্ম-মুহূর্ত নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো নবী করীম সোমবারে জন্মলাভ করেন।

عَنْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ. قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ فِيهِ النُّبُوَّةُ».

'হযরত কাতাদা আল-আনসারী থেকে বর্ণিত আছে, সোমবারের সিয়াম সম্পর্কে নবী করীম-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, 'এদিন আমার জন্ম এবং এই দিনই আমাকে নুবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে।''

এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[৪] এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো নবী করীম দিনেই জন্মলাভ করেছেন।

---

[১] আল-কাসৃতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮৪

[২] অবশ্য বর্তমান অবস্থা কিছুটা ভিন্ন

[৩] আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ৩৭১৩

[৪] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮১৯, হাদীস: ১৯৭, হাদীসটি হযরত কাতাদা থেকে নয়, বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু কাতাদা আল-আনসারী থেকে।

الْبَيْتِ بِثَلَاثِ خِصَالٍ نَعْرِفُهُ: فَقَدْ آتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْهَا: أَنَّهُ طَلَعَ نَجْمَهُ الْبَارِحَةَ، وَأَنَّهُ وُلِدَ الْيَوْمَ، وَأَنَّ اسْمَهُ مُحَمَّدٌ.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মার্‌রুয যাহরান এলাকায় একজন ধর্মগুরু বসবাস করতেন। তিনি সিরিয়া অধিবাসী ছিলেন, নাম ছিলো ইসা। তিনি প্রায় বলতেন, হে মক্কার অধিবাসীরা! তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির আগমন আসন্ন সমগ্র আরব যার আদর্শ অনুসরণ করবে এমনকি অনারব বিশ্বও তাঁর অনুসারী হবে, এখন তাঁর আগমনের সময়। তখনকার দিনে আরবে যেকোনো নবজাতকের জন্ম হলে লোকেরা সেই যাজকের কাছে সদ্যপ্রসূত শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। যেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমনের উষালগ্ন ঘনিয়ে এলো। সেদিন যথারীতি আবদুল মুত্তালিব বের হলেন, ইসার কাছে পৌঁছে তাঁকে আহ্বান করলেন। ইসা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং বললেন, তোমাকে স্বাগতম! তোমার বংশেই সেই শিশুটির জন্ম হয়েছে; সোমবারে যিনি জন্ম করবেন বলে আমি ইতঃপূর্ব ঘোষণা করেছিলাম। সোমবারেই তিনি নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হবেন এবং সোমবারেই তাঁর ইন্তিকাল হবে। আবদুল মুত্তালিব জানালেন, আজ রাত দিনের উষালগ্নে আমার ঘরে এক শিশুর জন্ম হয়েছে। ইসা জিজ্ঞেস করলেন, নবজাতকের কী নাম রেখেছেন? আবদুল মুত্তালিব বললেন, মুহাম্মদ। ইসা বললেন, আল্লাহর কসম! এই শিশুটির ব্যাপারে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিলো তিনি তোমাদের বংশে জন্ম নেবেন। তিনটি বৈশিষ্ট দ্বারা আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি: প্রথমত তাঁর জন্মের সিতারা গতকাল উদিত হয়েছে, দ্বিতীয়ত আজই তাঁর জন্ম হয়েছে এবং তৃতীয়ত তাঁর নাম রাখা হয়েছে মুহাম্মদ।'[১]

ইমাম আবু জাফর ইবনে আবু শায়বা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এটি বর্ণনা করেছেন। এক দুর্বল-সূত্রে ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি))ও তাঁর *দালায়িল* গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) غَفْرٌ উদয়ের সময় জন্মলাভ করেন। غَفْرٌ হলো তিনটি ছোট তারকাবিশেষ যাদের কাছাকাছি চাঁদ পরিভ্রমণ করে।

---

[১] ইবনে কসীর, *আস-সীরাতুন্নাবাবিয়া*, খ. ১, পৃ. ২২২

আর মুসনদে এসেছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وُلِدَ ﷺ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَرَفَعَ الْحَجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সোমবারেই নবী করীম ﷺ জন্মলাভ করেছেন, সোমবারেই তিনি নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন, সোমবারেই তিনি মক্কা থেকে মদীনার পথে হিজরত করেন, সোমবারেই হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপন করা হয়।'[১]

অনুরূপভাবে মক্কা-বিজয় ও সুরা আল-মায়িদা নাযিল—এসব ঘটনা সোমবারেই সংঘটিত হয়।

একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, দিনের উষালগ্নে নবী করীম ﷺ জন্মলাভ করেছিলেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ رَاهِبٌ يُسَمَّىٰ عِيصَىٰ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: يُوْشِكُ أَنْ يُوْلَدَ فِيْكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ! مَوْلُوْدٌ يَدِيْنُ لَهُ الْعَرَبُ وَيَمْلِكُ الْعَجَمُ، هَذَا زَمَانُهُ. فَكَانَ لَا يُوْلَدُ بِمَكَّةَ مَوْلُوْدٌ إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيْحَا الْيَوْمِ الَّذِيْ وُلِدَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتَّىٰ أَتَىٰ عِيصًا، فَنَادَىٰ: فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عِيصَىٰ: كُنْ أَبَاهُ، فَقَدْ وُلِدَ فِيْكُمْ ذَالِكَ الْمَوْلُوْدُ الَّذِيْ كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَمُوْتُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. قَالَ: وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ مَعَ الصُّبْحِ مَوْلُوْدٌ. قَالَ: فَمَا سَمَّيْتَهُ؟ قَالَ: مُحَمَّدًا. قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِيْ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا الْمَوْلُوْدَ فِيْكُمْ أَهْلَ

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ২৫০৬

সচরাচর নবীদের জন্ম এই মুহূর্তটিতেই হয়ে থাকে। সময়টি সৌরমাসের نَيْسَانَ মাস তথা বসন্তকাল ছিলো। আর তখন তার কুড়িটি দিন অতিবাহিত হচ্ছিলো।[১]

কেউ কেউ হযরত আয়িশা رضي الله عنها-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নবী করীম ﷺ-এর জন্ম রাতে বলেও দাবি করেছেন।[২]

শায়খ বদরুদ্দীন আয-যারকাশী رحمه الله বলেন, বিশুদ্ধ মতে নবী করীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম জন্ম হয়েছে দিনে। তিনি বলেন, (নবী করীম ﷺ-এর জন্মের সময়) তারকা-পতন[৩] বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে সেসব বর্ণনাকে ইমাম ইবনে দিহয়া رحمه الله দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।. কারণ এই প্রেক্ষাপটে তাঁর জন্ম রাতের বেলা হয়েছিলো বলেই প্রতীয়মান হয়। অতএব তারকা-পতনের অজুহাত সঠিক নয়। তিনি আরও বলেন, নুবুওয়াতের সময়কালে অলৌকিক ঘটনা একটি স্বাভাবিক বিষয় আর তার অংশ হিসেবে দিনের বেলা তারকা পতন হওয়া সম্ভব।[৪]

অধম বান্দা বলেন, এও সম্ভব যে, তারকা-পতন রাতেই হয়েছিলো আর নবী করীম ﷺ-এর জন্ম হয়েছে ভোরবেলা। ঐতিহাসিকদের বক্তব্যে নবী করীম ﷺ-এর জন্মের রাতে তারকা-পতন কিংবা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ এ-অতিরিক্তাংশের তাৎপর্য এটিই।

অতঃপর আমরা যদি বলি, নবী করীম ﷺ যে-রাতে জন্ম হয়েছেন সে-রাতটি নিশ্চয় কদরের রাতের চেয়েও অধিক তাৎপর্যম-িত। কেননা নবী করীম ﷺ-এর জন্মের রাতটি তাঁর আবির্ভাবের রাত আর কদরের রাত হচ্ছে তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত। যেটি মহাসত্তার আবির্ভাবের কারণে মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়েছে

---

[১] আল-কাসৃতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮৭

[২] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী*, খ. ৬, পৃ. ৫৮৩

[৩] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১১০–১১১, হাদীসঃ ৪৭; বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، أَنَّهَا شَهِدَتْ وِلَادَةَ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ- لَيْلَةَ وَلَدَتْهُ. قَالَتْ: فَمَا شَيْءٌ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي الْبَيْتِ إِلَّا نُوْرٌ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى النُّجُوْمِ تَدْنُوْ حَتَّى إِنِّي لَأَقُوْلُ: لَيَقَعْنَ عَلَيَّ.

'ওসমান ইবনু আবু আল-আস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার মাতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আমিনা বিনতে ওয়াহব-কর্তৃক আল্লাহর রাসূল ﷺ এর জন্মের রাতটি সাক্ষী। তিনি আরও বলেন, আমি ঘরের ভেতর যে দিকেই তাকাই শুধু নূরই দেখছিলাম আর নক্ষত্ররাজিকে দেখলাম ঢলে পড়ছে এমনকি আমি নিশ্চতভাবেই একথা বলতে পারি যে, নক্ষত্রগুলো আমার ওপর এসে পড়েছে।'

[৪] আল-কাসৃতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮৭–৮৮

সেটিই অধিক তাৎপর্যমণ্ডিত তাঁর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এ-কারণে যেটি মাহাত্মপূর্ণ হয়েছে তার চেয়ে।

আরও একটি কারণ হচ্ছে কদরের রাতটি মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়েছে ফেরেশতাদের অবতরণে, অন্যদিকে নবী করীম ﷺ-এর জন্মের রাতটি মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়েছে স্বয়ং তাঁর আগমনে।

আরও একটি কারণ হচ্ছে কদরের রাতের তাৎপর্য শুধু উম্মতে মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য আর নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র জন্মের তাৎপর্য সমগ্র অস্তিত্বের জন্য। নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর কারণেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলবাসী সকল সৃষ্টিকুলের ওপর সাধারণভাবে নিয়মাত দান করেছেন।[১]

নবী করীম ﷺ-এর দুগ্ধপানের আলোচনা

নবী করীম ﷺ-কে সুওয়ায়বা দুধ পান করিয়েছিলেন। তিনি আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছিলেন; আবু লাহাবকে নবী করীম ﷺ-এর জন্মলাভের সুসংবাদ শোনালে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আবু লাহাবের মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন আপনি? তিনি বললেন, জাহান্নামে আছি। তবে প্রতি সোমবার রাতে আমার ওপর শাস্তির মাত্রা হ্রাস করা হয়। আর এ-দুটো আঙ্গুলের মাথা থেকে পানি চোষতে পারি। নিজের দুইটি আঙ্গুলের মাথার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এই আঙ্গুলে আমি সুওয়ায়বাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম যখন তিনি আমাকে নবী করীম ﷺ-এর জন্মলাভের সুসংবাদটি দিয়েছিলেন এবং তাঁকে নিজের দুধ পান করিয়েছিলেন।[২]

---

[১] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮৮

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ৯, হাদীস: ৫১০১; বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ -ﷺ- فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ.

'ওরওয়া বলেন, আবু লাহাবের ক্রীতদাসী সুওয়ায়বা যাকে আবু লাহাব মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি নবীজি ﷺ কে দুধ পান করিয়েছিলেন। যখন আবু লাহাব মারা যান তখন তার পরিবারের কেউ কেউ তাকে ভয়াবহ অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কী অবস্থা? আবু লাহাব বললেন, আপনি ছাড়া আর কারো সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি, অবশ্য এই দুটোতে কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করি সুওয়ায়বাকে মুক্ত করার কারণে।'

ইমাম ইবনুল জাযারী বলেন, আবু লাহাব কাফির ছিলেন, তার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, এসব সত্ত্বেও যখন নবী করীম ﷺ-এর জন্মলাভের রাতটিতে আনন্দ প্রকাশ করার কারণে জাহান্নামে তাকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া হয়। তাহলে নবী করীম ﷺ-এর উম্মাত মুসলিমরা কী বিনিময় পেতে পারে যারা নবী করীম ﷺ-এর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নবী করীম ﷺ-এর ভালোবাসায় সাধ্যমত খরচ করে। আমার জীবনের শপথ! এর বিনিময় এই হতে পারে যে, দয়াময় আল্লাহ তাঁর ব্যাপক মায়ায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[১]

মুসলিমরা আবহমানকাল থেকে নবী করীম ﷺ-এর জন্মলাভের মাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি করে এসেছে। তারা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও করে থাকে। এ-মাসের রাতসমূহে তারা বিভিন্ন ধরনের দান-খয়রাত করে, আনন্দ উদ্‌যাপন করে, ভালো কাজ বেশি বেশি করে। তারা নবী করীম ﷺ-এর জন্ম উপলক্ষে কুরআনখানির ব্যবস্থাও করে। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর ব্যাপক বরকত নাযিল হয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, এর বিশেষত্ব হচ্ছে এতে মানুষ সারা বছর নিরাপত্তা লাভ করেন। মনোবাসনা ও মনোবাঞ্ছা দ্রুত পূরণের এক সুসংবাদ। অতএব নবী করীম ﷺ-এর শুভজন্মলাভের এ-মাসের রাতসমূহে যারা আনন্দ উদ্‌যাপন করেন আল্লাহ তাদের ওপর রহমত করেন। যাতে এটি যাদের অন্তরে বৈরি মনোভাব ও হঠকারিতা রয়েছে তাদের জন্য আরও কঠিন ঠেকে।

ইমাম ইবনুল হাজ তাঁর *মাদখাল* গ্রন্থে নবী করীম ﷺ-এর অনুষ্ঠানে নানা রকমের বিদআত, মনগড়া, অবৈধ বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে গান-বাজনাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।[২] আল্লাহ তাঁকে তাঁর বিশুদ্ধ নিয়তের সওয়াব দান করুন, আর আমাদেরকে সুন্নাতের পথে পরিচালিত করুন। কারণ তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা চমৎকার কামিয়াবিদানকারী।

নবী করীম ﷺ-কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন মহিয়সী হালিমা সাদিয়া। ইমাম আত-তাবরানী, ইমাম আল-বায়হাকী এবং ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী) প্রমুখের বর্ণনা মতে মহিয়সী হযরত হালিমা বলেন,

---

[১] আল-কাসৃতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮৭–৮৮

[২] বিস্তারিত দেখুন: ইবনুল হাজ, *আল-মাদখাল*, খ. ১, পৃ. ১–২৬

قَدِمْتُ مَكَّةَ فِي زَمْرَةٍ مِنْ بَنِيْ سَعْدٍ، نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ فِيْ سَنَةٍ شَهْبَاءَ، فَقَدِمْتُ عَلَىٰ أَتَانٍ لِّيْ وَمَعِيْ صَبِيٌّ، وَّشَارِفٌ لَّنَا لَا أَجِدُ فِيْ ثَدْيِيْ مَا يُغْنِيْهِ وَلَا فِيْ شَارِفِنَا مَا يُغْذِيْهِ. وَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنَّا امْرَأَةً إِلَّا وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَتَأْبَاهُ إِذَا قِيْلَ: أَنَّهُ يَتِيْمٌ، فَوَاللهِ مَا بَقِيَ مِنْ صَوَاحِبِيْ امْرَأَةٌ إِلَّا أَخَذَتْ رَضِيْعًا غَيْرِيْ، فَلَمَّا لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ قُلْتُ لِزَوْجِيْ: وَاللهِ! إِنِّيْ لَأُكْرِهُ أَنْ أَرْجِعَ مِنْ بَيْنِ صَوَاحِبِيْ لَيْسَ مَعِيْ رَضِيْعٌ لَأَنْطَلِقَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ الْيَتِيْمِ، فَلَآخُذَنَّهُ، فَذَهَبْتُ. فَإِذَا إِنَّهُ مُدْرَجٌ فِيْ ثَوْبٍ أَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ، يَفُوْحُ مِنْهُ الْمِسْكُ، وَتَحْتَهُ حَرِيْرَةٌ خَضْرَاءُ، رَاقِدٌ عَلَىٰ قَفَاهُ، يَغُطُّ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوْقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا، فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلَىٰ صَدْرِهِ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، يَنْظُرُ إِلَيَّ، فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُوْرٌ حَتَّىٰ دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ، وَأَنَا أَنْظُرُ، فَقبِلْتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَأَعْطَيْتُهُ ثَدْيَ الْأَيْمَنَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَحَوَّلْتُهُ إِلَى الْأَيْسَرِ فَأَبَىٰ، وَكَانَتْ تِلْكَ حَالَتُهُ بَعْدُ -قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَعْلَمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّ لَهُ شَرِيْكًا، فَأَلْهِمَهُ الْعَدْلَ- قَالَتْ: فَرَوَىٰ وَرَوَىٰ أَخُوْهُ.

ثُمَّ أَخَذْتُهُ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ جِئْتُ بِهِ رَحْلِيْ، وَقَامَ صَاحِبِيْ- تَعْنِيْ زَوْجَهَا- إِلَىٰ شَارِفِنَا تِلْكَ، فَإِذَا إِنَّهَا لَحَافِلٌ، فَحَلَبَ فَشَرِبَ، وَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيْنَا. وَبِتْنَا بِخَيْرٍ لَيْلَةٍ. قَالَتْ حَلِيْمَةُ: فَوَدَّعَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَّوَدَّعْتُ أَنَا أُمَّ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ رَكِبْتُ أَتَانِيْ، وَأَخَذْتُ مُحَمَّدًا بَيْنَ يَدَيْ ﷺ، قَالَتْ: فَنَظَرْتُ إِلَى الْأَتَانِ قَدْ سَجَدَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثًا،

وَرَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ مَشَتْ حَتَّىٰ سَبَقَتْ دَوَابَّ النَّاسِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعِيْ، فَتَعَجَّبْنَ مِنْهَا، وَيَقُلْنَ إِنَّ لَهَا لَشَأْنًا عَظِيْمًا.

قَالَتْ: ثُمَّ قَدِمْنَا مَنَازِلَ بَنِيْ سَعَدٍ، وَلَا أَعْلَمُ أَرْضًا مِّنْ أَرْضِ اللهِ أَجْدَبَ مِنْهَا، فَكَانَتْ غَنَمِيْ تَرُوْحُ عَلَيَّ حِيْنَ قَدِمْنَا بِهِ شِبَاعًا لُبَّنًا، نَحْلُبُ وَنَشْرُبُ، وَمَا يَحْلُبُ إِنْسَانٌ قَطْرَةَ لَبَنٍ، وَلَا يَجِدُهَا فِيْ ضَرْعٍ حَتَّىٰ كَانَ الْحَاضِرُوْنَ مِنْ قَوْمِنَا يَقُوْلُوْنَ لِرُعَاتِهِمْ: أَسْرِحُوْا حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِيْ غَنَمُ بِنْتِ أَبِيْ ذُوَيْبٍ، فَتَرُوْحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا، تَبِضُّ قَطْرَةَ لَبَنٍ، وَتَرُوْحُ أَغْنَامِيْ شِبَاعًا لُبَّنًا، وَلَمْ تَزَلْ حَلِيْمَةُ، تَتَعَرَّفُ الْخَيْرَ وَالسَّعَادَةَ، وَتَفُوْزُ مِنْهُ بِالْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً. شِعْرٌ:

لَقَدْ بَلَغَتْ فِي الْهَاشِمِيِّ حَلِيْمَةُ
مَقَامًا عَلَا فِيْ ذَرْوَةِ الْعِزِّ وَالْمَجْدِ
وَزَادَتْ مَوَاشِيْهَا وَأَخْصَبُ رَبْعُهَا
وَقَدْ عَمَّ هَذَا السَّعْدُ كُلَّ بَنِيْ سَعْدٍ

'বনু সাদের কাফেলায় শরিক হয়ে আমি যখন মক্কা গমন করি। মন্দার বছরটায় আমরা দুগ্ধপায়ী শিশুর সন্ধান করছিলাম। আমি আমার গর্ধভীর ওপর সওয়ার হয়ে এসেছিলাম, আমার সঙ্গে একটি শিশু ছিলো। আমাদের একটি বুড়ো উটও ছিলো, আমার স্তনে এতটুকু দুধ ছিলো যা দিয়ে শিশুটিকে পরিতৃপ্ত করে পান করানো যায়, না আমাদের সে-উটের এতটুকু দুধ ছিলো যা দিয়ে তার খাদ্যাভাব মেটানো যায়। আল্লাহর কসম! আমার জানা মতে আমাদের যে-মহিলার কাছেই হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেশ করা হতো যখন জানতো তিনি এতিম প্রত্যেকে তাঁকে নিতে অস্বীকার করতো। আল্লাহর কসম! আমি ছাড়া আমার বান্ধবীদের কোনো মহিলা আর অবশিষ্ট ছিলো না, হ্যাঁ সবাই একটি করে দুগ্ধপায়ী শিশু

সংগ্রহ করে ফেলেছে। অতঃপর যখন আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে পেলাম না সেজন্য আমি আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমার বান্ধবীদের মধ্যে আমারই কোনো দুগ্ধপায়ী শিশু ছিলো না, তো এভাবে ফিরতে আমার খারাপ লাগছিলো। তাই ওই এতিম শিশুটির কাছে যাই, নিশ্চয় আমি তাঁকে পাবো। অতঃপর আমি রওয়ানা হই। তখন তিনি দুধের চেয়ে পরিচ্ছন্ন পোষাকে আবৃত ছিলেন। তাঁর থেকে মিশকের সুরভি ছড়াচ্ছিলো। আর তাঁর নিচে ছিলো সবুজ রেশমি বিছানা। কাঁধের ওপর তিনি নিদ্রিত; বেশ গভীরভাবে। আমি তাঁর মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে এতোটা বিমোহিত হলাম যে, তাঁকে ঘুম থেকে জেগে ওঠাতে ইচ্ছে হলো। তাই আমি ধীরে ধীরে তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং তাঁর বুকে হাত রাখলাম। তিনি মুসকি হেসে চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ থেকে এমন এক আলো বিচ্ছুরিত হলো যা আকাশের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দিয়েছে—যা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করছিলাম। এটা দেখে আমি তাঁর দু'চোখের মধ্যখানে চুম্বন করলাম। এরপর আমি আমার ডান স্তন তাঁর কাছে পেশ করলাম। তিনি এর থেকে যতটুকু ইচ্ছে দুধ পান করলেন। অতঃপর আমি তাঁকে বামটায় ফেরালাম, তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন। এই ছিলো জন্মের পরের অবস্থা। আলিমগণ বলেন, মহান আল্লাহ তাঁকে একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আপনার একজন দুধভাই আছে, আপনি তার ব্যাপারে ইনসাফ অনুযায়ী চলুন। মহিয়সী হালিমা বলেন, তারপর তিনি এবং তাঁর দুধভাই পরিতৃপ্ত হয়ে দুধপান করলেন।

এরপর আমি তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করি এবং তাঁকে আমার বাড়ি নিয়ে আসি। এদিকে আমার সহধর্মী—তথা স্বামী—লক্ষ করলেন, আমাদের সেই বৃদ্ধ উটনীটির স্তন দুধে ভরে উঠেছে। তখন তিনি দোহন করে পান করেন এবং আমিও পরিতৃপ্তি-সহকারে পান করি। ওই রাতটি আমরা ভালোভাবে অতিবাহিত করেছি। মহিয়সী হালিমা বলেন, লোকজন এক অপর থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে লাগলো। আমিও নবী করীম ﷺ-এর মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার গাধার ওপর সওয়ার হই। নবী করীম ﷺ-কে আমার দু'হাতের মাঝে ধরে রাখি। আমি লক্ষ করলাম, আমার গাধাটি কাবার দিকে ফিরে তিনতিনটি সাজদা করলো এবং তার মাথাটি আকাশে দিকে উঁচু করলো। এরপর সে চলতে শুরু করলো। একপর্যায়ে আমার আগে রওয়ানা হওয়া সব সওয়ারীকে পেছনে

ফেলে সে এগিয়ে যায়। এতে তারা বিস্ময়াকুল কণ্ঠে বলতে লাগলো, নিঃসন্দেহে এই শিশুটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

মহিয়সী হালিমা বলেন, এরপর আমরা বনু সাদের যার যার বাড়িতে পৌছুলাম। আল্লাহর জমিনে এরচেয়ে বেশি দুর্ভিক্ষকবলিত অঞ্চল আরেকটা আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে নবী করীম ﷺ-কে আনার পর থেকে আমার ছাগলগুলো আমাদের প্রচুর পরিমাণে দুধ দিতে লাগলো। আমরা দোহন করে পান করতে থাকি। অথচ অন্যান্য লোকেরা দুধের এককোঁটাও দোহন করতো না এবং স্তনেও না কোনো দুধ পাওয়া যেতো। এতে আমাদের গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের বললো, যেখানে আবু যুআয়বের ছাগলগুলো বিচরণ করে সেখানে চরাও। এতেও তাদের ছাগলগুলো আরও দুধশূন্য হয়ে পড়ে এবং কোঁটা দুধও হ্রাস পায়। অন্যদিকে আমার ছাগলগুলো প্রচুর পরিমাণে দুধ দিতে থাকে। মহিয়সী হালিমা এভাবে সর্বদা কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দেখা পেতে থাকেন এবং প্রাচুর্য ও বরকত দ্বারা লাভবান হতে থাকেন। কবিতা:

لَقَدْ بَلَغَتْ فِي الْهَاشِمِيِّ حَلِيْمَةُ

مَقَامًا عَلَا فِيْ ذَرْوَةِ الْعِزِّ وَالْمَجْدِ

وَزَادَتْ مَوَاشِيْهَا وَأَخْصَبُ رَبْعُهَا

وَقَدْ عَمَّ هَذَا السَّعْدُ كُلَّ بَنِيْ سَعْدِ

হাশিমী গোত্রে হালিমা সর্বোচ্চ স্তরের সম্মান ও মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। তাঁর আয়-রোজগারে প্রাচুর্যের ঢল নেমেছে। তাঁর উষ্ট্রীগুলো প্রচুর দুগ্ধবতী হয়ে উঠেছে এবং বনু সাদের সবাইকে তিনি মর্যাদায় অতিক্রম করে গেছেন।'[১]

ইবনুল জাররাহ (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল মুআল্লা আল-আযদী (রহ.)-এর গ্রন্থ *আত-তারকীসে* দেখেছি হযরত হালিমা

[১] এ-পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি একমাত্র *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়ায়* পাওয়া যায়। তবে শব্দের বিভিন্নতা-সহকারে ও বিক্ষিপ্তভাবে অন্যরাও অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন তাঁদের গ্রন্থসমূহে। বিস্তারিত দেখুন: (ক) আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯০–৯২; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২৪, পৃ. ২১৪, হাদীস: ৫৪৫; (গ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১৩২, হাদীস: ৬৩; (ঘ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১৫৫–১৫৬, হাদীস: ৯৪, হযরত হালিমা বিনতুল হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত

(রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর একটি কবিতা যেটি দিয়ে নবী করীম ﷺ-কে ঘুমপাড়ানি দেওয়া হতো।

يَا رَبِّ إِذْ أَعْطَيْتَهُ فَابْقِهِ

وَأَعْلِهِ إِلَى الْعُلَا وَارْقِهِ

وَأَدْحِضْ أَبَاطِيْلَ الْعِدَى بِحَقِّهِ

"হে প্রভু! তুমি যখন তাঁকে আমায় দান করেছো তাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখো। তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করো এবং সম্মান দান করো। তাঁর মাধ্যমে অসত্যের পূজারি শত্রুদের অপদমন করো।"

নবী করীম ﷺ-এর দুধবোন শায়মা তাঁকে কোলে নিতো, খাওয়াতো এবং বলতো:

هَـذَا أَخٌ لِّيْ لَـمْ تَلِـدْهُ أُمِّـيْ

وَلَـيْسَ مِـنْ نَـسْلِ أَبِيْ وَعَمِّـيْ

فَدَيْتُـهُ مِـنْ مُخْـوِلٍ مُعِمِّـيْ

فَأَنْمِـهُ اللّٰهُـمَّ فِـيْمَا تُنْمِـيْ

"এ আমার এমন ভাই, যে আমার মায়ের উদরজাত নয় আমার পিতা ও চাচার ঔরস থেকেও নয়; তবুও আমি আমার মামা ও চাচাকে তাঁর সম্মানে উৎসর্গ করি। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে প্রতিপালন করুন ঠিক যেভাবে আপনি প্রতিপালন করেন।"[১]

ইমাম আল-বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ), ইমাম আস-সাবুনী (রহিমাহুল্লাহ), ইমাম খতীব আল-বগদাদী (রহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম ইবনে আসাকির (রহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ বর্ণনা করেন,

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! دَعَانِيْ لِلدُّخُوْلِ فِيْ دِيْنِكَ أَمَارَةٌ لِنُبُوَّتِكَ، رَأَيْتُكَ فِي الْـمَهْدِ تُنَاغِي الْقَمَرَ،

---

[১] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯২

وَتُشِيْرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ، فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ، قَالَ: «إِنِّيْ كُنْتُ أُحَدِّثُهُ، وَيُحَدِّثُنِيْ، وَيُلْهِيْنِيْ عَنِ الْبُكَاءِ، وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ».

'হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দীন গ্রহণে আপনার নুবুওয়তের নিদর্শনাবলি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে; আপনি দোলনায় দোলার সময় আমি লক্ষ করতাম আপনি চাঁদের সাথে কথা বলতেন, আপনি আপনার অঙ্গুলি দিয়ে যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকে সরে যেতো! নবী করীম (সা.) বললেন, 'হাঁ, আমি তার সাথে কথা বলতাম এবং সেও আমার সাথে কথা বলতো আর সে আমাকে কান্না থেকে ভুলিয়ে রাখতো। সে যখন আরশের নিচে সাজদাবনত হতো আমি তার আওয়াজ শুনতাম।"[১]

ইমাম আস-সাবুনী (রহ.) বলেন, 'এ-হাদীস দুর্লভ সনদের, তবে বক্তব্য মুজিযার অন্তর্ভুক্ত যা হাসান।'[২]

لَاطَفَتْهُ = نَاغَتِ الْأُمُّ صَبِيَّهَا। (আদরভরা ডাক) اَلْـمُحَادَثَةُ অর্থ اَلْـمُنَاغَاةُ

وَشَاغَلَتْهُ بِالْـمُحَادَثَةِ وَالْـمُلَاعَبَةِ মা তার বাচ্চার প্রতি সদয় হয়েছেন এবং খেলাধুলায় লাগিয়ে দিয়েছেন।[৩]

ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.) ও ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.) বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: كَانَتْ حَلِيْمَةُ تُحَدِّثُ: أَنَّهَا أَوَّلُ مَا فَطَمَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَكَلَّمَ، فَقَالَ: «اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَّالْـحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا، وَّسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا»، فَلَمَّا تَرَعْرَعَ كَانَ يَخْرُجُ، وَيَنْظُرُ إِلَى الصِّبْيَانِ يَلْعَبُوْنَ، فَيَتَجَنَّبُهُمْ.

---

[১] (ক) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ২, পৃ. ৫১, হাদীস: ৩৯৯; (খ) আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৩; (গ) ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৪, পৃ. ৩৫৯, হাদীস: ৩০০৯

[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৩

[৩] ইবনে মনযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ১৫, পৃ. ৩৩৬

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস বলেন, মহিসয়ী হালিমা বলতেন, যখন তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ-কে দুধ ছাড়িয়ে ছিলেন তখন প্রথম তাঁর মুখ ফুটে ছিলো এই বলে:

«اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا».

'আল্লাহ মহান, সর্বাধিক প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা করছি।'

যখন তিনি একটু বড়ো হলেন তখন বাইরে যেতে লাগলেন আর খেলাধুলায় মশগুল শিশুদের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তবে তাঁদের এড়িয়ে চলতেন তিনি।'[১] আল-হাদীস।

وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ حَلِيْمَةُ لَا تَدَعُهُ يَذْهَبُ مَكَانًا بَعِيْدًا، فَغَافَلَتْ عَنْهُ يَوْمًا، فَخَرَجَ مَعَ أُخْتِهِ الشَّيْمَاءَ فِي الظَّهِيْرَةِ إِلَى الْبَهْمِ، فَخَرَجَتْ حَلِيْمَةُ تَطْلُبُهُ حَتّٰى تَجِدَهُ مَعَ أُخْتِهِ، فَقَالَتْ: فِيْ هٰذَا الْحَرَّةِ؟ فَقَالَتْ أُخْتُهُ: يَا أُمَّهُ! مَا وَجَدَ أَخِيْ حَرًّا رَأَيْتُ غَمَامَةً تَظِلُّ عَلَيْهِ، إِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ، وَإِذَا سَارَ سَارَتْ، حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى هٰذَا الْمَوْضِعِ.

'তাঁর থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি দূরে কোথাও যেতে পারেন আশঙ্কায় মহিয়সী হালিমা কখনো তাঁকে একা ছাড়তেন না। একদিন তিনি তাঁর থেকে কিছুটা বেখবর ছিলেন। ওই সময় তিনি তাঁর দুধবোন শায়মার সাথে চারণভূমির দিকে চলে গিয়েছিলেন। মহিয়সী হালিমা তাঁকে খুঁজতে বেরুলেন এবং তাঁকে বোনের সাথে পেয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, এমন প্রখর রৌদ্রতাপে বেরিয়ে পড়েছো? শায়মা বললো, আম্মু গো! আমার ভাই রোদে তো মোটেও ছুঁতে পারে নি; আমি দেখলাম একখ- মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। তিনি দাঁড়ালে তাও স্থির দাঁড়িয়ে যায় আর তিনি হেঁটে চললে তাও হাঁটতে শুরু করে। অবশেষে তা এ পর্যন্ত এসেছে।'[২]

---

[১] ইবনে আসাকির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৬০, হাদীস: ৩০১০

[২] (ক) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১৪০, হাদীস: ৪৬; (খ) ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৩, পৃ. ৪৭৪, হাদীস: ২০৪৫

وَكَانَ ﷺ يَشِبُّ شَبَابًا لَا يَشِبُّهُ الْغِلْمَانِ. قَالَتْ حَلِيْمَةُ: فَلَمَّا فَصَلْتُهُ، فَقَدِمْنَا بِهِ عَلَىٰ أُمِّهِ، وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَىٰ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، لِمَا نَرَىٰ مِنْ بَرَكَتِهِ، فَكَلَّمْنَا أُمَّهُ، وَقُلْنَا: لَوْ تَرَكْتِيْهِ عِنْدَنَا حَتَّىٰ يَغْلِظَ، فَإِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةَ، وَلَمْ نَزَلْ بِهَا حَتَّىٰ رَدَّتْهُ مَعَنَا، فَرَجَعْنَا بِهِ.

فَوَاللهِ! إِنَّهُ بَعْدَ مَقْدِمِنَا بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَعَ أَخِيْهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَفِيْ بَهْمٍ لَنَا خَلْفَ بُيُوْتِنَا، إِذْ جَاءَ أَخُوهُ يَشْتَدُّ، فَقَالَ ذَاكَ أَخِي الْقُرَشِيُّ: وَقَدْ جَاءَ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ.

'নবী করীম ﷺ দ্রুত বেড়ে উঠছিলেন যেরকম অন্যান্য সাধারণ শিশুরা বেড়ে ওঠে না। মহিয়সী হালিমা رضي الله عنها বলেন, তিনি যখন দুধ ছাড়লেন তখন আমি তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। তবে আমার মন চাইছিল আরও কিছুদিন তাঁকে আমার কাছে রাখতে। কেননা আমি তাঁর অগুণিত বরকত দেখতে পেতাম। তাই তাঁর মায়ের সাথে কথা বলি। আমি বলি যে, যদি তাঁকে আমার কাছে রেখে দিন এতে তিনি আরও নাদুস-নুদুস হয়ে উঠবেন। আমি আশঙ্কা করছিলাম মক্কার বিভিন্ন রোগবালাই তাঁকে পেয়ে বসে কি না। আমার পীড়াপীড়িতে তিনি তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে ফিরে এলাম আমি।

আল্লাহর কসম! তাঁকে পুনরায় নিয়ে আসার মাস দুই বা তিনেক পর তাঁর দুধ ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়ির পেছনের চারণভূমিতে ছিলেন। এমন সময়ে দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁর ভাই এসে বললো, কী হয়ে গেলো আমার কুরায়শি ভাইয়ের? তাঁর কাছে সাদা পোষাকধারী দু'জন লোক এসেছেন।[১] আল-হাদীস।

---

[১] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৩৯৭, হাদীস: ৩৭৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

فَانْطَلَقْنَا نَرُدُّهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ بِهِ مَا نَتَخَوَّفُ حَتَّىٰ قَدِمْنَا بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ وَأَخْبَرْنَاهَا بِشَأْنِهِ، فَقَالَتْ: أَخَشِيتُمَا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ؟ فَلَا وَاللهِ! مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَإِنَّهُ لَكَائِنٌ لِابْنِي هَذَا الشَّأْنُ.

'অতঃপর আমি তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে ফেরত নিয়ে গেলাম, বিষয়টি তাঁদের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার আগে যা আমার আশঙ্কার কারণ ছিলো। তাই আমি তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম এবং পুরো ঘটনা তাঁকে খুলে বললাম। এতে তিনি বললেন, তুমি বোধ হয় আশঙ্কা করছো তাঁর ওপর কোনো শয়তানের মন্দ প্রভাব পড়ে কি-না? না, আল্লাহর কসম! শয়তানের তাঁর ওপর খারাপ প্রভাব ফেলার কোনো পথ নেই। বস্তুত আমার সন্তানের অবস্থা এমনটি হবে।'[১]

ফায়িদা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর চার চারবার পবিত্র বক্ষ বিদারণ করে তাঁর পুত-পবিত্র হৃদপি- ধোয়া হয়েছে:

১. ছোটকালে; বনু সাদের মহিয়সী হালিমা رضي الله عنها-এর চারণভূমিতে।

২. দশ বছরের বয়সকালে; হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

«هُوَ إِنَّ ذَلِكَ أَوَّلُ مَا ابْتُدِئْتُ بِهِ مِنْ أَمْرِ النُّبُوَّةِ وَكَانَ فِي الصَّحْرَاءِ».

'সে-সময়টি হলো আমার নুবুওয়াতের প্রথম ধাপ, তখন তিনি মরুভূমিতে ছিলেন।'[২]

৩. নুবুওয়াত লাভের সময়;

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا هُوَ وَخَدِيجَةُ، فَوَافَقَ ذَلِكَ شَهْرَ رَمَضَانَ، -وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّهُ كَانَ فِي غَارِ حِرَاءَ-، فَخَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَسَمِعَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ. قَالَ: «وَظَنَنْتُهَا فَجْأَةَ الْجِنِّ، فَجِئْتُ مُسْرِعًا حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ، فَقَالَتْ: مَا

---

[১] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১৩২, হাদীস: ৬৩

[২] আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ২২০, হাদীস: ১৬৬, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

شَأْنُكَ؟ فَأَخْبَرْتُهَا، فَقَالَتْ: أَبْشِرْ بِأَنَّ السَّلَامَ خَيْرٌ». قَالَ: «ثُمَّ خَرَجْتُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَإِنَّا بِجِبْرِيلَ عَلَى الشَّمْسِ جُنَاحٌ لَهُ بِالْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ».

'নবী করীম ﷺ ও বিবি খদীযা রাদিয়াল্লাহু আনহা মাসব্যাপী ইতিকাফ থাকার মান্নত করে ছিলেন। সময়টি রামাযান মাসের সাথে মিলে যায়। —কতিপয় কিতাব থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তখন হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন—। একরাতে বেরুলেন, তখন আস-সালামু আলায়কা সম্ভাষণ শুনতে পেলেন। নবী করীম ﷺ বলেন, 'আমি ভাবলাম এটি হয়তো কোনো জিনের আওয়াজ হতে পারে। আমি দ্রুত হেঁটে হযরত খদীযা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে চলে এলাম। হযরত খদীযা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, কী অবস্থা আপনার? আমি তাঁকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, সুসংবাদ! সালাম তো কল্যাণবহ কথা।' নবী করীম ﷺ আরও বলেন, তারপর পুনরায় আমি বেরিয়ে পড়ি। আমি দেখতে পেলাম জিবরাইল সূর্যের ওপর আরোহিত; তাঁর একটি ডানা পশ্চিমে আর অন্য ডানাটি পূর্বদিগন্তে।'[১]

৪. আল-ইসরা রাতে।

পঞ্চমবারের কথা আছে, তবে তার কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা বিষয়টি বিশ্লষণে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও লিখেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এ অধ্যায়ে বর্ণিত একাধিক হাদীসসমূহে অনেক ঘটনা রয়েছে, নবী করীম ﷺ-এর হৃদপি-কে স্বর্ণের তশতরীতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা ধোয়া হয়েছে।[২]

---

[১] আল-হারিস ইবনে আবু উসামা, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৮৬৭, হাদীস: ৯২৮; হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৭৪, হাদীস: ২৬১: বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَتَاهُ جِبْرِيلُ - ﷺ - وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ -

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যমযমের পানি জান্নাতের পানির তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান ও পবিত্র। অন্যথায় জান্নাতের পানি দ্বারাই ধোয়া হতো।

এখন একটি প্রশ্ন ওঠে তশতরিতে করে নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র হৃদপি- ধোয়া হয়েছে বিষয়টি কি কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য, না সকল নবী-এর ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে? এর জবাবে বলা যায়, তাবুত ও সকীনা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, সকীনা হলো যে-তশতরিতে নবীদের হৃদপি- ধোয়া হয়।[১]

ইমাম আত-তাবারী এমনটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইমাদউদ্দীন ইবনে কসীর ও তাঁর তাফসীরে আবু মালিক হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস-সূত্রে ইমাম আস-সুদ্দী-এর বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া* গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[২]

فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ "، قَالَ أَنَسٌ: «وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ».

'আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত, একদিন জিব্রিল আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট আসলেন। এ সময় তিনি শিশুদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। তিনি তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। অতঃপর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ড বের করে নিলেন। তারপর তা থেকে একটি রক্তপিণ্ড বের করে বললেন, এটি ছিলো তোমার মধ্যে শয়তানের অংশ। অতঃপর তা একটি সোনার তশতরিতে রেখে যমযমের পানিতে ধুয়ে নিলেন। এরপর তা যথাস্থানে রেখে সেলাই করে দিলেন। এদিকে অন্যান্য শিশুরা দৌড়ে গিয়ে তাঁর দুধ মার কাছে গিয়ে বলল, মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে। সবাই দৌড়ে এসে দেখলো, তিনি বিষন্ন অবস্থায় বসে আছেন। আনাস বলেন, আমি তাঁর বুকে সেই সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।

[১] (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান*, খ. ৫, পৃ. ৩২৮, হাদীস: ৫৬৭৯; (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১, পৃ. ৫০৭, হাদীস: ৩০১০; বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ السُّدِّيِّ ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة ٢٤٨]، السَّكِينَةُ: طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ يُغْسَلُ فِيهَا قُلُوبُ الْأَنْبِيَاءِ، أَعْطَاهَا اللهُ مُوسَى، وَفِيهَا وَضَعَ الْأَلْوَاحَ، وَكَانَتِ الْأَلْوَاحُ فِيمَا بَلَغَنَا مِنْ دُرٍّ، وَيَاقُوتٍ، وَزَبَرْجَدٍ.

সুদ্দি থেকে বর্ণিত, 'তাতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সকীনা নাযিল হয়।' [সূরা আল-বাকারা ২:২৪৮] সকিনা হলো স্বর্ণের তশতরি যেখানে নবীদের হৃদপিণ্ড ধোয়া হয়। আল্লাহ মূসা কে এটি দান করেছিলেন। এতে কিছু ফলক রয়েছে আর ফলকসমূহে রয়েছে ঝলমলে বাতি, নীলকান্ত মণি ও পান্না পাথর'।

[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৫

নবী করীম ﷺ-এর বয়স যখন ৪ বছর হয়, কারো মতে ৫, কারো মতে ৬, কারো মতে ৭, কারো মতে ৯, কারো মতে ১২ বছর ১ মাস ১০ দিন বয়সে আবওয়া[১] মতান্তরে হাজুনে[২] তাঁর মাতা ইহলোক গমন করেন।

আল-কামূসে বলা হয়েছে, 'মক্কার দার নাবিগায় নবী করীম ﷺ-এর মাতা আমিনা সমাধিস্থ হন।'[৩]

ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَـمَّا ﷺ بَلَغَ سِتَّ سِنِيْنَ خَرَجَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَىٰ أَخْوَالِهِ بَنِيْ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بِالْـمَدِيْنَةِ تَزُوْرُهُمْ بِهِ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِهِ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَتْ بِالْأَبْوَاءِ تُوُفِّيَتْ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর বয়স যখন ৬ বছর মাতা আমিনা তাঁকে নিয়ে আদী ইবনুন নাজ্জার গোত্রে তাঁর মামাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনা গিয়েছিলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ-সহ তিনি পবিত্র মক্কায় ফিরে আসছিলেন, যখন আবওয়া পৌঁছুলেন তখন তিনি ইন্তিকাল করেন।'[৪]

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আমিনা (আ.) ওফাতের পর নবী করীম ﷺ-এর ওপর ঈমান এনেছেন। এ-ব্যাপারে ইমাম আত-তাবারী (রহ.) নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন যে,

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ الْـحَجُوْنَ كَئِيْبًا حَزِيْنًا، فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُوْرًا، قَالَ: «سَأَلْتُ رَبِّيْ ، فَأَحْيَا لِيْ أُمِّيْ، فَآمَنَتْ بِيْ، ثُمَّ رَدَّهَا».

'হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম ﷺ আল-হাজুন এলাকায় পৌঁছুলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন। অতঃপর সেখানে তিনি আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছায় কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। যখন ফিরলেন তখন তিনি উৎফুল্ল ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি আমার প্রভু ﷻ-এর কাছে প্রার্থনা করেছি। এতে আল্লাহ

---

[১] আল-আবওয়া: পবিত্র মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চল। এখানে নবী করীম ﷺ-এর মাতা ৪৫ হিজরীপূর্ব = ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইহলোক গমন করেন।

[২] আল-হাজুন: পবিত্র মক্কার পাহাড়ি এলাকা-বিশেষ।

[৩] আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, পৃ. ১২৩–১২৪

[৪] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৪–৯৫, হাদীস: ২৪৫

আমার মাতাকে জীবিত করে দেন। অতঃপর তিনি আমার ওপর ঈমান আনেন আর এরপরই তাঁকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়।"[১]

ইমাম আবু হাফস ইবনে শাহীন (রহ.) তাঁর *আন-নাসিখ ওয়াল মানসূখ* গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২] একইভাবে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে নবী করীম ﷺ-এর মাতা-পিতা জীবিত হয়ে তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন মর্মেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আস-সুহায়লী (রহ.) এমনটি বর্ণনা করেছেন।[৩] ইমাম খতীব আল-বগদাদী (রহ.)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৪] ইমাম আস-সুহায়লী (রহ.) বলেছেন, এর কতিপয় বর্ণনাকারী অজ্ঞাত রয়েছেন।[৫]

ইমাম ইবনে কসীর (রহ.) বলেছেন, এটি অবশ্যই মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) এবং এর কতিপয় বর্ণনাকারী অজ্ঞাত।[৬]

অনেক আলিম নবী করীম ﷺ-এর মাতা-পিতা উভয়ই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং তাঁরা জাহান্নামি হতে পারেন না বলে নিশ্চিত করেছেন। নবীজির পবিত্রাত্ম মাতা-পিতা সম্পর্কে আরও অনেক কথা রয়েছে, সতর্কতা হলো এ-ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা।

হাফিয শামসুদ্দীন ইবনে নাসিরউদ্দীন আদ-দিমাশকী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বেশ চমৎকার বলেছেন, কবিতা:

عَلَىٰ فَضْلٍ وَّكَانَ بِهِ رَؤُوْفًا	*	حَبَا اللهُ النَّبِيَّ مَزِيْدَ فَضْلٍ
لِإِيْمَانٍ بِهِ فَضْلًا لَطِيْفًا	*	فَأَحْيَا أُمَّهُ وَكَذَا أَبَاهُ
وَإِنْ كَانَ الْحَدِيْثُ بِهِ ضَعِيْفًا	*	فَسَلِّمْ فَالْقَدِيْمُ بِذَا قَدِيْرٌ

---

[১] মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, *খুলাসাতু সিয়ারি সাইয়িদিল বাশার*, পৃ. ২২

[২] ইবনে শাহীন, *নাসিখুল হাদীস ওয়াল মনসূখাহ*, পৃ. ৪৮৯-৪৯০, হাদীস: ৬৫৬

[৩] আস-সুহায়লী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১২১

[৪] আল-খতীবুল বগদাদী, *আস-সাবিক ওয়াল লাহিক*, পৃ. ৩৪৪

[৫] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১০৩

[৬] (ক) ইবনে কসীর, *আস-সীরাতুন্নাবাবিয়া*, খ. ১, পৃ. ২৩৯; (খ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ৩৪৩

عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ- سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُحْيِيَ أَبَوَيْهِ، فَأَحْيَاهُمَا وَآمَنَا بِهِ.

'আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল ﷺ স্বীয় প্রভুর কাছে তাঁর পিতা-মাতার জীবিত করে দেওয়ার প্রার্থনা করেন। এতে আল্লাহ তাঁদেরকে জীবিত করে দেন আর তাঁরা নবীজির ওপর ঈমান আনেন।'

'আল্লাহ নবী করীম ﷺ-কে মর্যাদার ওপর মর্যাদা দান করেছেন। তিনি তাঁর সাথে বিশেষ অনুগ্রহবান ছিলেন। অতএব তিনি দয়া ও মায়াবশত তাঁর মাতা-পিতাকে তাঁর ওপর ঈমান আনার জন্যে জীবিত করেন। সুতরাং বিষয়টি স্বীকার করে নাও, কেননা অবিনশ্বর সত্তা এ-বিষয়ে অবশ্যই সমর্থ। যদিও এ-সম্পর্কিত হাদীসটি দুর্বল।'[১]

অবশ্যই অনেক আলিম তাঁদের ঈমান আনয়ন প্রমাণে সবিস্তৃত আলোকপাত করেছেন, আল্লাহ তাঁদের ভালো সুবাসনার জন্য জান্নাত নসিব করুন।

তবে খবরদার! তাঁদের আলোচনা প্রসঙ্গে ধৃষ্টতামূলক মন্তব্য থেকে সর্তক থাকতে হবে। নিশ্চয় এতে স্বয়ং নবী করীম ﷺ-কে আঘাত করা হয়। যেহেতু সমাজের প্রচলিত আছে যে, কারো পিতা-মাতা সম্পর্কে কটূক্তি করা হলে কিংবা চরিত্রে কালিমা লেপন করা হলে তবে এ-ধরনের কথাবার্তায় তাদের সন্তানরা উপস্থিত থাকলে মনে দুঃখ পায়। এই মর্মে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«لَا تُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ بِسَبِّ الْأَمْوَاتِ».

'মৃত লোককে মন্দ বলে তার জীবিত আত্মীয়দের মনে ব্যথা দিও না।'[২]

এ-প্রসঙ্গে ইমাম আস-সুয়ুতী রহ.-এর প্রমাণ্য অনেক পুস্তক রয়েছে। প্রয়োজনে সেসব দেখা যেতে পারে।

অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর অভিভাবক দাদা আবদুল মুত্তালিব ১২০ মতান্তরে ১৪০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আবু তালিব তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন—যাঁর নাম ছিলো আবদ মুনাফ। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে এ-ব্যাপারে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি আবদুল্লাহর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।[৩]

ইমাম ইবনে আসাকির রহ. বর্ণনা করেন,

عَنْ حَلِيْمَةَ، عَنْ عُرْفُطَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَهُمْ فِيْ قَحْطٍ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: يَا أَبَا طَالِبٍ! أَقْحَطَ الْوَادِيْ وَأَجْدَبَ الْعِيَالُ؛ فَهَلُمَّ فَاسْتَسْقِ،

---

[১] ইবনে নাসিরউদ্দীন, *মাওরিদুস সাদী কী মাওলিদিল হাদী*, সূত্র: আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ১, পৃ. ৩৪৮

[২] হান্নাদ ইবনুস সারী, *আয-যুহদ*, খ. ২, পৃ. ৫৬১

[৩] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১২

فَخَرَجَ أَبُوْ طَالِبٍ وَّمَعَهُ غُلَامٌ كَأَنَّهُ شَمْسُ دَجْنٍ تَجَلَّتْ عَنْهُ سَحَابَةٌ وَّحَوْلَهُ أُغَيْلِمَةٌ، فَأَخَذَهُ أَبُوْ طَالِبٍ، فَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِالْكَعْبَةِ وَلَاذَ الْغُلَامُ بِإِصْبِعِهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَأَغْدَقَ وَاغْدَوْدَقَ، وَانْفَجَرَ لَهُ الْوَادِي وَفِيْ ذَلِكَ يَقُوْلُ أَبُو طَالِبٍ: شِعْرٌ

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ	*	ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ

'হযরত হালিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, হযরত ওরফুতা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় গমন করলাম, সে-সময় তাদের দুর্ভিক্ষ চলছিলো। কুরায়শরা বললো, হে আবু তালিব! গ্রামে দুর্ভিক্ষ চলছে, পরিবার-পরিজন দুর্ভিক্ষের শিকার হতে চলছে। কাজেই চলুন, বৃষ্টির প্রার্থনা করি। তখন আবু তালিব রওয়ানা হলেন, তাঁর সাথে একটি শিশু ছিলো। শিশুটিকে কালো মেঘঢাকা সূর্যের মতো লাগছিলো; যার দ্বার মেঘমালা চমকাচ্ছিলো। আবু তালিবের চারপাশে আরও ক'জন শিশু ছিলো। আবু তালিব সেই শিশুটিকে ধরে তাঁর পেট কাবার সাথে লাগিয়ে দিলেন। শিশুটি আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করলো, তখন আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্রও ছিল না অথচ সাথে সাথে এ-দিক থেকে ও-দিক থেকে মেঘমালা এসে জড়ো হল। অতঃপর মুষলধারে বৃষ্টি নামলো এবং প্রবল বৃষ্টি হলো। আর এতে গ্রাম বন্যা বইয়ে গেল। এ-প্রসঙ্গে আবু তালিব বলেন, কবিতাঃ

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ	*	ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ

উজ্জ্বল রঙ তো মেঘমালা যেমন চেহারা বিশিষ্ট এই শিশু থেকে ঔজ্জ্বল্য গ্রহণ করে, সে সকল এতিমের আশ্রয় ও অভাবীদের ভরসাস্থল।'[১]

আর اَلثِّمَالُ শব্দটি তিন নুকতা বিশিষ্ট ث-এ كَسْرٌ (ই-কার)-সহকারে অর্থ اَلْمَلْجَأُ (আশ্রয়স্থল) ও اَلْغِيَاثُ (ত্রাণকর্তা)। আর কেউ কেউ বলেছেন, اَلْمُطْعِمُ فِي الشِّدَّةِ (সংকটের সময় খাদ্যদানকারী)।

[১] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, সূত্রঃ আস-সুয়ুতী, *আল-খাসায়িসুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১৪৬

আর الْأَرَامِلُ অর্থ اَلْمَسَاكِيْنُ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ (অসহায় নারী-পুরুষ)। এটি নারীর জন্য বিশিষ্ট এবং বহুল ব্যবহৃত। শব্দটির একবচন হলো أَرْمَلٌ ও أَرْمَلَةٌ।

এ-পঙ্‌ক্তিটি আবু তালিবের কাব্যমালা থেকে উদ্ধৃত হলো। ইবনে ইসহাক পুরো কাব্যমালাটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও নবী করীম ﷺ-এর প্রশংসায় তাঁর আরও বেশ কিছু কাব্য রয়েছে। সর্বোপরি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তাঁর আন্তরিক অভিভাবকত্ব ও সার্বিক সহযোগিতা তো ইতিহাসখ্যাত।

ইমাম ইবনে আত-তিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু তালিবের কবিতাগুলোয় প্রমাণ হয় যে, তিনি নবী করীম ﷺ নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্ব থেকেই তাঁর নুবুওয়াতের বিষয়টি টের পেয়েছিলেন। কারণ এ-ব্যাপারে পাদরি بَحِيْرَا—এক নুকতা বিশিষ্ট ب-এ فَتْحٌ (আ-কার), নুকতাবিহীন ح-এ كَسْرٌ (ই-কার), নিচে দুই নুকতা বিশিষ্ট ي-এ سُكُوْنٌ (হ-সন্ত) ও শেষে স্বল্প দীর্ঘস্বরের رَاء-সহকারে—প্রমুখ তাঁকে পূর্বেই অবগত করেছিলেন।[১]

এ-ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সিদ্ধান্ত হলো, ইমাম ইবনে ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ভাষ্য মতে, আবু তালিব এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছিলেন নবী করীম ﷺ-এর নুবুওয়তপ্রাপ্তির পর। তবে আবু তালিব নবী করীম ﷺ-এর নুবুওয়াতের বিষয়টি সত্যি জানতেন মর্মে বহু বর্ণনায় এসেছে। আর সেসবকে দলিল হিসেবে পেশ করে কতিপয় শিয়া মনে করে আবু তালিব মুসলিম ছিলেন এবং তিনি ইসলামের ওপর ইন্তিকাল করেছেন। আল-হাশাওয়িয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, তিনি কাফির অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। তবে তাদের দাবির পক্ষে যেসব দলিল উপস্থাপন করেছে তা থেকে বিষয় প্রমাণিত হয় না।[২] *আল-মাওয়াহিবে* অনুরূপ এসেছে।[৩]

আরও বর্ণিত আছে যে,

أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ: «أَيْ عَمِّ! قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؛ كَلِمَةً أَسْتَحِلُّ لَكَ بِهَا الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَلَمَّا رَأَى أَبُوْ طَالِبٍ حِرْصَ

---

[১] আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১২-১১৩
[২] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ২, পৃ. ৪৯৬
[৩] আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১৩

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِيْ، وَاللهِ لَوْلَا مَخَافَةُ قُرَيْشٍ أَنِّيْ إِنَّمَا قُلْتُهَا جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ لَقُلْتُهَا -لَا أَقُوْلُهَا إِلَّا لِأَسُرَّكَ بِهَا- فَلَمَّا تَقَارَبَ مِنْ أَبِيْ طَالِبٍ الْمَوْتُ نَظَرَ الْعَبَّاسُ إِلَيْهِ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَأَصْغَىٰ إِلَيْهِ بِأُذُنَيْهِ، فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِيْ! وَاللهِ لَقَدْ قَالَ أَخِي الْكَلِمَةَ الَّتِيْ أَمَرْتَهُ، فَقَالَ ﷺ: «لَمْ أَسْمَعْ».

'আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, 'হে আমার চাচা! আপনি অন্তত লা-ইলাহা ইল্লাহ বাক্যটি পড়ুন, এতে কিয়ামত-দিবসে আপনার পক্ষে সুপারিশ করা আমার জন্য বৈধ হয়।' আবু তালিব হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পীড়াপীড়ি দেখে তাঁকে বললেন, ওহে ভাতিজা! আল্লাহর কসম, যদি কুরায়শ-কর্তৃক মৃত্যুর ভয়ে আমি কালিমা পড়ে নিয়েছি এই অপবাদ দেওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তাহলে আমি নিশ্চয় কালিমা পড়তাম। তবে তোমাকে খুশি করার জন্যে পড়ছি। যখন আবু তালিবের মৃত্যু-সময় ঘনিয়ে এলো তখন আল-আব্বাস رضي الله عنه তাঁর দিকে লক্ষ করলেন, তাঁর ঠোঁট নড়ছে, তাই আব্বাস তাঁর প্রতি কান পাতলেন আর বললেন, ভাতিজা! আমি আমার ভাইকে কালিমাটি পড়তে শুনেছি যা তুমি তাঁকে পড়তে বলেছ। নবী করীম ﷺ বললেন, 'আমি শুনতে পাইনি।'"[১]

অনুরূপভাবে ইমাম ইবনে ইসহাক رحمه الله-এর বর্ণনায় এসেছে যে,

أَنَّهُ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ.

'মৃত্যুর সময় তিনি ঈমান এনেছিলেন।'[২]

এসবের জবাবে বলা যায়, তাঁর মৃত্যু আবদুল মুত্তালিবের অনুসৃত ধর্মবিশ্বাসের ওপর হয়েছে[৩] মর্মে যে বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে এটি তার পরিপন্থী।

---

[১] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ২, পৃ. ৩৪৬; তিনি বলেছেন, হাদিসটির সনদ মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)

[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৫৫

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস: ১৩৬০, খ. ৫, পৃ. ৫২, হাদীস: ৩৮৮৪ ও খ. ৬, পৃ. ১১২, হাদীস: ৪৭৭২

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- لِأَبِي طَالِبٍ: يَا عَمِّ،

এ-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আল্লাহই সত্য বলেন এবং তিনি সঠিক পথনির্দেশকারী।

১২ বছর বয়সে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফরে যান এবং বুসরা পৌছান। সেখানে জিরজিস ওরফে বহীয়রা নামক এক সাধু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি নবী করীম ﷺ-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য চিনে ফেলেন। অতঃপর তিনি নবী করীম ﷺ-এর হাত ধরে বললেন[১],

هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ! هَذَا يَبْعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ! فَقِيْلَ لَهُ مَا عَمَلُكَ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ حِيْنَ أَشْرَفْتُمْ بِهِ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَّلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا لِنَبِيٍّ! وَإِنِّيْ لَأَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فِيْ أَسْفَلِ غُضْرُوْفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ.

'ইনি দু'জাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তির দূতরূপে প্রেরিত করবেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, এতোসব আপনি কী করে জানেন? তিনি বললেন, তোমরা যখন তাঁকে নিয়ে আকাবা উপত্যকায় পদার্পন করলে তখন না কোন বৃক্ষ ছিলো, না পাথর—সকলেই তাঁর প্রতি সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। অথচ বৃক্ষ-পাথররা নবী ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করে না। আর আমি তাঁকে তাঁর মোহরে

قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُوْلَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

'সায়িদ ইবনে আল-মুসাইয়্যিব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর কাছে গেলেন। সেখানে আবু জাহল ইবনে হিশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু তালিবের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আমার চাচা! আপনি লা-ইলাহা কথাটি বলুন, এর দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারবো'। তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলে উঠলো, হে আবু তালিব! তুমি কি আবদ আল-মুত্তালিবের ধর্মবিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? তবুও আল্লাহর রসুল ﷺ বারবার কথাটি তাঁর কাছে পেশ করতে থাকলেন। তিনি বিষয়টি পুনঃপুন তাঁর কাছে পেশ করছিলেন। আবু তালিব শেষ পর্যন্ত যে কথা বললেন তা হলো, তিনি আবদ আল-মুত্তালিবের ধর্মবিশ্বাসের উপর অবিচল থাকবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লা-ইলাহা ইল্লাহ বলতে অস্বীকৃতি জানালেন।'

[১] আল-কাসৃতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১৪

নুবুওয়ত দ্বারাও চিনতে পেরেছি যেটি তাঁর কাঁধের নরম হাড়ের কাছে নাশপাতির মতো অঙ্কিত রয়েছে।'[১]

এসব আমি আমাদের গ্রন্থাসমূহ থেকে লাভ করেছি।[২]

নবী করীম ﷺ ২৫ বছর বয়সে হযরত খদীযা-এর সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হন। জাহিলি যুগে হযরত খদীযা-কে তাহিরা নামে ডাকা হতো। নবী করীম ﷺ-এর সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৪০ বছর এবং নবী করীম ﷺ তাঁর মোহর নির্ধারণ করেন ২০টি লাল রঙের উট। হযরত আবু বকর ও মুযর গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিয়ের খুতবা পাঠ করেন আবু তালিব। তিনি বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَزَرْعِ إِسْمَاعِيْلَ، وَضِئْضِئِ مَعَدٍّ، وَعُنْصُرِ مُضَرَ. وَجَعَلَنَا حَضَنَةَ بَيْتِهِ، وَسُوَّاسَ حَرَمِهِ. وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوْجًا وَحَرَمًا آمِنًا. وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ. ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِيْ هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَا يُوْزَنُ بِرَجُلٍ إِلَّا رَجَحَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلٌّ، فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ وَمُحَمَّدٌ مِمَّنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، وَقَدْ خَطَبَ خَدِيْجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا آجِلُهُ وَعَاجِلُهُ مِنْ مَالِيْ كَذَا.

'সকল প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে হযরত ইবরাহীম-এর বংশধর, হযরত ইসমাইল-এর সন্তান, মাদ গোত্র এবং মুযারের গোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমাদেরকে তাঁর ঘরের কর্ণধার ও পবিত্রাস্থানের তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত করেছেন। যিনি আমাদেরকে একটি হজব্রত পালনের ঘর এবং নিরাপদ স্থান দান করেছেন। যিনি আমাদেরকে মানুষের ওপর নেতৃত্ব দান করেছেন। অতঃপর, আমার এই ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সাথে কারো তুলনা চলে না; তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অগ্রবর্তী আসনে। যদিও ধন-সম্পদে প্রতিপত্তি তাঁর নেই। তবে ধন-সম্পদ তো ক্ষণস্থায়ী ছায়া এবং পক্ষত্যাগী বস্তু। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ কেমন

[১] আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬৭২, হাদীস: ৪২২৯, হযরত আবু মূসা আল-আশআরী থেকে বর্ণিত

[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১৪

জনপ্রিয় সেকথা তো তোমরা সকলেই অবগত। হযরত খদীযা বিনত খুয়াইলিদ رضي الله عنها-এর কাছে প্রস্তাব পাঠানো এবং তাঁর নগদ-বাকি সব মোহর এইভাবে আমার সম্পদ থেকে আদায় করে দেওয়া হয়েছে।'

আর তিনি; আল্লাহর শপথ! এসবের জন্য তিনি সুসংবাদ ও বিশেষ মর্যাদা পেতে পারেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন ৪০ বছর, কারো মতে আরও ৪০ দিন, কারো মতে আরও ১০ দিন আর কারো মতে আরও ২ মাস সোমবার ১৭ মাহে রামাযান; কেউ বলেছেন, ১৭ আবার কেউ বলেছেন, ২৪ রামাযান রাত্রিবেলা, আর ইমাম ইবনে আবদুল বর رحمه الله বলেছেন, সোমবার ৮ রবিউল আওয়াল হস্তিবর্ষের ৪১তম বর্ষে মহান আল্লাহ তাঁকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত এবং মানব-দানব সকল জাতির জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন।[১]

অতঃপর তাঁকে অসাধারণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন এবং সমগ্র জাহানে তাঁর নাম ছড়িয়ে দেন।

এরপর তিনি ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করেন এবং তারপর পবিত্র মদীনায় হিজরত করার জন্য আদেশ হয়। যেখানে তিনি ১০ বছর অবস্থান করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিচালনা করেন, মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করেছেন এবং পৃথিবীকে ঈমান-ইয়াকিনের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন।

নবী করীম ﷺ-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিলো, মানব জাতির হিদায়ত, সচ্চরিত্রের পূর্ণবিকাশ, সর্বোপরি দীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। যখন এ মিশন পরিণতিতে পৌঁছে এবং এই উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় তখন আল্লাহ তাঁর নবীকে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় নিজের সান্নিধ্যে ডেকে নেন। ৬৩ বছর বয়সে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন তিনি—আল্লাহ নবী করীম ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবা, অনুসারী ও অনুগামী সকলের ওপর রহমত নাযিল করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : নবী করীম ﷺ-এর তিরোভাব

আমরা এখানে নবী করীম ﷺ-এর তিরোভাবের প্রাথমিক ও সর্বশেষ ঘটনাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করবো। আল্লাহ সহায়ক। নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতার একমাস পূর্বের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,

---

[১] আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১৬–১১৮

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: نَعَىٰ لَنَا نَبِيُّنَا وَحَبِيبُنَا ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ -هُوَ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ، وَنَفْسِيْ لَهُ الْفِدَاءُ-، فَلَمَّا دَنَا الْفِرَاقُ جَمَعَنَا فِيْ بَيْتِ أُمِّنَا عَائِشَةَ، وَنَشَدَ لَنَا، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِكُمْ، حَيَّاكُمُ اللهُ بِالسَّلَامِ، رَحِمَكُمُ اللهُ، حَفِظَكُمُ اللهُ، جَبَرَكُمُ اللهُ، رَزَقَكُمُ اللهُ، رَفَعَكُمُ اللهُ، نَفَعَكُمُ اللهُ، آوَاكُمُ اللهُ، هَدَاكُمُ اللهُ، وَقَاكُمُ اللهُ أُوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَأُوْصِي اللهَ بِكُمْ، أَسْتَخْلِفُهُ عَلَيْكُمْ، وَأُحَذِّرُكُمْ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَلَّا تَعْلُوْا عَلَى اللهِ فِيْ عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ، فَإِنَّهُ قَالَ لِيْ وَلَكُمْ: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص]، وَقَالَ: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر].

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَتَىٰ أَجَلُكَ؟، قَالَ: «دَنَا الْفِرَاقُ الْمُنْقَلَبُ إِلَى اللهِ، وَإِلَى جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ، وَإِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، وَإِلَى الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، وَالْكَأْسِ الْأَوْفَىٰ، وَالْحَوْضِ الْمُصَفَّىٰ، وَالْعَيْشِ الْمُهَنَّىٰ».

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ يُغَسِّلُكَ؟، فَقَالَ: «رِجَالُ أَهْلِيْ، الْأَدْنَىٰ فَالْأَدْنَىٰ».

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَفِيْمَ نُكَفِّنُكَ؟، فَقَالَ: «فِيْ ثِيَابِيْ هَذِهِ إِنْ شِئْتُمْ، أَوْ ثِيَابِ مِصْرَ، أَوْ فِيْ حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ».

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ وَبَكَيْنَا وَبَكَىٰ، فَقَالَ: «مَهْلًا، رَحِمَكُمُ اللهُ، وَجَزَاكُمُ اللهُ عَنْ نَبِيِّكُمْ خَيْرًا إِذَا أَنْتُمْ غَسَّلْتُمُوْنِيْ وَكَفَّنْتُمُوْنِيْ فَضَعُوْنِيْ عَلَىٰ سَرِيْرِيْ هَذَا عَلَىٰ شَفَةِ قَبْرِيْ فِيْ بَيْتِيْ هَذَا، ثُمَّ اخْرُجُوْا عَنِّيْ سَاعَةً، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيَّ حَبِيبِيْ وَخَلِيْلِيْ جِبْرِيْلُ،

ثُمَّ مِيكَائِيلُ، ثُمَّ إِسْرَافِيلُ، ثُمَّ مَلَكُ الْمَوْتِ، مَعَ جُنُودٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِأَجْمَعِهِمْ! ثُمَّ ادْخُلُوا فَوْجًا فَوْجًا فَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَلَا تُؤْذُونِي بِتَزْكِيَةٍ وَّلَا بِرَنَّةٍ، وَلْيَبْتَدِئْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي، ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ، ثُمَّ أَنْتُمْ بَعْدُ، وَاقْرَأُوا السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ غَابَ مِنْ أَصْحَابِيْ، وَاقْرَأُوا السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ تَبِعَنِيْ عَلَىٰ دِيْنِيْ مِنْ يَوْمِيْ هٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»،

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ!، فَمَنْ يُدْخِلُكَ قَبْرَكَ؟ قَالَ: «أَهْلِيْ مَعَ مَلَائِكَةٍ كَثِيْرَةٍ يَرَوْنَكُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ».

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের প্রিয়নবী ﷺ তাঁর তিরোভাবের এক মাস পূর্বে এ ব্যাপারে আমাদেরকে অবগত করেছিলেন—আমার পিতা, আমার মাতা ও আমার জান তাঁর জন্য উৎসর্গিত! বিদায়বেলা ঘনিয়ে এলে আমরা মুমিনজননী হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে সমবেত হলাম। নবী করীম ﷺ উচ্চৈঃস্বরে আমাদের বললেন, 'স্বাগতম তোমাদের, আল্লাহ তোমাদের সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখুন, আল্লাহ তোমাদের দয়া করুন, আল্লাহ তোমাদের নিরাপদ রাখুন, আল্লাহ তোমাদের শক্তি-সাহস দিন, আল্লাহ তোমাদের রিযক বাড়িয়ে দিন, আল্লাহ তোমাদের সম্মানিত করুন, আল্লাহ তোমাদের আশ্রয় দিন, আল্লাহ তোমাদের হিদায়ত দিন আর আল্লাহ তোমাদের অবিচল রাখুন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি অবলম্বনের অসিয়ত করছি, আল্লাহও তোমাদের এই অসিয়ত করেছেন। আর আমি বিষয়টি তোমাদের দায়িত্বে অর্পন করলাম। আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি যে, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী; আল্লাহর বান্দা ও শহরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে না। কেননা তিনি আমি ও তোমাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন, 'এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা

দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।'[১]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, 'অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি?''[২]

আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, 'আল্লাহর সান্নিধ্যের দিকে, জান্নাতুল মাওয়ার পথে, সিদরাতুল মুনতাহার পথে, মহান বন্ধুর দিকে, উপচেপড়া পেয়ালার প্রতি, মনোনীত কাওসার ও কাঙ্ক্ষিত জীবন পানে ফেরার সময় খুবই সন্নিকটে।'

এরপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কে গোসল দেবেন? তিনি বললেন, 'আমার ঘনিষ্ট নিকটাত্মীয় পুরুষ।'

পুনরায় আমরা জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'আপনাকে কোন কাপড়ে কাফন দেব? তিনি জবাব দিলেন, 'যদি তোমরা চাও, তবে আমার এই কাপড় অথবা মিসরি কাপড় কিংবা ইয়েমনি চাদর দিয়ে কাফন পরাতে পার।'

এরপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! জানাযা কে পড়াবেন? একথা বলেই আমরা কাঁদতে শুরু করি এবং নবী করীম ﷺ-এর চোখও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, 'ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ তোমাদের রহম করুন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তোমরা যখন আমাকে গোসল দেবে, কাফন পরাবে, আমার এই ঘরে আমার কবরের পাশে খাটিয়া রেখে কিছু সময়ের জন্য তোমরা সবাই সরে যাবে। কারণ প্রথমেই আমার জানাযা পড়বেন আমার প্রিয়বন্ধু হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম, তারপর হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালাম, তারপর হযরত মিকাইল আলাইহিস সালাম ও তারপর মালাকুল মওত (হযরত আযরায়ীল আলাইহিস সালাম), সঙ্গে সম্মিলিত একটি ফেরেশতার দল। এরপর তোমরা দলে দলে আমার ওপর জানাযা আদায় করবে এবং সঠিকভাবে সালাম নিবেদন করবে। সাবধান! অতিরঞ্জিত স্তুতি এবং মাতম করে আমাকে কষ্ট দেবে না। আমার পরিবারের পুরুষদের দিয়ে আমার ওপর সালাত শুরু করবে, এরপর মেয়েরা, এরপর

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাসাস*, ২৮:৮৩
[২] আল-কুরআন, *সূরা আয-যুমার*, ৩৮:৬০

তোমরা সকলে। এরপর আমার অনাগত সাহাবাগণ আমার ওপর সালাম নিবেদন করবে। এভাবে আজকের এদিন থেকে কিয়ামত-দিবস পর্যন্ত আমার দীনের ওপর অবিচল মুসলমিরা আমার ওপর সালাম নিবেদন করবে।'

অতঃপর আমরা জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কবরে কে রাখবেন? তিনি বললেন, 'আমার পরিবারের লোকজন, যাদের সঙ্গে প্রচুরসংখ্যক ফেরেশতা থাকবে, তারা তোমাদের দেখবে কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখবে না।'"[১]

আনওয়ারুত তানযীল ওয়াল মাদারিকে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَّلَ بِهَا جِبْرِيْلُ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة]، وَقَالَ: ضَعْهَا فِيْ رَأْسِ مَائَتَيْنِ وَالثَّمَانِيْنَ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَعَاشَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَهَا أَحَدًا وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا، وَقِيْلَ: أَحَدًا وَّثَمَانِيْنَ يَوْمًا، وَقِيْلَ: ثَلَاثَ سَاعَاتٍ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সর্বশেষ আয়াত হিসেবে জিবরাইল 'সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোন রূপ অবিচার করা হবে না'[২] নিয়ে অবতরণ করেন এবং বললেন, আয়াতটিকে সূরা আল-বাকারার ২৮০ আয়াতের সাথে যোগ করে দিন। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ২১ দিন, কারো মতে ৮১ দিন, আর কারো মতে মাত্র ৩ ঘণ্টা জীবিত ছিলেন।'[৩]

তাফসীরুয যাহিদীতে এসেছে,

وَبَكَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: خُتِمَ الْوَحْيُ بِالْوَعِيْدِ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস অশ্রুসজল নয়নে বলেন, ওহীর সমাপ্তি হয়েছে সতর্কবাণীর মধ্য দিয়ে।'

---

[১] (ক) আল-বাযযার, *আল-বাহরুয যাখখার*, খ. ৫, পৃ. ৩৯৪–৩৯৬, হাদীস: ২০২৮; (খ) ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২২৪, হাদীস: ২১৯৯

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২৮১

[৩] নাসিরউদ্দিন আল-বয়যাওয়ী, *আনওয়ারুত তানযীল*, খ. ১, পৃ. ১৩৬ (২:২৮১)

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতার সূচনা ও ঘটনাবলির আলোচনা

বর্ণিত আছে, সফরের শেষ দুটি রাত[১] মতান্তরে একটি রাত[২] তখনো অবশিষ্ট, বুধবার হযরত মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা শুরু হয়। কারো মতে, বরং রবিউল আউওয়ালের শুরুর দিকে।

আল-ওয়াফা গ্রন্থে আছে, সফরের ১০টি দিন তখনো অবশিষ্ট সেই সময়[৩] নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা দেখা দেয়। ১২ রবিউল আউওয়াল রাতে নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবু হাতিম (রহ.) থেকে রযীন বর্ণনা করেন, হিজরী ১১ বর্ষের রবিউল আউওয়াল মাসে নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেন। আর নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা শুরু হয় হযরত মায়মুনা (রা.), কারো মতে হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) আর কারো মতে হযরত রায়হানা (রা.)-এর ঘরে অবস্থানকালেই।

ইমাম আল-খাত্তাবী (রহ.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা শুরু হয়েছে সোমবার, কারো মতে শনিবার, আবার কারো মতে বুধবার। এটি হাকিমের অভিমত। *আর-রাওযা* গ্রন্থে দুটো অভিমতই লেখা হয়েছে।

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতার মেয়াদকাল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে ১৪ দিন। কারো মতে ১২ দিন; তবে এটিই অধিকাংশের মত। কারো মতে ১০ দিন; হযরত সুলায়মান আত-তায়মী (রহ.)-এর মতো একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এ-মতটি সমর্থন করেছেন। সে-অনুযায়ী নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা শুরু হয়েছে ২২ সফর শনিবার এবং ২ রবিউল আউওয়াল তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪]

আল-ইকতিফা গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

وَلَـمَّا قَفَلَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ مِـنْ حَجَّةِ الْـوِدَاعِ أَقَـامَ بِالْـمَدِيْنَةِ بَقِيَّةَ ذِي الْـحَجَّةِ وَمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، وَضَرَبَ عَلَى النَّاسِ، وَبَعَثَ أُسَـامَةَ بْنَ زَيْـدٍ إِلَى الشَّامِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُوْطِيَء الْـخَيْلَ تُخُوْمَ الْبَلْقَاءَ وَالـدَّارَوِمَ مِـنْ أَرْضِ فِلِسْطِيْنَ، فَتَجَهَّزَ النَّاسُ وَأَوْعَبَ مَعَ أُسَامَةَ الْـمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِ، وَكَانَ

---

[১] অর্থাৎ ২৮ সফর
[২] অর্থাৎ ২৯ সফর
[৩] অর্থাৎ ২০ সফর
[৪] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা*, খ. ১, পৃ. ২৪৫

آخِرُ بِعْثٍ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَبَيْنَا النَّاسُ عَلَىٰ ذٰلِكَ ابْتَدِيَء صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ بِشَكْوَاهُ الَّذِيْ قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْهِ إِلَىٰ مَا أَرَادَ بِهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ فِيْ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ صَفَرَ أَوْ فِيْ أَوَّلِ شَهْرِ الرَّبِيْعِ الْأَوَّلِ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا بَدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْمَا ذُكِرَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَىٰ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ابْتَدِيَء بِوَجْعِهِ فِيْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ.

'বিদায় হজ থেকে ফেরার পর যিলহজের বাকি দিনগুলো, মুহার্‌রম ও সফর মাসে তিনি মদীনায় অবস্থান করে মানুষকে সতর্ক করছিলেন। এই মাসে তিনি উসামা ইবনে যায়দকে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন এবং ফিলিস্তিনের বালকা ও দারম সীমান্তে অশ্বশক্তি দুর্নিবীত করার নির্দেশ দেন। লোকজন যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলো। নবী করীম ﷺ হযরত উসামা ؓ-এর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদেরও দলভুক্ত করে দেন। এটি ছিলো হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-প্রেরিত সর্বশেষ অভিযান। লোকজন সে-অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, ওইসময় নবী করীম সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহুর অসুস্থতা শুরু হয়, যে-অসুস্থতার মধ্যে ২৮ সফর অথবা রবিউল আউওয়াল মাসের শুরুতে আল্লাহ তাআলা নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী শান্তি ও সম্মানের দিকে তাঁকে ডেকে নেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা শুরু হওয়ার প্রাথমিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক গভীর রাতে বকীউল গারকাদে গমন করেন এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘরে ফিরে আসেন। যখন ভোর হলো সেই দিনই তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়।'[১]

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোলাম হযরত আবু মুওয়ায়হিবা ؓ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এক গভীর রাতে এই বলে আমাকে ডেকে পাঠালেন যে,

[১] আবুর রবী আল-কালায়ী, *আল-ইকতিফা*, খ. ১, পৃ. ৩৬

«يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ! إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ هَذَا الْبَقِيعِ»، فَانْطَلِقْ مَعِيْ، فَانْطَلَقْ مَعَهُ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ! لِيَهْنَ عَلَيْكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيْهِ مِمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيْهِ، أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا»، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ! إِنِّي قَدْ أُوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الدُّنْيَا، وَالْخُلْدَ فِيْهَا، ثُمَّ الْجَنَّةَ فَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّيْ». فَقُلْتُ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، فَخُذْ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَالْخُلْدَ فِيْهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «لَا وَاللهِ، يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ! لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّيْ وَالْجَنَّةَ»، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لِأَهْلِ الْبَقِيْعِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَبَدَأَ بِهِ وَجَعُهُ الَّذِيْ قَبَضَهُ اللهُ فِيْهِ.

"হে আবু মুওয়ায়হিবা! আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন এই বকিবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তুমি আমার সাথে চলো।' আমি তাঁর সাথে চললাম। তিনি সেখানে পৌঁছে বললেন, 'হে কবরবাসীরা! তোমাদের ওপর সালাম, আগামী সকাল তোমাদের জন্য সৌভাগ্যময় হোক অন্যান্য লোকদের সকাল পারের তুলনায়; অন্ধকার রাতের গোলকধাঁধার মতো বিপর্যয় যাদেরকে ঘিরে ধরেছে, যাদের শেষ-শুরু তালগোল পাকিয়ে ফেলে।' অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'হে আবু মুওয়ায়হিবা! নিশ্চয় আমাকে পৃথিবীর সমগ্র ধন-ভা-ারের চাবি, পৃথিবীতে চিরদিন অবস্থান এবং পরে জান্নাত গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আমাকে এসব গ্রহণ কিংবা আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাতে রওয়ানা উভয়ের ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে।' এরপর আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনি পৃথিবীর সমগ্র ধন-ভা-ারের চাবি, পৃথিবীতে চিরদিন অবস্থান অধিকার এবং পরে জান্নাত গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, 'না, আল্লাহর শপথ, হে মুওয়ায়হিবা! আমি আমার সাথে সাক্ষাৎ ও জান্নাতে প্রবেশের সিদ্ধান্তকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছি।' এরপর তিনি বকীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘরে

ফিরে আসলেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে-অসুস্থতার মধ্যেই আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে যান।'[১]

আর হযরত আয়িশা رضي الله عنها বলেন,

رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ، فَوَجَدَنِيْ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِيْ رَأْسِيْ، وَأَنَا أَقُوْلُ: وَا رَأْسَاهُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنَا، وَاللهِ، يَا عَائِشَةُ! أَقُوْلُ: وَا رَأْسَاهُ»، قَالَتْ: وَكَانَ يُسَلِّيْنِيْ رَسُوْلُ اللهِ بِالْمُزَاحِ عَلَىٰ تَجَشُّمٍ مِّنْهُ، فَقَالَ: «وَمَا ضَرُّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِيْ، فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ»؟ فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَكَأَنِّيْ بِكَ، وَقَدْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ، فَرَجَعْتَ إِلَىٰ بَيْتِيْ، فَأَعْرَسْتَ فِيْهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ مِنْ آخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَتَمَادَّ بِهِ وَجَعُهُ، وَهُوَ يَدُوْرُ عَلَىٰ نِسَائِهِ، حَتّٰى اشْتَدَّ بِهِ، وَهُوَ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ، فَدَعَا نِسَاءَهُ، فَاسْتَأْذَنَهُنَّ فِيْ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِ، أَحَدُهُمَا: الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: وَرَجُلٌ آخَرُ عَاصِبًا رَأْسَهُ تَخُطُّ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتّٰى دَخَلَ بَيْتِيْ.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বকী থেকে ফিরে এলেন। তখন তিনি আমাকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, আমি মাথায় বেদনায় আক্রান্ত। আর আমি বলছি যে, হায়! ব্যথায় আমার মাথা গেল! (আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'না, বরং হে আয়িশা! আল্লাহর শপথ, আমি বলছি যে, আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়েছি।' তিনি (হযরত আয়িশা رضي الله عنها) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সস্নেহে রসিকাতর সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলেন যে, 'তুমি যদি আমার আগেই মারা যাও তবে তোমার ক্ষতির কিছু নেই, আমি তোমার

[১] (ক) আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২১৫, হাদীস: ৭৯; (খ) আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৬৮, হাদীস: ৫৩৮৩; (গ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১০৯–১১০, হাদীস: ৩০৯২

অভিভাবক, আমি তোমার কাফন দেব, আমি তোমরা সালাত পড়বো এবং আমি তোমার দাফন করবো।' আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যেন আপনাকে এমনই মনে করি যে, আপনি এসব সম্পাদন করে আমার ঘরে প্রত্যার্পন করবেন এবং আজকের এই শেষ সময়ও আপনি আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে সেখানে বিশ্রাম নেবেন! হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদুভাবে হাসলেন। অতঃপর তাঁর মাথাব্যথা শুরু হয়। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে পালাক্রমে অবস্থান করছিলেন। তাঁর মাথাব্যথা আরও প্রচ- আকার ধারন করে। ওই সময় তিনি মায়মুনা رضي الله عنها-এর ঘরে ছিলেন। এ-পর্যায়ে তিনি তাঁর সকল সহধর্মিনীগণকে ডেকে পাঠালেন এবং আমার ঘরে অবস্থান করে সেবা-শুশ্রূষা নেওয়ার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের দুজন লোক—তাদের একজন হলেন হযরত আল-ফযল ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما ও অন্য একলোকের সাহায্যে হেঁটে বেরুলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিলো, তাঁর পায়ে মাটিতে রেখা আঁকছেন এভাবে তিনি আমার ঘরে তশরীফ নিয়ে এলেন।'[১]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الرَّجُلَ الْآخَرُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، ثُمَّ غُمِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجْعُهُ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, দ্বিতীয়জন ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা বাড়তে থাকলো এবং মাথা ব্যথা প্রচ- আকার ধারন করলো।'[২]

অন্য বর্ণনায় আছে, এরপর তিনি বললেন,

«أَنَا وَارَأْسَاهُ»، فَذَهَبَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّىٰ جِيْءَ بِهِ مَحْمُوْلًا فِيْ كِسَاءٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ، وَبَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «إِنِّيْ قَدْ اشْتَكَيْتُ، وَإِنِّيْ لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَدُوْرَ بَيْنَكُنَّ، فَائْذَنَّ فَلْأَكُنْ عِنْدَ عَائِشَةَ»، فَكُنْتُ أُوَضِّئُهُ، وَلَمْ أُوَضِّئْ أَحَدًا قَبْلَهُ.

---

[১] আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনাদ*, খ. ৮, পৃ. ৫৬, হাদীস: ৪৫৭৯
[২] আব্দুর রবী আল-কালায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৪

'হায়! ব্যথায় আমার মাথা গেল!। অতঃপর তিনি বাইরে তশরীফ নিয়ে যান। তিনি সেখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করতে পারেননি, সাথে সাথে কয়েকজন লোক তাঁকে ধরাধরি করে চাদর জড়িয়ে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি আমার ঘরে তশরীফ রাখেন। এরপর তিনি সহধর্মিণীদের ডেকে বললেন, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এখন তোমাদের ঘরে ঘরে যাতায়াত করবো—সেই শক্তি আমার নেই। তোমরা সম্মতি দিলে আমি আয়িশার ঘরে অবস্থান করতে চাই। এরপর আমি তাঁকে অযু করালাম। ইতঃপূর্বে আমি কাউকে অযু করাইনি।'[১]

আরও বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِيْ مَرَضِهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا» يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ، وَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ فِيْ بَيْتِهَا.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থতার সময় বার বার জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, 'আমি আগামীকাল কার ঘরে অবস্থান করবো'? অর্থাৎ হযরত আয়িশা رضي الله عنها-এর পালা কবে আসছে—তিনি তাই জানতে চাচ্ছিলেন। অতঃপর তাঁর সহধর্মিণীগণ তাঁকে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করার অনুমতি দেন। আর নবী করীম ﷺ হযরত আয়িশা رضي الله عنها-এর ঘরে অবস্থান করতে লাগলেন এবং সেখান থেকেই তিনি ইন্তিকাল করেন।'[২]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحْمَلُ فِيْ ثَوْبٍ يُطَافُ بِهِ عَلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيْضٌ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ.

'নবী করীম ﷺ রোগ সহনীয় থাকা অবস্থায় গায়ে চাদর জড়িয়ে সহধর্মিণীগণের ঘরে ঘরে পর্যায়ক্রমে অবস্থান করতেন।'[৩]

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ২৫৮৪১, হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬ ও ৭, পৃ. ১৩ ও ৩৪, হাদীস: ৪৪৫০ ও ৫২১৭, হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

[৩] ইবনে সা'দ, *ত্বাবাকাত*, খ. ২, পৃ. ২০৪, হাদীস: ২১১৭, হযরত মুহাম্মদ আল-বাকির رحمه الله থেকে বর্ণিত

হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

ثُمَّ تَمَادَىٰ بِهِ وَجَعُهُ وَهُوَ فِيْ ذَلِكَ يَدُوْرُ عَلَىٰ نِسَائِهِ، حَتَّىٰ اجْتَمَعْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ، فَلَمَّا رَأَوْا مَا بِهِ اجْتَمَعَ رَأْيُ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَىٰ أَنْ يَلُدُّوْهُ وَتَخَوَّفُوْا أَنْ يَكُوْنَ بِهِ ذَاتَ الْجَنْبِ، فَفَعَلُوْا.

'অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা চরম আকার ধারন করলো। সেই অবস্থায়ও তিনি তাঁর সহধর্মিনীদের কাছে পালাক্রমে যাচ্ছিলেন। এ পর্যায়ে সহধর্মিণীগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে সমবেত হন। যখন তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর এ-অবস্থা দেখেন তখন আহলে বায়তের ঐক্যমতে নবী করীম ﷺ-এর ওপর ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। তাঁরা তখন নবী করীম ﷺ পুরিসি[১]গ্রস্ত হয়েছেন বলে আতঙ্কিত ছিলেন। অতঃপর তাঁরা ওষুধ প্রয়োগ করেন।'[২]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ تَأْخُذُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الْخَاصِرَةُ، فَأَخَذَتْهُ يَوْمًا وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ هَلَكَ، فَلَدَدْنَاهُ، ثُمَّ فُرِجَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ لَدُّوْهُ، فَقَالَ: «مَنْ صَنَعَ لِيْ هَذَا»؟ فَهِبْنَهُ فَاعْتَلَلْنَ بِالْعَبَّاسِ، فَاتَّخَذَ جَمِيْعُ مَنْ فِي الْبَيْتِ الْعَبَّاسَ سَبَبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْ ذَلِكَ رَأْيٌ، فَقَالُوْا: عَمُّكَ الْعَبَّاسُ أَمَرَ بِذَلِكَ، وَتَخَوَّفْنَا أَنْ يَكُوْنَ بِكَ ذَاتُ الْجَنْبِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَكُنِ اللهُ ﷻ لِيُسَلِّطَهَا عَلَيَّ، وَلَا لَيَرْمِيَنِّيْ بِهَا، وَلَكِنْ هَذَا عَمَلُ النِّسَاءِ لَا يَبْقَيْنَ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ إِلَّا عَمِّيَ الْعَبَّاسِ». فَإِنَّ يَمِيْنِيْ لَا تَنَالُهُ، فَلُدُّوْا كُلُّهُمْ وَلُدَّتْ مَيْمُوْنَةُ، وَكَانَتْ صَائِمَةً بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ بَيْتِ عَائِشَةَ

---

[১] ذَاتُ الْجَنْبِ = Pleurisy: ফুসফুসের আবরণ ঝিল্লির প্রদাহ ঘটিত রোগ।

[২] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৪, পৃ. ১৬৯, হাদীস: ৩১০০, হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত

-وَكَانَ يَوْمُهَا- بَيْنَ الْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ، وَالْفَضْلِ يُمَسِّكُ بِظَهْرِهِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهَا مَغْلُوبًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا إِلَىٰ غَيْرِهِ، ثُمَّ إِنَّ وَجَعَهُ اشْتَدَّ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: جَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ صَنَعَ هَـٰذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ نَكْبَةٌ مِّنْ شَوْكَةٍ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ».

وَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

'হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (অসুস্থতার সময়) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত লোকজনকে জড়িয়ে ধরতেন। অতঃপর একদিন নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা বেড়ে গেলো এবং প্রচ- আকার ধারন করলো। এমনকি আমাদের মনে হতে লাগলো যে, নবী করীম ﷺ-এর জীবন সংকটাপন্ন। তাই আমরা তাঁকে ওষুধ সেবন করি। এরপর নবী করীম ﷺ কিছুটা আত্মপ্রস্বস্তি অনুভব করলেন, তখন তাঁকে ওষুধ সেবন করা হয়েছিলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার সাথে এসব কে করেছে? এতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অতঃপর তাঁরা হযরত আব্বাস রা.-এর অজুহাত খাড়া করেন এবং আহলে বায়তগণ এর নেপথ্যে হযরত আব্বাস রা.-কে পেশ করেন। অথচ হযরত আব্বাস রা. এ ব্যাপারে কোনো পরামর্শই দেননি। অতঃপর সকলে বললেন, এ-ব্যাপারে আপনার চাচা হযরত আব্বাস রা.-এর নির্দেশ ছিলো। যেহেতু আমরা প্লুরিসিগ্রস্ত হয়েছেন বলে আতঙ্কিত ছিলাম। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, 'প্লুরিসি তো শয়তানের প্রভাব থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা-এর পক্ষ থেকে এমন হতে পারে না যে, শয়তান আমার ওপর প্লুরিসি দ্বারা বিজয়ী হবে। না, সে কখনো এর দ্বারা আমার ক্ষতি করতে পারবে। তবে এ-কাজটি তোমরা মহিলাদের। তাই ঘরের সকলকে ওষুধটি সেবন করা হবে। আমার চাচা আব্বাস ব্যতিত, আমার হুকুমে তাঁকে শামিল করবে না। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুমে

সবাইকে ওষুধটি সেবন করা হয়, এমনকি হযরত মায়মুনা—যিনি সিয়াম পালন করছিলেন—তাঁকেও সেবন করা হয়। এরপর হযরত আব্বাস ও হযরত আলী-এর সহায়তায় এবং হযরত ফযল নিজের পিঠ দিয়ে নবী করীম-এর ভর বহন করার মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ হযরত আয়িশা-এর ঘরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে এলেন—সেই দিনটিতে (হযরত আয়িশা)-এর পালা ছিলো। নবী করীম-এর পাদুটো জমিনের রেখা টেনে যাচ্ছিলো, এভাবে তিনি হযরত আয়িশা-এর ঘরে তশরীফ গ্রহণ করেন। হযরত আয়িশা-এর কাছে অবস্থান থেকে রোগের তীব্রতা না কমায় তিনি তাঁর ঘর থেকে অন্যদের ঘরে যাবার শক্তি রাখতেন না। এরপর তাঁর অসুস্থতা আরও চরম আকার ধারন করে।

হযরত আয়িশা বলেন, এরপর অসুস্থতা এতই বেড়ে গেল যে তিনি বিছানায় এপাশ-ওপাশ পর্যন্ত হতে পারছিলেন না। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে কেউ যদি এ-অবস্থায় পড়তো তখন আপনি সেটা পছন্দ করতেন? নবী করীম বললেন, 'মুমিনদের ওপর কষ্ট-বিপর্যয় আসা স্বাভাবিক। কেননা মুমিন সাধারণ কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার মতো বিপদগ্রস্ত কিংবা তার চেয়ে কমবেশি কষ্টে পড়লেও আল্লাহ তার বিনিময়ে তার মর্যাদা উন্নীত এবং গোনাহ মাফ করে থাকেন।

তিনি (হযরত আয়িশা) আরও বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ছাড়া আর কারও ওপর রোগের এতো তীব্রতা দেখিনি।'[১]

বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّهُ كَانَ لَا يَكَادُ تَقَرُّ يَدُ أَحَدٍ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْحُمَّى، فَقَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَشَدَّ بَلَاءً مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَا يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ كَذَلِكَ يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ».

'অবস্থা এতই নাজুক ছিলো যে, জ্বরের প্রচ- তাপের কারণে তাঁর শরীরে করো হাত পর্যন্ত রাখা যাচ্ছিলো না। এ-অবস্থায় তিনি বললেন, 'নবীবর্গ থেকে কঠিন বিপদগ্রস্ত কেউ হতে পারে না, এখন

---

[১] আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস*, খ. ২, পৃ. ১৬২

যেমন আমার কঠিন কষ্ট হচ্ছে। আর সে সুবাদে আমার জন্য সওয়াবও কয়েকগুণ বেশি।"[১]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا؟ قَالَ: «أَجَلْ، إِنِّيْ أُوعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ» قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا».

'আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি প্রচ- জ্বরে ভুগছিলেন। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো প্রচ- জ্বরে ভুগছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি তোমাদের দুজন লোক যা ভোগে তা ভুগছি।' আমি বললাম, এটি তো এই কারণে যে, আপনার দু'গুণ পুরস্কার রয়েছে। তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ ঠিক তাই। যখন কোনো মুসলিম কাঁটাবিদ্ধ হন কিংবা তার চেয়ে কমবেশি কষ্ট পেয়ে থাকেন, আল্লাহ সে পরিমাণে তার গোনাহ মাফ করেন। যেভাবে গাছ তার জীর্ণপাতা ঝেড়ে ফেলে।"[২]

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا اشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، قَالَ: «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ، فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِيْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّىٰ طَفِقَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَامَ يَوْمَئِذٍ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا يَوْمَ أُحُدٍ.

---

[১] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস: ২০৩৭, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১১৫ ও ১১৮, হাদীস: ৫৬৪৮ ও ৫৬৬০

'আর হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম -এর অসুস্থতা প্রচ-ভাবে বেড়ে যায়, তখন তিনি বললেন, 'আমার গায়ে মুখের বাঁধন খোলা হয়নি এমন সাত বালতি পানি ঢালো এতে বোধহয় কিছুটা আরাম অনুভব করব এবং লোকজনের সাথে কথা বলতে পারব।' হযরত আয়িশা বলেন, এরপর তাঁকে হযরত হাফসা -এর এক বড় তাম্র পাত্রে বসানো হয়। তারপর আমরা তাঁর মাথায় পানি ঢালতে থাকলাম। একসময় তিনি (থামতে) ইশারা করলেন, তোমারা তোমাদের কাজ করছো। এরপর তিনি জনসমক্ষে বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর নবী করীম দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন, ভাষণে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন, নিজের গুণগান করলেন এবং উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।'[১]

নবী করীম -এর প্রচ- অসুস্থতার আলোচনা

নবী করীম -এর প্রচ- অসুস্থতার সময়কাল ছিলো ১২দিন মতান্তরে ১৮ দিন। আর হযরত রাসূলুল্লাহ অসুস্থতার সময় ইরশাদ করেন,

«سُدُّوْا هَذِهِ الْأَبْوَابَ الشَّوَارِعَ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ أَبِيْ بَكْرٍ فَإِنِّيْ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَحْسَنَ يَدًا عِنْدِيْ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ».

'মসজিদে আসা-যাওয়ার এসব দরজা বন্ধ করে দাও, হযরত আবু বকর -এর দরজাটি ছাড়া। কারণ সাহাবাদের মধ্যে আবু বকরের চেয়ে আমার সর্বাধিক উপকারী ব্যক্তি হিসেবে কাউকে জানি না।'[২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

«سُدُّوْا عَنِّيْ كُلَّ خَوْخَةٍ فِيْ هَذَا الْمَسْجِدِ، غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِيْ بَكْرٍ».

'আমার রুম থেকে মসজিদ দিকের সব জানালা বন্ধ করে দাও, আবু বকরের জানালাটি ছাড়া।'[৩]

---

[১] ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ১৪, পৃ. ৫৬১, হাদীস: ৬৫৯৬

[২] আদ-দুলাওয়ী, *আল-কুনা ওয়াল আসমা*, খ. ২, পৃ. ৪৭৫, হাদীস: ৮৫৮, হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১০০, হাদীস: ৪৬৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ، جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله! ائْذَنْ لِيْ فَأُمَرِّضُكَ وَأَكُوْنُ الَّذِيْ أَقُومُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنِّيْ إِنْ لَمْ أَحْمِلْ أَزْوَاجِيْ وَبَنَاتِيْ وَأَهْلَ بَيْتِيْ عِلَاجِيْ ازْدَادَتْ مُصِيبَتِيْ عَلَيْهِمْ عِظَمًا، وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُكَ عَلَى الله».

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সেবাশুশ্রূষার জন্য আমাকে আপনার খিদমতে থাকার অনুমতি প্রদান করুন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আবু বকর! যদি আমার সহধর্মিনী, কন্যা ও ঘরের সদস্যদেরকে আমার সেবা-শুশ্রূষা থেকে অব্যাহতি দেই তবে আমার কারণে তারা বেশ ব্যথিত হবে। তোমার সওয়াব আল্লাহর দায়িত্বে অর্পিত হয়ে গেছে।"[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থ সময়ের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার সময় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে,

«إِنَّ الله ﷻ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ الله»، فَبَكَىٰ أَبُوْ بَكْرٍ، فَعَجِبْنَا مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ: أَنْ أُخْبِرَ رَسُوْلُ الله ﷺ عَبْدًا خَيَّرَهُ الله، وَكَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أَعْلَمَنَا».

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর প্রিয় এক বান্দাকে পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং এর মধ্যে রক্ষিত নিয়মতসমূহ এ-দু'য়ের মধ্যে যেকোনো একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দান করেছেন। আর ওই বান্দা আল্লাহর নিকট রক্ষিত নিয়মতসমূহ গ্রহণ করেছেন। একথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থা দেখে বিস্মিত হলাম। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বান্দার খবর দিচ্ছেন যাকে এভাবে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে (তাতে কান্নার কারণ কী

---

[১] ইবনুল জওযী, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৪, পৃ. ২৬, হাদীস: ৪০৬, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

থাকতে পারে?) কিন্তু আমরা পরে বুঝতে পারলাম যে, ওই বান্দা ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ﷺ। আর হযরত আবু বকর رضي الله عنه আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।'[১]

وَأَنَّهُ أَعْتَقَ فِيْ مَرَضِهِ أَرْبَعِيْنَ نَفْسًا.

'আর নবী করীম ﷺ অসুস্থতার সময় ৪০ জন গোলাম আযাদ করেন।'[২]

আরও বর্ণিত আছে,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَشْتَكِ شَكْوَى إِلَّا سَأَلَ اللهَ ﷻ الْعَافِيَةَ. حَتَّىٰ كَانَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِالشِّفَاءِ، بَلْ عَاتَبَ نَفْسَهُ وَشَرَعَ يَقُوْلُ: «يَا نَفْسُ! مَا لَكِ تَلُوْذِيْنَ كُلَّ مَلَاذٍ».

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হলে তবে তিনি আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করতেন। কিন্তু যে-অসুস্থতায় তিনি ওফাত পান সে-রোগে তিনি সুস্থতার জন্য দুআ করেননি। বরং তিনি নিজেকে সতর্ক করে বলছিলেন যে, 'ওহে নফস (প্রবৃত্তি)! কী হলো তোমার, সবত্রই তুমি আশ্রয় প্রার্থনা করবে!''[৩]

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা সময়ের ঘটনা:

إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَىٰ فَاطِمَةَ حَدِيْثًا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيَّ: «إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৪, হাদীস: ৩৬৫৪, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] ইবনুল জওযী, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৪, পৃ. ৩৩, হাদীস: ৪১৭, হযরত ওয়াহিব ইবনুল আকীম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৩] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২১০, হাদীস: ৩১৪৭, হযরত আবুল হুওয়ায়রিস আবদুর রহমান ইবনে মুআবিয়া আল-আনসারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

ইমাম আল-বায়হাকি رحمه الله বলেন, هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ অর্থাৎ এটি একটি বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

يُعَارِضُنِيْ بِالْقُرْآنِ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِيَ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا وَقَدْ حَضَرَ أَجَلِيْ، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِيْ لَحَاقًا بِيْ»، فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ»، فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

'নবী করীম ﷺ হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে অস্ফুটভাবে কি যেন বললেন, এতে তিনি কাঁদ লাগলেন। এরপর অস্ফুটভাবে আবারও কিছু একটা বললেন, এতে তিনি হাসতে শুরু করেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করি, জবাবে তিনি বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রহস্য ফাঁস করতে চাই না। নবী করীম ﷺ-এর ওফাতের পর একসময় ফাতিমাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে অস্ফুটভাবে বলেছেন, 'প্রতিবছর হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে একবার কুরআন শুনিয়ে থাকেন কিন্তু এ-বছর শুনিয়েছেন দু'বার। এ থেকে আমি এই আভাস পাই যে, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আর আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সবার আগে আমার কাছে পৌছুবে।' একথা শুনে আমি কাঁদতে শুরু করি। এরপর তিনি বললেন, 'তুমি কি খুশি নও যে, তুমি এ-উম্মতের নারীকুল বা মুমিন নারীকুলের সরদার হবে?' একথা শুনে আমি হাসতে থাকি।'[১]

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা সময়ের ঘটনা: নবী করীম ﷺ অসুস্থতার দিনগুলোতে লোকজনের ইমামতি করেছেন। তিনদিন ইমামতিতে তিনি অপারগ ছিলেন।

কারো মতে, ১৭ ওয়াক্ত সালাতে তিনি অপারগ ছিলেন। তারপর সালাতের আযান হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যে-সালাতে নবী করীম ﷺ ইমামতি করেননি তা ছিলো সালাতুল ইশা।[২] তিনি বললেন,

«مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ».

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, দারু তূক আন-নাজাত (১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ২০৩, হাদীস: ৩৬২৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯০৫, হাদীস: ৯৯ (২৪৫০), হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত

[২] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬২–১৬৩

'হযরত আবু বকর -কে বলো, তিনি যেন লোকজনের ইমামতি করেন।'[১]

عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: «مُرِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوْا»، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَمْعَةَ، فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: صَلِّ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ، فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ وَكَانَ جَهِيْرَ الصَّوْتِ، فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ؟» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: «يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ، لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُوْ بَكْرٍ».

'ইমাম আয-যুহরী থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ -কে বললেন, 'লোকজনকে বলো, সালাত পড়ে নিতে।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ বেরুলেন, পথে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব -এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে বললেন, লোকজনের সালাত পড়িয়ে দিন। অতঃপর হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) সালাত পড়ালেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে সালাত পড়ালেন, যেহেতু তিনি উঁচুকণ্ঠী ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কণ্ঠস্বর কি ওমরের নয়'? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও মুমিনগণ এটা পছন্দ করেন না। তোমরা আবু বকরকে বলবে ইমামতি করতে।''[২]

অনুরূপ বিবৃত হয়েছে *আল-মুনতাকি* কিতাবে। *শরহুল মাওয়াকিফে* আছে,

أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِيْ زَمَانِ مَرَضِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدَ اللهِ بْنَ زَمْعَةَ: «اُخْرُجْ، وَقُلْ لِأَبِيْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ»، فَخَرَجَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلَى الْبَابِ إِلَّا عُمَرَ فِيْ جَمَاعَةٍ لَيْسَ فِيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا

---

[১] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ৬৬৪, হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত

[২] আবদুর রাযযাক আস-সানআনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৫, পৃ. ৪৩২, হাদীস: ৯৫২২

كَبَّرَ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «يَأْبَى اللهُ وَالْمُسْلِمُوْنَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَنِيْ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! مَا أَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَحَدًا.

'নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতার একসময় হযরত বিলাল (রা.) সালাতের আযান ঘোষণা করলে নবী করীম ﷺ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা.)-কে বললেন, 'যাও, আবু বকরকে বল, সালাত পড়াতে।' (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা.)) যখন বেরুচ্ছিলেন দরজায় হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব (রা.))-কেই পাওয়া গেলো, সমবেত লোকজনের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন না। তাই (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা.)) বললেন, হে ওমর! আপনিই লোকজনের সালাতে ইমামতি করুন। অতঃপর যখন তিনি তাকবীর বললেন, তিনি জোরালো গলার লোক ছিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁর (উঁচু কণ্ঠ) শুনে বললেন, 'আল্লাহ ও মুসলিমরা এটা পছন্দ করেন না, তবে আবু বকর (লোকদের সালাত পড়াবে)।' একথা তিনি তিনবার বললেন।[১]

বর্ণনাকারী বলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব (রা.)) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা.)-কে বললেন, তুমি খুব মন্দ কাজ করলে। আমি তো মনে করেছিলাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমাকে নির্দেশ করেছেন আমাকে আদেশ করতে। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা.)) বলেন, না, আল্লাহর কসম! আমার পক্ষ থেকে কাউকে আদেশ করতে নবী করীম ﷺ আমাকে আদেশ করেননি।'[২]

আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ، فَوَقَفَ بِالْبَابِ، فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! الصَّلَاةُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَقَالَ لَهُ: «مُرْ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَخَرَجَ بِلَالٌ

---

[১] আযযুদ্দীন আল-ইযী, *আল-মাওয়াকিফ*, খ. ৩, পৃ. ৬৩০–৬৩১
[২] আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬২–১৬৩

وَيَدُهُ عَلَىٰ أُمِّ رَأْسِهِ، وَهُوَ يُنَادِيْ وَاغَوْثَاهُ وَانْقِطَاعَ رَجَاهُ وَانْكِسَارَ ظَهْرَاهُ! لَيْتَنِيْ لَمْ تَلِدْنِيْ أُمِّيْ، وَإِذَا وَلَدَتْنِيْ لِمَ أَشْهَدُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ هَذَا، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ، فَلَمَّا نَظَرَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَىٰ خِلْوَ الْمَسْجِدِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيْقًا لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ، فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الضَّجَّةَ، وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ! مَا هَذِهِ الضَّجَّةُ»؟ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ لِفَقْدِكَ، فَدَعَا بِعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَانْكَبَّ عَلَيْهِمَا، وَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! أَنْتُمْ فِيْ وِدَاعِ اللهِ وَكَنَفِهِ، وَاللهِ خَلِيْفَتِيْ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَحِفْظِ طَاعَتِهِ، فَإِنِّيْ مَفَارِقُ الدُّنْيَا».

'হযরত বিলাল ﷺ আযান দেওয়ার পর নবী করীম ﷺ-এর দরজায় গিয়ে বললেন, আস-সালামু আলায়কুম ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ওহে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন, 'আবু বকরকে বল, লোকজনকে নিয়ে সালাত পড়াতে।' একথা শুনে হযরত বিলাল ﷺ হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরে বেরিয়ে আসলেন আর বললেন, হে ফরিয়াদ! আশা-আকাঙ্ক্ষা চুরমার হয়ে গেছে, কোমর ভেঙে গেছে। যদি আমার মা আমাকে জন্ম না দিতেন তবেই উত্তম হতো, যখন তিনি আমাকে জন্ম দিলেনই তবে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমন অসুস্থাবস্থা কেন আমাকে দেখতে হল! এরপর তিনি মসজিদে এসে বললেন, হে আবু বকর! হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে সালাতে ইমামতি করার হুকুম করেছেন। অতঃপর হযরত আবু বকর ﷺ যখন মসজিদে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শূন্যতা দেখতে পেলেন—তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ—তাই এতে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। ফলে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে শোরগোল পড়ে গেলো। হট্টগোলের আওয়াজ শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ

বললেন, 'হে ফাতিমা! এই হইচই কিসের'? তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনুপস্থিতির কারণে মুসলিমরা হায়-হুতাশ করছে। তখন তিনি হযরত আলী رضي الله عنه ও হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের কাঁধে ভর করে মসজিদে গেলেন এবং সালাত পড়ালেন। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে মুসলিম-সমাজ! তোমাদেরকে আল্লাহর নিরাপত্তা ও তাঁর হিফাযতে সোপর্দ করলাম। আল্লাহর কসম! আমার একজন খলীফা থাকবে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর আনুগত্যে করো সুদৃঢ় থেকো। কারণ আমি শিগগিরই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি।'"[১]

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ وَإِنَّهُ مَتَىٰ يَقُوْمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُوْلِيْ لَهُ: فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ وَإِنَّهُ مَتَىٰ يَقُوْمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ، مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَ: فَأَمَرُوْا أَبَا بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَ الصَّلَاةَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، حَتَّىٰ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، إِنْ قُمْ كَمَا أَنْتَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِيْ بَكْرٍ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِيْ أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ.

---

[১] আদ-দিয়ার বকরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৩

'আর হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, হযরত বিলাল তাঁকে সালাতের কথা জানাতে তাঁর কাছে আসলেন, তিনি বললেন, 'আবু বকরকে লোকজনকে নিয়ে সালাত পড়াতে বলো।' (হযরত আয়িশা) বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হযরত আবু বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়ালে লোকজনকে (কিরাআত) শোনাতে সক্ষম হবেন না। আপনি যদি হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব)-কে নির্দেশ দিতেন! তিনি বললেন, 'লোকজনকে নিয়ে সালাত পড়ার জন্য আবু বকরকে নির্দেশ দাও।' (হযরত আয়িশা) বললেন, এরপর আমি হাফসা -কে বললাম, তুমি ব্যাপারটি নিয়ে নবী করীম -এর সাথে কথা বল। তখন হযরত হাফসা তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হযরত আবু বকর তো অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, লোকজনকে (কিরাআত) শোনাতে সক্ষম হবেন না। আপনি যদি হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব)-কে নির্দেশ দিতেন! তখন নবী করীম বললেন, 'তোমরা তো দেখছি হযরত ইউসুফ -এর স্ত্রীদের মতোই। যাও! আবু বকরকে লোকজনকে নিয়ে সালাত পড়তে বলো।' বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর -কে ব্যাপারটি অবগত করা হলো। অতঃপর তিনি যখন সালাত আরম্ভ করলেন, নবী করীম কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে দুজনের কাঁধে ভর করে মসজিদে আসলেন। তাঁর উভয় পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মাটিতে দাগ কেটে যাচ্ছিলো। হযরত আবু বকর তাঁর আগমন টের পেয়ে পিছে সরে আসতে প্রস্তুত হলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ তাঁকে ইশারায় বললেন, 'নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থেকো।' নবী করীম এসে হযরত আবু বকর -এর বামপাশে বসলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ বসে বসে লোকজনের সালাত পড়ালেন এবং হযরত আবু বকর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। হযরত আবু বকর নবী করীম -এর সালাতের সাথে ইকতিদা করলেন আর লোকজন হযরত আবু বকর -এর সালাতের সাথে ইকতিদা করলো।'[১]

ইবনে হিশামের *সিরাত*-গ্রন্থে আছে,

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩১৩, হাদীস: ৯৫ (৪১৮)

فَلَمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَفَرَّجَ النَّاسُ، فَعَرَفَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَصْنَعُوْا ذَلِكَ إِلَّا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَنَكَصَ عَنْ مُصَلَّاهُ، فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ظَهْرِهِ، وَقَالَ: «صَلِّ بِالنَّاسِ»، وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ، فَصَلَّى قَاعِدًا عَنْ يَمِيْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، فَلَمَّا فَرَغُوْا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أَرَاكَ قَدْ أَصْبَحْتَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ كَمَا تُحِبُّ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ بِنْتِ خَارِجَةَ، أَفَآتِيْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى أَهْلِهِ بِالسُّنْحِ.

'যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন, তখন লোকজন দুপাশে সরে যেতে লাগলো। ব্যাপারটি হযরত আবু বকর ؓ বুঝে গেলেন। কারণ লোকজন কেবল হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন-উপলক্ষ্যে এমনটি করে থাকে। তাই তিনি নিজের সালাতের জায়গা থেকে পিছনে সরতে চাইলেন। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেন, 'লোকজন নিয়ে সালাত পড়।' আর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (হযরত আবু বকর ؓর) পাশে বসে পড়লেন এবং হযরত আবু বকর ؓ-এর ডানপাশে বসে বসে নবী করীম ﷺ সালাত পড়লেন। সালাত শেষ হওয়ার পর হযরত আবু বকর ؓ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া আপনার কিছুটা সুস্থতা লক্ষ করছি। আর আজকের এই দিনটি বিনত খারিজার পেটে পীড়ার দিন, আমি কি তাঁর কাছে যেতে পারি? নবী করীম ﷺ বললেন, 'নিশ্চয়ই।' অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বাসায় প্রবেশ করেন এবং হযরত আবু বকর ؓ সুনখ নামক স্থানে অবস্থানরত নিজের পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।'[১]

বস্তুত উল্লিখিত সবকটি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু বকর ؓ-ই এ-সময় ইমাম ছিলেন। আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

---

[১] ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাওয়িয়া*, খ. ২, পৃ. ৬৫৩–৬৫৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা ؓ থেকে বর্ণিত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّتِهِ إِلَّا خَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ وَصَلَّىٰ خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ فِيْ سَفَرٍ رَّكْعَةً وَّاحِدَةً.

'হযরত (আবদুল্লাহ ইবনে) আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতের মধ্যে কেবল আবু বকরের পেছনেই সালাত পড়েছেন। একবার সফরকালে আবদুর রহমান ইবনে আওফের পেছনে এক রাকাআত সালাত পড়েছিলেন।'[১]

وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرِ غَزْوَةٍ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَدْ صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً وَّرَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ مَعَ النَّاسِ خَلْفَهُ، وَأَتَمَّ الَّذِيْ فَاتَهُ وَقَالَ: «مَا قُبِضَ نَبِيٌّ حَتَّىٰ يُصَلِّيْ خَلْفَ رَجُلٍ صَالِحٍ مِّنْ أُمَّتِهِ».

'হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা (হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধাভিযানে সঙ্গে ছিলেন। সফরে নবী করীম ﷺ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যান। এদিকে লোকেরা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর ইমামতিতে সালাত শুরু করে দেয়। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) লোকজনকে নিয়ে এক রাকাআত সালাত পড়িয়েও ফেললেন, অতঃপর নবী করীম ﷺ আসলেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর) পেছনে সালাত আদায় করেন। আর যা তিনি ছেড়েছিলেন তা পুরো করলেন এবং বললেন, 'কোনো নবীরই নিজের উম্মতের কোনো পূণ্যবান ব্যক্তির পেছনে সালাত না পড়া ছাড়া ওফাত হয়নি।'[২]

---

[১] আযুদুদ্দীন আল-ইজী, *আল-মাওয়াকিফ*, খ. ৩, পৃ. ৬০১
[২] আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৩–১৬৪

عَنِ الْمُغِيْرَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنَسِيْتَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ نَسِيْتَ، بِهٰذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ ﷻ».

'হযরত আল-মুগীরা ﵁ থেকে বর্ণিত, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বললেন, 'বরং তুমিই ভুলে গিয়েছ। আমাকে আমার রব ﷻ এ-রকম করার নির্দেশ দিয়েছেন।'[১]

এই বর্ণনাটি অনুরূপ অর্থে ইমাম আবু দাউদ ﵀[২] ও ইমাম আদ-দারিমী ﵀ও বর্ণনা করেছেন। হযরত আল-মুগীরা ﵁ আরও বলেন,

ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، وَقَدْ قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى رَكْعَتَيْنِ مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْنَا.

'এরপর নবী করীম ﷺ সওয়ারিতে আরোহণ করলে আমিও আরোহণ করলাম। পরে আমরা লোকদের কাছে গিয়ে পৌছুলাম। এ-সময় তাঁরা সালাত পড়ছিলো। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ﵁ তাদেরকে নিয়ে সালাত পড়ছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাদের সাথে এক রাকাআত সালাত শেষ করেছেন। তিনি যখন নবী করীম ﷺ-এর আগমন বুঝতে পারলেন তখন পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাঁকে (সালাত শেষ করার জন্য) ইশারা করলেন। অতএব নবী করীম ﷺ তাঁর সাথে এক রাকাআত পান। (সালাত শেষে) তিনি সালাম ফেরালে নবী করীম ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর এভাবে আমরা যে-রাকাআতটি পাইনি তা পড়ে নিলাম।'[৩]

হাদীসটি ইমাম মুসলিম ﵀[৪] বর্ণনা করেছেন, *আল-মিশকাত*[৫] গ্রন্থেও আলোচিত হয়েছে। আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

---

[১] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৪
[২] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪০, হাদীস : ১৫৬
[৩] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৪
[৪] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৩০, হাদীস: ৮১ (২৭৪)
[৫] আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ১৬০, হাদীস : ৫১৮ (২)

আস-সাফওয়া কিতাবে এটি বিবৃত হয়েছে।[১]

وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَبُوْكَ، قَالَ الْمُغِيْرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ أَخَذْتُ أُهَرِيْقُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ، فَذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَىٰ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

'হযরত আল-মুগীরা ইবনে শুবা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি তাবুক-যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আল-মুগীরা রাযি. বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের পূর্বে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রওনা হলেন। আমি এক ঘটি পানি নিয়ে তাঁর সাথে গেলাম। তিনি যখন প্রয়োজন সেরে ফিরে আসলেন, আমি তাঁর উভয় হাতে পাত্র থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি তাঁর উভয় হাত ও মুখম-ল ধুলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিলো একটি পশমের জুব্বা। অতঃপর তিনি দু'হাত থেকে জুব্বার হাতা সরাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু জুব্বার হাতা সংকীর্ণ বিধায় জুব্বার ভেতর দিক দিয়ে হাত বের করে নিলেন। আর জুব্বাটিকে কাঁধের ওপর রেখে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। আর মাথার অগ্রভাগ, পাগড়ি ও মোজার ওপর মাসহ কলেন। এরপর আমি তাঁর মোজা খুলতে উদ্যত হলে, তিনি বললেন, 'রাখো, আমি পবিত্র অবস্থায় এ-দুট পরিধান করেছিলাম'—এ-বলে তিনি মোজার ওপর মাসহ করলেন।'[২]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

---

[১] ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়া*, খ. ১, পৃ. ১০১

[২] (ক) আদ-দিয়ার বকরী, *তারীখ*, খ. ২, পৃ. ১৬৪; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৩০ ও ৩১৭, হাদীস: ৭৯, ৮১ ও ১০৫ (২৭৪)

عَنْ رَّافِعِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخُرُوْجِ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَّقُوْمَ مَقَامَهُ، فَكَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ، وَرُبَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَا دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ خَلْفَهُ، وَلَمْ يُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ غَيْرَهُ إِلَّا أَنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَكْعَةً وَّاحِدَةً فِيْ سَفَرٍ.

'হযরত রাফে ইবনে আমর ইবনে ওবাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা (হযরত আমর ইবনে ওবাইদ رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণে নবী করীম ﷺ যখন বেরুতে পারছিলেন না, তখন হযরত আবু বকর رضي الله عنه-কে তাঁর আসন গ্রহণ করতে হুকুম দেন। তাই হযরত আবু বকর رضي الله عنه লোকজন নিয়ে সালাত পড়ছিলেন। একসময় হযরত আবু বকর رضي الله عنه সালাত শুরুর পরপর নবী করীম ﷺ বের হন এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেন। তিনি (হযরত আবু বকর رضي الله عنه) ব্যতীত আর কারো পেছনে নবী করীম ﷺ সালাত পড়েননি, তবে এক সফরে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ رضي الله عنه-এর পেছনে এক রাকআত সালাত পড়েছিলেন।'[১]

উসদুল গাবা গ্রন্থে এসেছে,

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ: قَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَّصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، وَإِنِّيْ شَاهِدٌ غَيْرُ غَائِبٍ، وَّإِنِّيْ لَصَحِيْحٌ غَيْرُ مَرِيْضٍ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُّقَدِّمَنِيْ لَقَدَّمَنِيْ، فَرَضِيْنَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ لِدِيْنِنَا.

'হযরত হাসান আল-বাসারী থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকর رضي الله عنه-কে ইমাম নিয়োগ করেন এবং তিনি লোকজনকে নিয়ে সালাত পড়ান। ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী, আমি ছিলাম সম্পূর্ণ সুস্থ, অসুস্থ ছিলাম না। যদি নবী করীম ﷺ আমাকে

---

[১] আদ-দিয়ার বকরী, *খামীস*, খ. ২, পৃ. ১৬৪

ইমাম নিয়োগ করতেন, আমি ইমামতি করতাম। তবে আমরা আমাদের পার্থিব ব্যাপার সেটিই পছন্দ করি যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের দীনি ব্যাপারে পছন্দ করেন।'[১]

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা সময়ের ঘটনা

বৃহস্পতিবারের দিকে নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা প্রচ-ভাবে বেড়ে যায়। এই পর্যায়ে তিনি একটি বিশেষ অসিয়ত লেখার ইচ্ছা পোষণ করে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ؓ-কে বললেন,

«اَئْتِنِيْ بِكَتِفٍ أَوْ لَوْحٍ حَتَّىٰ أَكْتُبَ لِأَبِيْ بَكْرٍ كِتَابًا لَّا يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ»، فَلَمَّا ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَقُوْمَ، قَالَ: «أَبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ أَنْ يُخْتَلَفَ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ!».

"একটি পাত বা ফলক নিয়ে এসো। যেখানে আমি আবু বকরের জন্যে একটি পত্র লিখবো, এতে তাঁর ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকবে না।' ফলক আনতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ؓ যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, 'হে আবু বকর! তোমার ব্যাপারে কোনো বিতর্ক করা স্বয়ং আল্লাহ ও মুমিনগণ অপছন্দ করেন।"[২]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَـمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْـخَطَّابِ، قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَـلُ أَكْتُبْ لَكُـمْ كِتَابًـا لَّا تَـضِلُّوْا بَعْدَهُ؟»، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوْا، مِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ: قَدِّمُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كِتَابًا لَّا تَـضِلُّوْا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْإِخْتِلَافَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قُوْمُوْا عَنِّيْ»، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا

---

[১] ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ৩, পৃ. ৩২৮, বর্ণনা: ৮৪০

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ. ৪০, পৃ. ২৩৫, হাদীস: ২৪১৯৯, হযরত আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত

حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ».

'হযরত (আবদুল্লাহ ইবনে) আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন ঘরের মধ্যে অনেক মানুষের সমাবেশ ছিলো। যাঁদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ও ছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেবো, যাতে পরবর্তীতে তোমরা বিভ্রান্তর না হও। তখন হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব ﵁) বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর রোগ যাতনা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, আর তোমাদের নিকট কুরআন বিদ্যমান। আর আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ-সময় আহলে বায়তের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো। তাঁরা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলেন, কাগজ আনা হোক এবং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেবেন, যাতে পরবর্তীতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আবার তাঁদের মধ্যে অন্যরা হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব ﵁) যা বললেন, তা বলে যেতে লাগলেন। এভাবে তাঁদের বাকবিত- ও মতানৈক্য বেড়ে চললো। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা উঠে যাও।' হযরত (আবদুল্লাহ ইবনে) আব্বাস ﵄ বলেন, বড় মসিবত হলো লোকজনের সেই মতানৈক্য ও তর্ক-বিতর্ক, যা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সেই লিখে দেওয়ার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো।'[১]

এটি ইমাম আল-বুখারী ﵀ বর্ণনা করেছেন।

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা সময়ের ঘটনা

নবী করীম ﷺ-এর কাছে কেবল ৭টি দিনার ছিলো। সেগুলো খরচ হয়ে তবে তাঁর ওফাত হয়।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبْعَةُ دَنَانِيْرَ وَضَعَهَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ فِيْ مَرَضِهِ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! ابْعَثِيْ بِالذَّهَبِ»، ثُمَّ

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭ ও ৯, পৃ. ১২০ ও ১১১, হাদীস: ৫৬৬৯ ও ৭৩৬৬

أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَشَغَلَ عَائِشَةَ مَا بِهِ، حَتَّىٰ قَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَٰلِكَ يُغْمَىٰ عَلَيْهِ، وتَشْغَلُ عَائِشَةَ مَا بِهِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ عَلِيٍّ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، ثُمَّ أَمْسَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ فِيْ حَدِيْدِ الْـمَوْتِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى امْرَأَةٍ مِّنْ النِّسَاءِ بِمِصْبَاحِهَا، فَقَالَتْ: اقْطُرِي لَنَا فِيْ مِصْبَاحِنَا مِنْ عِنْدِكَ السَّمْنِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ حَدِيْدِ الْـمَوْتِ.

'হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মাত্র ৭টি দিনার ছিল যা তিনি হযরত আয়িশা (রা.)-এর কাছে জমা রেখেছিলেন। অসুস্থতার সময় হযরত আয়িশা (রা.)-কে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমার কাছে রাখা স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে এসো।' এর পরপরই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তখন হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর শুশ্রূষায় লেগে যান। নবী করীম ﷺ তিন তিনবার এভাবে বললেন আর প্রতিবারেই তিনি অজ্ঞান হারান এবং হযরত আয়িশা (রা.)ও তাঁর শুশ্রূষায় লেগেছিলেন। পরে নবী করীম ﷺ দিনারগুলো হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন আর তিনি সেসব সাদকা করে দেন। এরপর সোমবার রাতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ লৌহ কঠিন মৃত্যু-সন্ধ্যায় পৌছুলেন, সেদিন হযরত আয়িশা (রা.) উম্মুল মুমিনীনদের কারো কাছে তাঁর চেরাগটি পাঠিয়ে বলেছিলেন, আমার জন্য আমার চেরাগে তোমাদের পক্ষ থেকে কিছু তেল দাও। আর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এখন লৌহ কঠিন মৃত্যু-সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছেন।'[১]

অপর এক বর্ণনা মতে,

قَالَ لِعَائِشَةَ وَهِيَ مُسْنِدَتُهُ إِلَىٰ صَدْرِهَا: «يَا عَائِشَةُ! مَا فَعَلَتِ تِلْكَ الذَّهَبُ»؟ قَالَتْ: هُوَ عِنْدِيْ، قَالَ: «فَأَنْفِقِيْهِ»، فَغُشِيَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ صَدْرِهَا، فَلَمَّا أَفَاقَ ﷺ قَالَ: «أَنْفَقْتِ تِلْكَ الذَّهَبَ يَا

[১] আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ১৯৮, হাদীস: ৫৯৯০

عَائِشَةُ»؟ قَالَتْ: لَا، فَدَعَا بِهَا، وَوَضَعَهَا عَلَى كَفِّهِ، فَقَالَ: «مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِّهِ أَنْ لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ»؟ فَأَنْفَقَهَا كُلَّهَا وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

'নবী করীম ﷺ হযরত আয়িশা رضي الله عنها-এর কোলে নিজের মাথা মুবারক হেলিয়ে তাঁকে বললেন, 'হে আয়িশা! স্বর্ণমুদ্রাগুলোর কী করেছিলে? তিনি জবাব দিলেন যে, সেগুলো আমার কাছে আছে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, 'হে আয়িশা! সেসব স্বর্ণমুদ্রা দান করে দাও।' এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ অজ্ঞান হয়ে যান। সে-সময় নবী করীম ﷺ হযরত আয়িশা رضي الله عنها-এর কোলে মাথা রাখা ছিলেন। যখন নবী করীম আলায়হিস সালাত ওয়াস সালামের জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি পুনঃজিজ্ঞেস করলেন, 'হে আয়িশা! স্বর্ণমুদ্রাগুলো দান করে দিয়েছো'? তিনি জবাব দিলেন, না! অতঃপর তিনি মুদ্রাগুলো তলব করলেন এবং হাতে নিয়ে বললেন, 'রব সম্পর্কে মুহাম্মদের ধারণা কী এই যে, তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন অথচ এসব তাঁর কাছে গচ্ছিত থাকবে!' অতঃপর তিনি সবগুলো মুদ্রা দান করে দেন আর এই দিনই তিনি ইন্তিকাল করেন।'[১]

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা সময়ের ঘটনা

ওফাতের সময় নবী করীম ﷺ-এর স্বাধীন পছন্দ প্রসঙ্গ।

قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَسْمَعُ: أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي آخِرِ مَرَضِهِ يَقُولُ: «مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا»، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

'হযরত আয়িশা رضي الله عنها বলেন, আমি শুনেছি যে, ইহকাল ও পরকালের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ারপূর্ব কোনো নবীর ওফাত হয়নি। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর অন্তিম দিনগুলোয় বলতে শুনেছি যে, 'নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পূণ্যবান ব্যক্তিবর্গ যাদের আপনি পুরস্কৃত করেছেন তাঁদের সাথে মিলিত করুন; বন্ধু হিসেবে তারাই

[১] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২০৯, হাদীস: ২১৩৪

উত্তম।' এতে আমার ধারণা হলো, তিনিও অনুরূপ ইখতিয়ার লাভ করেছেন।'[১]

অন্য এক বর্ণনা মতে,

«مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ فِي الْجَنَّةِ ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾﴾» [النساء].

'জান্নাতে মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে; 'নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পূণ্যবান ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন তাঁদের সহযাত্রী করুন; বন্ধু হিসেবে তারাই উত্তম।''[২]

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা সময়ের ঘটনা

ওফাতের পূর্বে নবী করীম ﷺ-এর মিসওয়াক ব্যবহার প্রসঙ্গ। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ فِيْ بَيْتِيْ، وَفِيْ يَوْمِيْ، وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ.

'হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল করেছেন আমার ঘরে, আমার পালায়; আমার কোল ও বুকের মাঝে।'[৩]

অপর বর্ণনা মতে,

بَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ.

'আমার চিবুক ও আমার তুথনীর মাঝে।'[৪]

وَأَنَّ اللهَ ﷻ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: وَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ، وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ

---

[১] আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৭০৬৬

[২] (ক) আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৬৯; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪০, পৃ. ৫১০, হাদীস: ২৪৪৫৪, হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ১৩, হাদীস: ৪৪৪৯

[৪] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ১২, হাদীস: ৪৪৪৬

إِلَيْهِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِالرَّأْسِ: «أَنْ نَعَمْ»، فَتَنَاوَلْتُهُ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَنْ نَعَمْ»، فَلَيَّنْتُهُ، فَأَمَرَّهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ، وَيَقُوْلُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ: «فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلَىٰ»، حَتَّىٰ قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ.

'নবী করীম -এর ইন্তিকালের সময় আল্লাহ আমার থুথু তাঁর থুথুর সাথে মিশ্রিত করে দেন। এ-সময় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আমার নিকট প্রবেশ করেন, তাঁর হাতে মিসওয়াক ছিলো। আমি হযরত রাসূলুল্লাহ -কে (আমার বুকে) হেলান লাগান অবস্থায় রেখেছিলাম। আমি লক্ষ করলাম যে, তিনি আবদুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি অনুভব করতে পারলাম যে, নবী করীম মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দেব? তখন তিনি মাথার ইশারায় হ্যাঁ বললেন। তখন আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি মিসওয়াক করলেন। তাঁর সম্মুখে পাত্র অথবা পেয়ালা ছিলো তাতে পানি ছিলো। নবী করীম এর দ্বারা তাঁর চেহারা মসেহ করছিলেন এবং বলছিলেন, «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» (আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, সত্যিই মৃত্যুযন্ত্রণা কঠিন।) তারপর হাত উপর দিকে উত্তোলন করে বলছিলেন, 'আমি মহান বন্ধুর সাথে মিলিত হবো।' এ-অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হলো আর হাত শিথিল হয়ে গেল।'[১]

ইমাম আল-হাকিম ও ইমাম ইবনে সা'দ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

إِنَّهُ ﷺ مَاتَ وَرَأْسُهُ فِيْ حِجْرِ عَلِيٍّ.

'নবী করীম হযরত আলী -এর কোলে মাথা মুবারক রেখে ইন্তিকাল করেন।'[২]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ১২, হাদীস: ৪৪৪৯

[২] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৩০, হাদীস: ২২১৯ ও ২২২০

হাফিয ইবনে হাজর (আল-আসকলানী)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এর সবকটি সূত্রই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়, তাই বর্ণনাগুলো বিবেচনায় আনার কিছু নেই।[১]

নবী করীম -এর অসুস্থতা সময়ের ঘটনা

সোমবার নবী করীম পর্দা সরিয়ে দেখতে পেলেন যে, লোকজন ফজরের সালাত আদায় করছে।

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ فِيْ وَجَعِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِي الصَّلَاةِ، وَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ، سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَكَصَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، فَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ، فَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ.

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ -এর অন্তিম রোগের সময় হযরত আবু বকর সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। অবশেষে যখন সোমবার এলো এবং তারা সালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হলো, তখন নবী করীম হুজরা শরীফের পরদা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর চেহারা যেন কুরআনে করীমের পৃষ্ঠা(-এর ন্যায় ঝলমল করছিলো)। তিনি মুচকি হাসলেন। নবী -কে দেখতে পেয়ে আমরা খুশিতে প্রায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম এবং হযরত আবু বকর কাতারে দাঁড়ানোর জন্য পিছন দিকে সরে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নবী করীম হয়তো সালাতে আসবেন। নবী করীম আমাদেরকে ইশারায় বললেন যে, তোমরা সালাত পূর্ণ করে নাও। এরপর তিনি পরদা ফেলে দিলেন। সেদিনই তিনি ইন্তিকাল করেন।'[২]

---

[১] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ৮, পৃ. ১৩৯

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৩৬–১৩৭, হাদীস: ৬৮০

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা সময়ের ঘটনা প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত আছেঃ

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّعَلِيًّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ، فَلَقِيَهُمَا رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بَارِئًا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ بَعْدُ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا، ثُمَّ خَلَا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ يُخَيَّلُ لِيْ، إِنِّيْ أَعْرِفُ وُجُوْهَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنِّيْ خَائِفٌ أَنْ لَّا يَقُوْمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ وَّجَعِهِ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ، فَلْنَسْأَلْهُ، فَإِنْ يَكُ هٰذَا الْأَمْرُ إِلَيْنَا، فَعَلِمْنَا ذٰلِكَ، وَإِنْ لَّا يَكُنْ إِلَيْنَا أَمَرْنَا أَنْ نَسْتَوْصِيَ بِنَا خَيْرًا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَرَأَيْتَ إِذْ جِئْنَاهُ، فَلَمْ يُعْطِنَاهَا، أَتَرَى النَّاسَ يُعْطُوْنَاهَا، وَاللهِ لَا أَسْأَلُهَا إِيَّاهَا أَبَدًا.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما ও হযরত আলী رضي الله عنه হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতার সময় তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলেন, তখন একলোক তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল হাসান! হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা কী? তিনি বললেন, তাঁর স্বাস্থ্য ভালো আছে। এরপর হযরত আলী رضي الله عنه-কে লক্ষ করে হযরত আব্বাস رضي الله عنه বললেন, তিনদিন পর তুমি নিরাশ্রয় হতে যাচ্ছো! অতঃপর তাঁরা ওই লোক থেকে পৃথক হন তখন তিনি আরও বললেন, আমার ধারনা বরং আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আবদুল মুত্তালিব বংশের সন্তানদের মৃত্যুর সময় চেহারা চামড়া কী রূপ ধারণ করে থাকে। আমার ভয় হচ্ছে এই অসুস্থতা থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝি আর সুস্থ হয়ে উঠবেন না। সুতরাং আমার সাথে চলো, ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করি যে, এ-নেতৃত্ব যেন আমাদের প্রতি অর্পিত হয়; বিষয়টি আমরা জেনে নেবো। যদি আমাদের প্রতি নেতৃত্ব অর্পিত না হয় তবে ভালো কোনো অসিয়ত লিখিয়ে নিতে পারি। হযরত আলী رضي الله عنه তাঁকে বললেন, দেখুন! যদি নবী করীম ﷺ-এর কাছে গেলে আমাকে তিনি নেতৃত্ব অর্পন না করেন তবে আপনি কি মনে করেন লোকেরা আমাকে নেতৃত্ব অর্পন

করবে? আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছে গিয়ে এ-প্রসঙ্গে কিছুই জিজ্ঞেস করব না।'[১]

নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা সময়ের ঘটনা প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত আছে:

نُزُوْلُ جِبْرِيْلَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ مَوْتِهِ بِرِسَالَةٍ مِّنَ اللهِ يَقُوْلُ لَهُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَكَانَ ذٰلِكَ فِيْ يَوْمِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَاسْتِئْذَانُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ.

'নবী করীম ﷺ-এর ওফাতের পূর্ব তিনদিন হযরত জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পত্র নিয়ে আসতেন, যেখানে তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন? ওই দিনগুলো ছিলো: শনি, রবি ও সোমবার। আর সোমবার মালাকুল মওত তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন।'[২]

বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ ﷻ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُوْلُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: «أَجِدُنِيْ وَجِعًا يَا أَمِيْنَ اللهِ».

'হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যে-অসুস্থতার দরুন নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেন সে-দিনগুলোতে জিবরাইল নবী করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আল্লাহ ﷻ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন? জবাবে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর আমানতদার! আমি অসুস্থ।''[৩]

কিছু কিছু বর্ণনায় আছে,

«أَجِدُنِيْ يَا جِبْرِيْلُ مَغْمُوْمًا، وَأَجِدُنِيْ يَا جِبْرِيْلُ مَكْرُوْبًا».

---

[১] আবদুর রায্যাক আস-সানআনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৫, পৃ. ৪৩৫–৪৩৬, হাদীস: ৯৭৫৪

[২] আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৫

[৩] ইবনুল জওযী, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৪, পৃ. ৩৬, হাদীস: ৪২১

রাখা ছিলো, যখনই তাঁর মৃত্যু-কষ্ট অনুভূত হতো সেখান থেকে পানি নিয়ে মুখে ছিটা দিতেন আর বলতেন,

«اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ سَكْرَةِ الْمَوْتِ».

'হে আল্লাহ! মৃত্যু-কষ্টের সময় আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'"[১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا زَالَتْ أُكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَادِنِيْ فَالْآنَ أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِيْ».

'হযরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'খায়বারের (সেই বিষমিশ্রিত) খাবারের উপসর্গ মাঝে মাঝে আমার শরীরে দেখা দেয়। এখনো তা আমার গলার কাটা হয়ে আছে।'[২]

ইমাম ইবনে ইসহাক ﵀ বর্ণনা করেছেন,

إِنَّهُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لَيَرَوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَاتَ شَهِيْدًا مَعَ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ مِنَ النُّبُوَّةِ.

'মুসলিম উম্মাহ বিশ্বাস করে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মহান আল্লাহ নুবুওয়তের মর্যাদার পাশাপাশি শাহাদাত মর্যাদাও নসিব করেছেন।'

আশ-শিফা গ্রন্থে উপর্যুক্ত বক্তব্যটি বিবৃত হয়েছে।[৩]

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

'আর হযরত আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত বাক্যাবলি দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতেন,

---

[১] ইবনুল জওযী, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৪, পৃ. ৩৬, হাদীস: ৪২১
[২] আল-বাযযার, *আল-বাহরুয যাখ্খার*, খ. ১৪, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ৮০০৭
[৩] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা*, খ. ১, পৃ. ৩১৭

'হে জিবরাইল! আমি পেরেশান ছিলাম, হে জিবরাইল! আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম।'[১]

ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ ﷻ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُوْلُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: «أَجِدُنِيْ يَا أَمِيْنَ اللهِ! وَجِعًا»، ثُمَّ جَاءَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَمَعَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ ﷻ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُوْلُ لَكَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: «أَجِدُنِيْ يَا أَمِيْنَ اللهِ! وَجِعًا، مَنْ هَذَا مَعَكَ؟» قَالَ: هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ، وَهَذَا آخِرُ عَهْدِيْ بِالدُّنْيَا بَعْدَكَ، وَآخِرُ عَهْدِكَ بِهَا، وَلَنْ آتِيْ عَلَىٰ هَالِكٍ مِّنْ وَّلَدِ آدَمَ بَعْدَكَ، وَلَنْ أَهْبِطَ الْأَرْضَ إِلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَكَ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ سَكْرَةَ الْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ، فَكُلَّمَا وَجَدَ سَكْرَةَ الْمَوْتِ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، وَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ، وَيَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَىٰ سَكْرَةِ الْمَوْتِ».

'অতঃপর এর পরের দিনও তিনি এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ ﷻ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন? জবাবে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর আমানতদার! আমি অসুস্থ।' অতঃপর তিনি তৃতীয় দিনও আসলেন; তাঁর সাথে মালাকুল মওতও ছিলেন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ ﷻ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন? জবাবে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর আমানতদার! আমি অসুস্থ। আপনার সাথে ইনি কে?' জবাবে জিবরাইল বললেন, ইনি হলেন মালাকুল মওত। আর এবারই দুনিয়ায় আমার সর্বশেষ আগমন এবং আপনার অন্তিম সময়। আপনার পর আর কোনো ধ্বংসশীল মানব-সন্তানের কাছে আমি আসবো না, আপনার পর আর কারো উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবো না। তখন নবী করীম ﷺ-এর ওপর মৃত্যু-কষ্ট অনুভব হচ্ছিলো। তাঁর পাশে একটি পাত্রে পানি

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, খ. ৩, পৃ. ১২৮, হাদীস: ২৮৯০, হযরত হুসাইন ইবনে আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

«أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

'কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের রব! আরোগ্য দান কর এবং তুমিই একমাত্র আরোগ্যদাতা। তোমার আরোগ্য ব্যতীত অন্য কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যাতে রোগের লেশমাত্রও বাকি না থাকে।"

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আল-বুখারী [১] ও ইমাম মুসলিম [২]।

قَالَتْ: فَلَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ بِهَا وَأَقُوْلُهَا، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنِّيْ، ثُمَّ قَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَىٰ»، وَكَانَ هٰذَا آخِرَ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَامِهِ.

'তিনি (হযরত আয়িশা) বলেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন, যে অসুস্থতার মধ্যে তিনি ইন্তিকাল করেন। আমি তাঁর হাত মুবারক ধরে উপর্যুক্ত বাক্যসমূহ পড়ে তাঁর শরীরে মাসেহ করতে থাকলাম। তিনি আমার কাছ থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন,

«رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَىٰ».

'ওহে প্রভু! আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আর আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিত করো।' এই হলো আমার শোনা তাঁর সর্বশেষ বাক্য।"[৩]

হাদীসটি দু'সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৪]

ইমাম আস-সুহায়লী বলেন, আমি ইমাম আল-ওয়াকিদী-এর কোনো কোনো গ্রন্থে দেখেছি যে, নবী করীম ﷺ প্রথম যে-বাক্যটি

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১২১ ও ১৩৪, হাদীস: ৫৬৭৫ ও ৫৭৫০

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭২১–১৭২৩, হাদীস: ৪৬, ৪৭, ৪৮ ও ৪৯ (২১৯১)

[৩] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫১৭, হাদীস: ১৬১৯

[৪] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬ ও ৭, পৃ. ১১ ও ১২১, হাদীস: ৪৪৩৯, ৪৪৪০ ও ৫৬৭৪; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৯৩, হাদীস: ৮৫ (২৪৪৪)

উচ্চারণ করেন তা হলো «اللهُ أَكْبَرُ»। তখন তিনি মহিয়সী হালিমা -এর কাছে দুগ্ধপোষ্য ছিলেন। আর অন্তিম মুহূর্তে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, «الرَّفِيْقُ الْأَعْلَى»।[১]

ইমাম আল-হাকিম বর্ণনা করেন,

مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ، أَنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ ﷺ: «جَلَالُ رَبِّيَ الرَّفِيْعِ».

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক)-এর হাদীস, নবী করীম -এর অন্তিমকালে সর্বশেষ বাক্য ছিল: «جَلَالُ رَبِّيَ الرَّفِيْعِ» 'আমার প্রভুর মর্যাদা সর্বোচ্চ।''[২]

আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩]

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ».

'হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ অন্তিম অঙ্গীকার করে বলেন, 'আরব উপদ্বীপে দুইদুই ধর্মের অবস্থান মেনে নেওয়া হবে না।''[৪]

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ: «الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» حَتَّىٰ جَعَلَ يُلَجْلِجُ فِيْ صَدْرِهِ، وَمَا يَفِيْضُ بِهَا لِسَانُهُ.

'আর উম্মু সালামা বলেন, ওফাতের সময় হযরত রাসূলুল্লাহ -এর সাধারণ অসিয়ত ছিলো, 'সালাত পড় ও তোমাদের অধীনস্ত ক্রীতদাসদের অধিকার রক্ষা কর।' এমনকি নবী করীম বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেও তিনি মুখে অন্য কিছু উচ্চারণ করেননি।[৫]

---

১ আস-সুহায়লী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৫৭৫
২ আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৮, হাদীস: ৪৩৮৭
৩ আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৬৬
৪ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪৩, পৃ. ৩৭১, হাদীস: ২৬৩৫২
৫ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪৪, পৃ. ৩৭২, হাদীস: ২৬৬৮৪

আল-ইকতিফা গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১]

وَعَنْ أَنَسٍ، كَانَتْ وَصِيَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» حَتَّىٰ جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُغَرْغِرُ بِهَا فِيْ صَدْرِهِ، وَمَا يَكَادُ يُفِيْضُ بِهَا لِسَانُهُ.

'আর হযরত আনাস (ইবনে মালিক ﵁) থেকে বর্ণিত, অন্তিমকালে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসিয়ত ছিলো, 'সালাত পড় ও তোমাদের অধীনস্ত ক্রীতদাসদের অধিকার রক্ষা করো।' এমনকি নবী করীম ﷺ-এর বুকে গরগর শব্দ হলেও তাঁর মুখে অন্য কিছু ধ্বনিত হয়নি।'[২]

আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَعِنْدَهُ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ: يَا أَحْمَدُ! هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَىٰ آدَمِيٍّ كَانَ قَبْلَكَ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ آدَمِيٍّ بَعْدَكَ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ يَا جِبْرِيْلُ!»، فَدَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! يَا أَحْمَدُ! إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ، وَأَمَرَنِيْ أَنْ أُطِيْعَكَ فِيْ كُلِّ مَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ؛ إِنْ أَمَرْتَنِيْ أَنْ أَقْبِضَ نَفْسَكَ، قَبَضْتُهَا، وَإِنْ أَمَرْتَنِيْ أَنْ أَتْرُكَهَا، تَرَكْتُهَا، قَالَ: «أَوَتَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ»! قَالَ: بِذَٰلِكَ أُمِرْتُ أَنْ أُطِيْعَكَ فِيْ كُلِّ مَا تَأْمُرُنِيْ، قَالَ جِبْرِيْلُ: إِنَّ اللهَ قَدِ يَشْتَاقُ إِلَيْكَ، قَالَ: «فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ! لَمَّا أُمِرْتَ بِهِ»، قَالَ جِبْرِيْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَا آخِرُ مَوْطِئِيْ الْأَرْضَ، إِنَّمَا كُنْتَ حَاجَتِيْ مِنَ الدُّنْيَا، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

'মালাকুল মওত নবী করীম ﷺ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন হযরত জিবরাইল ﵇ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত জিবরাইল ﵇ বললেন, হে আহমদ! ইনি হলেন মালাকুল মওত; তিনি আপনার

---

[১] আবুর রবী আল-কালাঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৫

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৯, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১২১৬৯

কাছে আসতে অনুমতি প্রার্থনা করছেন। আপনার আগে কোনো মানুষের কাছে যেতে তিনি অনুমতি নেননি এবং আপনার পরেও কোনো মানুষের কাছে যেতে অনুমতি নেবে না। নবী করীম ﷺ বললেন, 'হে জিবরাইল! তাঁকে অনুমতি দাও।' অতঃপর মালাকুল মওত নবী করীম ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হে আহমদ! আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন আপনি যা হুকুম করেন তা তামিল করি; যদি আপনার অনুমতি হয় তাহলে রুহ কবজ করব, যদি আপনি ছেড়ে যেতে আদেশ করেন তবে আমি ফিরে যাবে। জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন, 'হে মালাকুল মওত! তুমি কি এমনটি করবে'? আপনি আমাকে যাই আদেশ করেন তাই পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জিবরাইল বললেন, আল্লাহ আপনার সাক্ষাতে আগ্রহী। নবী করীম ﷺ বললেন, 'হে মালাকুল মওত! তুমি যে-ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছো তা পালন কর।' জিবরাইল বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজকেই পৃথিবীতে আমার সর্বশেষ আগমন। পৃথিবীতে আপনিই একমাত্র উপলক্ষ ছিলেন। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন।'[১]

আল-ইকতিফা[২] গ্রন্থে আছে,

قَالَتْ عَائِشَةُ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ سَحْرِيْ، وَنَحْرِيْ، وَفِيْ نَوْبَتِيْ، وَلَمْ أَظْلِمْ فِيْهِ أَحَدًا، فَمِنْ سَفَهِيْ وَحَدَاثَةِ سِنِّيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُبِضَ وَهُوَ فِيْ حِجْرِيْ، ثُمَّ وَضَعْتُ رَأْسَهُ عَلَىٰ وِسَادَةٍ، وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ، وَأَضْرِبُ وَجْهِيْ.

'হযরত আয়িশা رضي الله عنها বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার কণ্ঠ ও বুকের মধ্য বরাবর মাথা রেখে আমার পালার দিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন। এ-ব্যাপারে তিনি কারো ওপর অবিচার করেননি। আমি তখন কিছুটা আত্মভোলা ও কম বয়সের ছিলাম। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রভুর ডাকে সাড়া দেন তখন

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১২৮, হাদীস: ২৮৯০, হযরত হুসাইন ইবনে আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] আবুর রবী আল-কালায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৬

তিনি আমার কোলেই ছিলেন, পরে আমি তাঁর মাথা মুবারক বালিশের ওপর রেখে দেই এবং তাঁর অন্যান্য সহধর্মিনীদের সাথে কাঁদতে শুরু করি।'[১]

وَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَ التَّعْزِيَةُ يَسْمَعُوْنَ الصَّوْتَ وَالْحِسَّ، وَلَا يَرَوْنَ الشَّخْصَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾ [آل عمران] إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَّخَلَفًا مِّنْ كُلِّ هَالِكٍ وَّدَرَكًا مِّنْ كُلِّ فَائِتٍ، فَبِاللهِ فَثِقُوْا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوْا، وَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَتَدْرُوْنَ مَنْ هَذَا؟ هُوَ الْخَضِرُ ﷺ.

'যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন তখন একজন সান্ত্বনাদানকারী আসেন, তখন তারা আওয়াজ ও কোলাহল শুনতে পেলেন অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না: হে আহলে বায়ত! আপনাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আল্লাহর কিতাবে প্রত্যেকটি বিপদের সময় সান্ত্বনা ও ধৈর্যের উপাদান রয়েছে। আল্লাহ প্রত্যেক ধ্বংসের উত্তম বিনিময়দানকারী এবং প্রত্যেক হারানো বস্তুর ক্ষতিপূরণকারী। সুতরাং তোমরা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে চল এবং তাঁর কাছেই সর্বময় কল্যাণের কামনা কর। কারণ প্রকৃতপক্ষে ওই ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত যে-সওয়াব থেকে বঞ্চিত। আবারও আপনাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। অতঃপর হযরত আলী (رضي الله عنه) বললেন, তোমরা কি জান এই সান্ত্বনাবানী প্রদানকারী লোকটি কে? ইনি হলেন, হযরত খাযির عليه السلام।'

আল-মিশকাতে[২] *দালায়িলুন নুবুওয়াত*[৩] থেকে অনুরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে। আরও বর্ণিত হয়েছে,

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, দার তূক আন-নাজাত (১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ৮১, হাদীস: ৩১০০; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪৩, পৃ. ৩৬৮, হাদীস: ২৬৩৪৮, হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

[২] আত-তাবরীযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৬৮৫, হাদীস: ৫৯৭২ (১৭)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَـمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اجْتَمَعَ أَصْحَابُهُ حَوْلَهُ يَبْكُوْنَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ طَوِيْلٌ شَعْرُ الْـمُنْكِبَيْنِ فِيْ إِزَارٍ وَّرِدَاءٍ، يَتَخَطَّىٰ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ أَخَذَ بِعَضَادَيِ بَابِ الْبَيْتِ، فَبَكَىٰ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَاعَةً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِّنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ، وَّعِوَضًا مِّنْ كُلِّ فَائِتٍ - اَلْـحَدِيْثُ. ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، فَنَظَرُوْا يَمِيْنًا وَّشِمَالًا، فَلَمْ يَرَوْا أَحَدًا، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: لَعَلَّ هَذَا الْـخَضِرُ جَاءَ يُعَزِّيْنَا».

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম ﷺ-এর পাশে সমবেত হয়ে কান্নাকাটি করছিলেন। এ-সময় (দেখতে) লম্বা, কাঁধ পর্যন্ত চুলধারী, লুঙ্গি ও চাদর পরিহিত একব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়েন এবং ঘরের চৌকাট ধরে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ক্ষাণিকক্ষণ কাঁদতে থাকেন। এরপর সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল বিপদ-আপদে সববেদনা এবং প্রত্যেক পরগতের জন্য প্রতিদান রয়েছে। আল-হাদীস। এরপর লোকটি চলে যান। হযরত আবু বকর ﷺ বলেন, লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন সাহাবায়ে কিরাম ডানে-বামে দেখতে লাগলেন, কেউ দেখতে পেলেন না। হযরত আবু বকর ﷺ বললেন, হয়তো এই লোকটি হলেন হযরত খাযির ﷺ; তিনি আমাদেরকে সমবেদনা জানাতে এসেছিলেন।'[২]

ইমাম ইবনে আবুদ দুনয়া ﷺ বর্ণনাটি হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ-এর হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর ওপর মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে।[৩]

---

[১] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৬৭, হাদীস: ৩২৫২
[২] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৮, পৃ. ১০৯-১১০, হাদীস: ৮২১০
[৩] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪-৫৬৫

ইমাম আশ-শাফিয়ী বর্ণনাটি তাঁর *আল-উম্ম* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১] তবে এতে হযরত খাযির -এর প্রসঙ্গ নেই। *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়ায়* এভাবেই রয়েছে।[২]

নবী করীম -এর বয়সের আলোচনা

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُنْزِلَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَبِالْـمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ৪০ বছর বয়সে হযরত রাসূলুল্লাহ -এর ওপর অহি নাযিল হয় (নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হন)। এরপর তিনি মক্কায় ১৩ এবং মদীনায় ১০ বছর অবস্থান করেন। ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।'[৩]

হাদীসটি দু'সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৪] অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর , হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) ও হযরত আয়িশা ৬৩ বছর বয়স পেয়েছেন মর্মে বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে।[৫]

وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ تُوُفِّيَ وَلَهُ سِتُّوْنَ سَنَةً.

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ৬০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।'[৬]

অন্য এক বর্ণনা মতে, ৬৫ বছর।[১] ইমাম আবু হাতিম তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন। ইমাম ইবনে আসাকির -

---

[১] আশ-শাফিয়ী, *আল-উম্ম*, খ. ১, পৃ. ৩১৭

[২] আল-কাস্‌তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৬৫

[৩] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৯১, হাদীস: ৩৬২১

[৪] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৪৫, হাদীস: ৩৮৫১; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮২৬, হাদীস: ১১৭–১১৮ (২৩৫১)

[৫] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮২৫, হাদীস: ১১৪ (২৩৪৮)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ـ ﷺ ـ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ، وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ».

'আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ৬৩, আবু বকর ৬৩ ও ওমর ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।'

[৬] (ক) আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ১৬১, হাদীস: ৫৯০০; (খ) মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৮২৪, হাদীস: ১১৩ (২৩৪৭)

এর ইতিহাসগ্রন্থে আছে, তিনি সাড়ে ৬২ বছর জীবন পেয়েছিলেন। ইমাম ইবনে শায়বা রাহিমাহুল্লাহ-এর গ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে, ৬১ বা ৬২ বছর জীবন পেয়েছিলেন তিনি; আমি জানি না, তিনি ৬৩ বছর জীবন পেয়েছিলেন কি না।[২]

সবগুলো বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করা হয় এভাবে: যারা বয়স ৬৫ বলেছেন, তারা জন্মসাল ও মৃত্যুসালকে যোগ করে নিয়েছেন আর যারা ৬৩ বছর বলেছেন; যা প্রসিদ্ধ, তারা জন্মসাল ও মৃত্যুসালকে হিসেবে ধরেননি। আর যারা ৬০ বছর বলেছেন, তারা খুচরো মাসগুলো হিসেব থেকে বাদ দিয়েছেন। যারা বলেছেন, সাড়ে ৬২ বছর; হয়তো তারা *আল-আকলীল*-বর্ণিত হাদীসের ওপর নির্ভর করেছেন।

এই কথা বর্ণিত আছে যে,

«لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا عَاشَ نِصْفَ عُمْرِ أَخِيْهِ الَّذِيْ كَانَ قَبْلَهُ»، وَقَدْ عَاشَ عِيْسَىٰ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَمِائَةً.

"প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীর অর্ধেক জীবন লাভ করেন।' হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ১২৫ বছর জীবন লাভ করেছিলেন।"[৩]

আর যারা বলেছেন, ৬১ বা ৬২ বছর; তাদের বক্তব্য অনুমান-ভিত্তিক, তথ্য-নির্ভর নয়।

নবী করীম ﷺ নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর পবিত্র মক্কায় কতদিন তিনি অবস্থান করেন এ-ব্যাপারে মতভেদের কারণে উপর্যুক্ত মতবিরোধের সূত্রপাত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত। ইমাম মুগলতায়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর *সিরা*গ্রন্থে অনুরূপই এসেছে।[৪]

নবী করীম ﷺ-এর বিদায় বেলার আলোচনা

হিজরী ১১ সালে ১২ রবিউল আউওয়াল সোমবার দুপরে নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেন। যে-তারিখটিতে তিনি প্রীত-সফর করে মদীনায় পদার্পণ করেছিলেন।

---

[১] মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৮২৭, হাদীস: ১২২ (২৩৫৩)

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، «تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ».

'ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ৬৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন'।

[২] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৬

[৩] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, দ খ. ২, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২০০২, হযরত ইবরাহীম ইবনে যিয়াদ = ইবনে আবু যিয়াদ আল-মুখযুমী রাহিমাহুল্লাহ-মারফাত মুরসাল সূত্রে বর্ণিত

[৪] আলাউদ্দীন মুগলতায়ী, *মুখতাসারুস সিরাতিন নাবাওয়িয়া*, পৃ. ১০৭–১০৯

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وُلِدَ ﷺ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِّنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَقُبِضَ ﷺ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فِيْ كِسَاءٍ مُّلَبَّدٍ».

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সোমবার জন্মলাভ করেছেন, নুবুওয়াত পেয়েছেন সোমবার, মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন সোমবার, হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপিত হয় সোমবার এবং সোমবারেই চাদর জড়ানো অবস্থায় তিনি বিদায় নেন।'[১]

قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُّلَبَّدًا وَإِزَارًا غَلِيْظًا، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوْحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ هَذَيْنِ.

'হযরত আবু বুরদা বলেন, হযরত আয়িশা আমাদেরকে একটি সেলাই করা চাদর ও একটি মোটা লুঙ্গি দেখিয়ে বলেছেন, এ-দু'কাপড়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাণ বায়ু চলে যায়।'[২]

আর *আল-ইকতিফা* গ্রন্থে আছে,

وَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَارْتَفَعَتِ الرَّنَّةُ عَلَيْهِ، وَسَجَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ دَهَشَ النَّاسَ كَمَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، وَطَاشَتْ عُقُوْلُهُمْ، وَافْحَمُوْا، وَاخْتَلَطُوْا، فَمِنْهُمْ مَنْ خَبَلَ، وَمِنْهُمْ مَنِ اصْمَتَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أُقْعِدَ إِلَى الْأَرْضِ، فَكَانَ عُمَرُ مِّمَّنْ خَبَلَ، وَجَعَلَ يَصِيْحُ، وَيَقُوْلُ: أَنَّ رِجَالًا مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ يَزْعَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَاتَ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَاتَ، وَلَكِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى رَبِّهِ كَمَا ذَهَبَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ، فَقَدْ غَابَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ قِيْلَ قَدْ مَاتَ،

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ২৫০৬

[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ২২৪, হাদীস: ১৭৩৩

وَاللهِ لَيَرْجِعَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَمَا رَجَعَ مُوْسَىٰ، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ، وَأَرْجُلَهُمْ زَعِمُوْا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَاتَ.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন চারিদিক কান্নার রোল ওঠে ও ফেরেশতাগণ তাসবীহ-ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠেন। কোনো সাহাবার মতে, লোকজন অত্যন্ত শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন। তাঁদের হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায়, তাঁরা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন এবং অপ্রকৃতগ্রস্থ হয়ে যান। তাঁদের কেউ কেউ পাগল হয়ে পড়েন, কেউ কেউ নির্বাক হয়ে যান, কেউ কেউ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি করছিলেন। হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব ﷺ) তাঁদের মধ্যে পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রীতিমতো চিৎকার করে যাচ্ছিলেন। মুনাফিকদের কেউ কেউ বলছিলো, তাদের ধারণা নিশ্চয় হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ নাকি মৃত্যুবরণ করেছে! তবে, আল্লাহর কসম! তিনি মৃত্যুবরণ করেননি; নিশ্চয় তিনি তাঁর প্রভুর কাছে চলে গেছেন মাত্র, যেভাবে হযরত মুসা ইবনে ইমরান ﷺ গিয়েছিলেন; তিনি নিজ সম্প্রদায় থেকে ৪০ দিন আত্মগোপনে থাকার পর ফিরে এসেছিলেন। তখন বলা হয়েছিলো, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর কসম! হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺও অবশ্যই ফিরে আসবেন, যেভাবে হযরত মুসা ﷺ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেছেন মর্মে মন্তব্য করবে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে।'[১]

কোনো কোনো বর্ণনা এসেছে,

أَخَذَ عُمَرُ بِقَائِمِ سَيْفِهِ، وَقَالَ عُمَرُ: لَا أَسْمَعُ أَحَدًا، يَقُوْلُ: مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِيْ هَذَا.

'হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব ﷺ) হাতে তরবারি নিয়ে বলতে থাকেন, যাদের মুখে শুনি যে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেছেন, আমি আমার এই তরবারি দিয়ে মেরে ফেলব।'[২]

[১] আব্দুর রবী আল-কালায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৬–৪৭
[২] মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, *আর-রিয়াযুন নাযরা*, খ. ১, পৃ. ১৪৩

وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَخُرِسَ حَتَّىٰ جَعَلَ يُذْهَبُ بِهِ وَيُجَاءُ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بَعْدَ الْغَدِ، وَأُقْعِدَ عَلِيٌّ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَرَاكًا، وَأُضْنِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ، فَمَاتَ كَمَدًا، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَثْبَتَ وَأَحْزَمَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَالْعَبَّاسِ.

'হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান ﷺ ছিলেন শোকে নির্বাক। এমনকি কেউ তাঁর কাছে যেতেন, নিয়ে আসতেন; কারো সাথে কথাই বলতেন না। এভাবে দুই দু'দিন অতিবাহিত হয়। হযরত আলী ﷺ নীরব-নিথর হয়ে স্থাণুর মতো বসে থাকতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স ﷺ. অসুস্থ হয়ে একপর্যায়ে মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবায়ে কেরামরে মাধ্যে হযরত আবু বকর ﷺ ও হযরত আব্বাস ﷺ-এর তুলনায় স্থিরচিত্ত ও দৃঢ়মনোবল প্রতীয়মান হয়নি।'[১]

অন্য একটি বর্ণনা এসেছে,

وَكَانَ أَثْبَتَهُمْ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ وَعَيْنَاهُ تَهْمِلَانِ وَزَفَرَاتُهُ تَتَرَدَّدُ، وَغُصَصُهُ تَتَصَاعَدُ وَتَرْتَفِعُ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ: طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَانْقَطَعَ لِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَعَظُمْتَ عِنْدَ الصِّفَةِ، وَجَلَلْتَ عَنِ الْبُكَاءِ، وَلَوْ أَنَّ مَوْتَكَ كَانَ اخْتِيَارًا لَجُدْنَا لِمَوْتِكَ بِالنُّفُوسِ، اذْكُرْنَا يَا مُحَمَّدُ ﷺ! عِنْدَ رَبِّكَ وَلْنَكُنْ بِبَالِكَ.

'সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু বকর ﷺ সবচেয়ে স্থিরচিত্ত ছিলেন, তবে তাঁর দু'চোক অনবরত অশ্রু প্রবাহিত করছিলো। তাঁর দৃঢ় কঠিন মনোবলও ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিলো, তাঁর উঠানামা করছিলো। অতঃপর তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন, এরপর অধোমুখী হয়ে নবী করীম ﷺ-এর চেহারা থেকে চাদর

[১] আস-সিয়ার বক্‌রী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৭

সরালেন এবং বললেন, আপনার জীবন ও মরণ শুভ হোক। আপনার বিদায়ের মধ্য দিয়ে সেই ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে যা অন্য কোনো নবী দ্বারা বন্ধ হয়নি। প্রশংসার অনেক উর্ধ্বে আপনার অবস্থান, শোক-সন্তাপের ক্ষুদ্রগণ্ডি থেকে বিশালতায় আপনার ব্যাপ্তি। যদি আপনার ওফাতের ক্ষেত্রে ইচ্ছা-অনিচ্ছার অবকাশ থাকত, তবে আপনার পরিবর্তে আমি নিজের জীবনটা সঁপে দিতাম। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার প্রভুর কাছে আমাদের কথা স্মরণে রাখুন। আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় আমাদের একটু জায়গা দিন।'[১]

অপর এক বর্ণনা আছে,

لَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِيْ أَنَّهُ هَلْ مَاتَ أَمْ لَا.

'যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন তখন সাহাবায়ে কিরামের মাঝে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন কি-না এ-ব্যাপারে মত-পার্থক্য দেখা দেয়।'[২]

قَالَ أَنَسٌ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَكَى النَّاسُ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْبًا، فَقَالَ: لَا أَسْمَعَنَّ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَلٰكِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ كَمَا أُرْسِلَ إِلَى مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ، فَلَبِثَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ مَاتَ».

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক রাদি.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন লোকজন অত্যন্ত কান্নাকাটি করছিলেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. মসজিদে দাঁড়িয়ে এক ভাষণে বললেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন এ-ধরনের মন্তব্য আমি বরদাশত করবো না। হ্যাঁ, তাঁকে প্রভুর কাছে ডেকে নেওয়া হয়েছে, যেভাবে হযরত মুসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালাম-কে ডেকে নেওয়া হয়েছিলো; তিনি নিজ সম্প্রদায় থেকে ৪০ রাত অন্যত্র অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহর কসম! আমি অঙ্গীকার করছি যে, যারা নবী

---

[১] (ক) আবুর রবী আল-কালায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৭; (খ) ইবনে আসাকির, *ইত্তিহাফুল যায়ির ওয়া ইতমাফুল মুকিম*, দারুল আরকম ইবনু আবিল আরকম (প্রথম সংস্করণ), পৃ. ১৩৬

[২] আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৭

করীম ﷺ মারা গেছেন মর্মে মন্তব্য করবে অতাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে।'[১]

قَالَ عِكْرِمَةُ: مَا زَالَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ وَيُوْعِدُ النَّاسَ حَتَّىٰ أَزْبَدَ شِدْقَاهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْسَنُ كَمَا يَأْسَنُ النَّاسُ، وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَادْفِنُوْا صَاحِبَكُمْ.

'হযরত ইকরামা رضي الله عنه বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন লোকজন অত্যন্ত কান্নাকাটি করছিলেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه আল্লাহর কসম! তিনি মৃত্যুবরণ করেননি; মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন এ-ধরনের মন্তব্য আমি বরদাশত করবো না। হ্যাঁ, তাঁকে প্রভুর কাছে ডেকে নেওয়া হয়েছে, যেভাবে হযরত মুসা ইবনে ইমরান عليه السلام-কে ডেকে নেওয়া হয়েছিলো; তিনি নিজ সম্প্রদায় থেকে ৪০ রাত অন্যত্র অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহর কসম! আমি অঙ্গীকার করছি যে, যারা নবী করীম ﷺ মারা গেছেন মর্মে মন্তব্য করবে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে।'[২]

وَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ غَائِبًا بِالسُّنْحِ يَعْنِيْ الْعَالِيَةَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ بِنْتِ خَارِجَةَ وَكَانَ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الذَّهَابِ إِلَيْهَا، فَسَلَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَيْفَهُ وَتُوْعِدُ مَنْ يَقُوْلُ: مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ مِنَ السُّنْحِ حِيْنَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ إِلَىٰ بَيْتِ عَائِشَةَ، فَدَخَلَ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَجَثَىٰ يُقَبِّلُهُ، وَيَبْكِيْ، وَيَقُوْلُ: تُوُفِّيَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا أَطْيَبَكَ حَيًّا وَّمَيِّتًا.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন তখন হযরত আবু বকর رضي الله عنه সানহ তথা আলিয়ায় তাঁর স্ত্রী হযরত বিবতে খারিজা رضي الله عنها-এর কাছে ছিলেন। নবী করীম عليه السلام তাঁকে তাঁর স্ত্রীর নিকট যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه নিজের তরবারি বের করে যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেছেন

---

[১] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৩৩, হাদীস: ২২৩২
[২] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৩৩, হাদীস: ২২৩৩

বলছেন তাদেরকে ধমকাচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর ﵁-এর এ-খবর পৌছুতেই তিনি সানহ থেকে সোজা হযরত আয়িশা ﵂-এর ঘরে আসেন। অতঃপর তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন, এরপর নবী করীম ﷺ-এর চেহারা থেকে চাদর সরাতে সরাতে হাঁটু গেড়ে বসলেন, তাঁকে চুমু খেলেন এবং কাঁদছিলেন। আর বললেন, আপনার ওফাত হয়েছে; শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার জীবন ও মরণ কতই শুভ।'

ইমাম আত-তাবারী ﵀ তাঁর *আর-রিয়ায* গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।[১] আর অন্য কয়েকটি বর্ণনায় এসেছে যে,

فَوَضَعَ الْبُرْدَ عَنْ وَجْهِهِ، وَوَضَعَ فَاهُ عَلَىٰ فِيْهِ وَاسْتَنْشَا الرِّيْحَ، ثُمَّ سَجَّاهُ أَيْ: شَمَّ رِيْحَ الْمَوْتِ.

'তিনি নবী করীম ﷺ-এর চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে তাঁর মুখ নবী করীম ﷺ-এর মুখ মুবারক বরাবর রেখে সুঘ্রাণ নেন। তারপর তাঁকে কাপড়ে আচ্ছাদিত করে দেন তথা তিনি তাঁর ওফাতের ঘ্রাণ অনুভব করেন।'[২]

আরও বর্ণিত আছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ أَقْبَلَ عَلَىٰ فَرَسٍ مِّنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ -مَنَازِلُ بَنِي الْحَارِثِ مِنَ الْخَزْرَجِ بِعَوَالِي الْمَدِيْنَةِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْزِلِ النَّبِي ﷺ مَيْلٌ- قَالَتْ: حَتَّىٰ نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَتَكَلَّمِ النَّاسَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ ﵂، فَتَيَمَّمَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُغَشًّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ، وَبَكَىٰ، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، وَاللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الْأُوْلَىٰ الَّتِيْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ، فَقَدْ مُتَّهَا.

---

[১] মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, *আর-রিয়াযুন নাযরা*, খ. ১, পৃ. ১৪৫

[২] মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৪৪

'হযরত আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর ﷺ সুনহে অবস্থিত তাঁর বাড়ি থেকে ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন—মদীনা অধিবাসী খাযরাজের বংশধর হারিস গোত্রের একটি গ্রাম; যা নবী করীম ﷺ-এর ঘরের মাঝে এক মাইলের দূরুত্বে অবস্থিত[১]—(হযরত আয়িশা ﷺ) বলেন, তিনি নেমে সোজা মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে কোনো কথা না বলে হযরত আয়িশা ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হলেন। তখন তিনি একখানি 'হিবারা' চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। হযরত আবু বকর ﷺ নবী করীম ﷺ-এর মুখম-ল উন্মুক্ত করে তাঁর ওপর ঝুকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন, তারপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দুই মৃত্যু বরাদ্দ করেননি। তবে যে-মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিলো তা তো আপনি কবুল করেছেন।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﷺ বর্ণনা করেছেন।[২]

لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ (আল্লাহ আপনার জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না।) হযরত আবু বকর ﷺ-এর এই বক্তব্যে মতবিরোধ রয়েছে।

কারো মতে, এ-বক্তব্যে সুস্পষ্টত যারা নবী করীম ﷺ পুনরুত্থিত হবেন ধরাণা করেন এবং (এর বিরুদ্ধবাদী) লোকের হাত-পা কেটে নেবেন সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত করে। যদি তাদের ধারণা সঠিক হয় তবে তাঁকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করতে হবে।

হযরত আবু বকর ﷺ বিবৃতিতে বলেন,

أَنَّهُ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ مَوْتَتَيْنِ؛ كَمَا جَمَعَهُمَا عَلَى غَيْرِهِ

كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ، وَكَالَّذِيْ مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ.

'নবী করীম ﷺ-এর মর্যাদা আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য দুই দুইবার মৃত্যু নির্ধারণের চেয়ে অনেক বেশি। তবে অন্য অনেকের জন্য তিনি দুই দুইবার মৃত্যু ঠিক করেছেন; যেমন হাজার হাজার লোক যারা

[১] ইয়াকুত আল-হামওয়ী, *মুজামুল বুলদান*, খ. ৩, পৃ. ২৬৫—মধ্যাহ্ন অংশটুকু *সহীহ আল-বুখারীর* অংশ নয়।

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭১, হাদীস: ১২৪১

নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। আরও যেমন– সেসব লোক যারা একটি বিশেষ গ্রামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে।

আর কারো কারো মতে, হযরত আবু বকর বুঝাতে চেয়েছেন যে, কবরে নবী করীম দ্বিতীয়বার মৃত্যুমুখোমুখী হবেন না। যেমন– সাধারণ মানুষকে পুনর্জীবিত করা হয়, এবং সওয়াল-জওয়াব পর্ব শেষে তারা পুনরায় মৃত্যুবরণ করে।

অন্য কারো কারো মতে, আল্লাহ আপনার ইন্তিকালে আপনার শরিয়তের বিলুপ্তি ঘটাননি।

অপর কারো কারো মতে, দ্বিতীয়বার মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানসিক অস্থিরতা অর্থাৎ আজকের পর আপনি দ্বিতীয়বার মানসিক কষ্টে নিপতিত হবেন না।

এসব বক্তব্য ফতহুল *বারী* থেকে উদ্ধৃত।[1]

وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ! فَأَبَىٰ عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَىٰ أَبِيْ بَكْرٍ، وَتَرَكُوْا عُمَرَ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ، فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ﴾ [آل عمران] الآية، وَقَالَ: وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّىٰ تَلَاهَا أَبُوْ بَكْرٍ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর বের হয়ে আসেন তখন হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। এ-সময় (হযরত আবু বকর) তাঁকে বলেন, হে ওমর! বসে পড়। হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) বসতে অস্বীকার করলেন। তখন সাহাবীগণ হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব)-কে ছেড়ে হযরত আবু বকর-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তখন হযরত আবু বকর একটি ভাষণ দিলেন, এরপর আপনাদের মধ্যে যারা হযরত মুহাম্মদ-এর ইবাদত করতেন, তিনি তো ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা

---

[1] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *ফতহুল বারী*, খ. ৩, পৃ. ১১৪

আপনাদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদত করতেন (জেনে রাখুন) আল্লাহ চিরঞ্জীব, চির অমর। মহান আল্লাহ বলেন, 'হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূলমাত্র, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন।'[১]

হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আল্লাহর কসম! হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাঠ করার পূর্বে লোকেরা যেন জানতো না যে, আল্লাহ এরূপ আয়াত নাযিল করেছেন। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর থেকে উক্ত আয়াত শিখে নিলেন। তখন সকলে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন।[২]

সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,

لَمَّا تَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ، فَحَمِدَ اللهَ أَبُوْ بَكْرٍ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝ ﴾ [الزمر]، وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۝ ﴾ [آل عمران] الآيَة، قَالَ: فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُوْنَ.

'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কথা বলতে লাগলেন, তখন হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু) বসে পড়লেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা নিশ্চিত জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অমর। তারপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিলাওয়াত করলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল আর তারা সকলও মরণশীল।'[৩] তিনি আরও তিলাওয়াত করলেন, 'মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন।[৪] বর্ণনাকারী বলেন, (হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একথা শুনে) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নারত লোকজনের কাঁদা থেমে যায়।'[৫]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১৪৪
[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ১৩, হাদীস: ৪৪৫৪
[৩] আল-কুরআন, *সূরা আয-যুমার*, ৩৯:৩০
[৪] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১৪৪
[৫] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৬, হাদীস: ৩৬৬৭ ও ৩৬৬৮

ইমাম ইবনে আবু শায়বা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-বর্ণিত হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীসে আছে,

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ مَرَّ بِعُمَرَ، وَهُوَ يَقُوْلُ: مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ يَقْتُلَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ.

'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সাথে নিয়ে চলে যান; হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু) যেতে যেতে বলছিলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেননি। আল্লাহ মুনাফিকদের ধ্বংস করে দেবেন।'[১]

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে,

حَتَّىٰ يُفْنِيَ الْمُنَافِقِيْنَ.

'মুনাফিকরা ধ্বংস হোক।'[২]

قَالَ: وَكَانُوا أَظْهَرُوْا الْإِسْتِبْشَارَ، وَرَفَعُوا رُءُوْسَهُمْ فَقَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ! إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَدْ مَاتَ أَلَمْ تَسْمَعِ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴾ [الزمر]، وَقَالَ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾ [الأنبياء:]، ثُمَّ أَتَى الْمِنْبَرَ. الحديث.

'বর্ণনাকারী বলেন, মুনাফিকরা সেদিন বেশ উল্লসিত হয়েছিলো, তারা সেদিন মাথা সোজা করে দাঁড়িয়েছিলো। তাই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে লোকসকল! নিশ্চয় হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। তোমরা কি আল্লাহর বাণী শোননি?: 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল আর তারা সকলও মরণশীল।'[৩] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, (আল্লাহর বাণী:) 'আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি।'[৪] অতঃপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে আরোহন করেন।'[৫]

---

[১] ইবনে আবু শায়বা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৪২৭, হাদীস: ৩৭০২১

[২] ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই, *আল-মুসনদ*, খ. ৩, পৃ. ৯৯১, হাদীস: ১৭১৮, হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আয-যুমার*, ৩৯:৩০

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৩৪

[৫] ইবনে আবু শায়বা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৪২৭, হাদীস: ৩৭০২১

ইমাম আবু নসর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

كَأَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ لِعَظِيْمِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ الْفِتْنَةِ وَظُهُوْرُ الْمُنَافِقِيْنَ، فَلَمَّا شَاهَدَ قُوَّةَ يَقِيْنِ الصِّدِّيْقِ الْأَكْبَرِ وَتَفَوَّهُهُ بِقَوْلِ اللهِ ﷻ: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [الأنبياء]، وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴾ [الزمر] رَجَعَ عَنْ قَوْلِ الْمَذْكُوْرِ.

'বস্তুত হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) হয়তো প্রচ- মর্মযাতনা, মুনাফিকদের আত্মপ্রকাশ আশঙ্কা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা দমনের মানসিকতা থেকে উপর্যুক্ত বক্তব্য রেখেছিলেন। তবে সেই পরিস্থিতিতে সিদ্দিকে আকবর (হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু))-এর দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করলেন এবং তাঁর কণ্ঠে আল্লাহ ﷻ-এর বাণী: 'প্রত্যেক প্রাণীর অবধারিত।'[১] এবং তিনি আরও ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল আর তারা সকলও মরণশীল।'[২] প্রতিধ্বনিত হওয়ায় উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে তিনি ফিরে আসেন।'[৩]

ইমাম ইবনে আসাকির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ ذُؤَيْبِ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِيْلٌ، فَأَوْجَسَ أَهْلُ الْحَيِّ خِيْفَةً، وَبِتُّ بِلَيْلَةٍ طَوِيْلَةٍ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قُرْبُ السَّحْرِ نِمْتُ، فَهَتَفَ هَاتِفٌ وَهُوَ يَقُوْلُ: شِعْرٌ:

خَطْبٌ أَجَلٌ أَنَاخَ بِالْإِسْلَامِ	*	بَيْنَ النَّخِيْلِ، وَمَعْقَدِ الْآطَامِ
قُبِضَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ، فَعُيُوْنُنَا	*	تُذْرِي الدُّمُوْعُ عَلَيْهِ بِالتَّسْجَامِ

فَوَثَبْتُ مِنْ نَوْمِيْ فَزَعًا، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمْ أَرَ إِلَّا سَعْدَ الذَّابِحِ، فَعَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ قُبِضَ، أَوْهُوَ مَيِّتٌ، فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَلِأَهْلِهَا

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আম্বিয়া,* ২১:৩৪
[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-আম্বিয়া,* ২১:৩৪
[৩] আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৫৭০

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ بُوْيِعَ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ ﷺ، تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّيْ قُلْتُ لَكُمْ أَمْسِ مَقَالَةً، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَمَا قُلْتُ، وَاللهِ إِنِّيْ مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّتِيْ قُلْتُ لَكُمْ فِيْ كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلَكِنِّيْ كُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ يَّعِيْشَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْبُرُنَا - أَيْ يَكُوْنُ آخِرَنَا مَوْتًا، أَوْ كَمَا قَالَ-، فَاخْتَارَ اللهُ ﷻ لِرَسُوْلِهِ الَّذِيْ عِنْدَهُ عَلَى الَّذِيْ عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِيْ هَدَى اللهُ بِهِ رَسُوْلَهُ، فَخُذُوْا بِهِ تَهْتَدُوْا كَمَا هَدَىٰ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ.

'হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه থেকে শুনেছেন যে, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে হযরত আবু বকর رضي الله عنه-এর হাতে বায়আত অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো তখন হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه) নবী করীম ﷺ-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রথমে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন, অতঃপর হামদ-সালাত পড়লেন এবং লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে লোকসকল! গতকাল আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলেছিলাম কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, বাস্তবতা সেরূপ নয়। আল্লাহর কসম! আমি যা বলেছি আল্লাহর কিতাব এবং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ তার প্রমাণ নেই। আসলে আমার আশা ছিলো যে, আমাদের মৃত্যুর পরও হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকেও দীর্ঘ বেঁচে থাকবেন অর্থাৎ আমাদের পরেই তিনি ওফাত পাবেন—অথবা কোনো বাক্য তিনি বলেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসুলের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিতিই পছন্দ করেছেন, চিরদিন তোমাদের সামনে বেঁচে থাকার ওপর। আর এই মহাগ্রন্থ যা আল্লাহ তাঁর রাসুলের মাধ্যমে হিদায়েতের বার্তারূপে পেশ করেছেন, তোমরা সবাই দৃঢ়ভাবে সে-মতো জীবন গড়ো, আলোকপ্রাপ্ত হবে। ঠিক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ অনুযায়ী আমল কর।'[১]

---

[১] ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ১৪, পৃ. ৫৮৯-৫৯০, হাদীস: ৬৬২০

ضَجِيْجٌ بِالْبُكَاءِ كَضَجِيْجِ الْحَجِيْجِ إِذَا أَهَلُّوْا بِالْإِحْرَامِ، فَقُلْتُ: مَهْ، فَقِيْلَ: قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

'হযরত আবু যুওয়াইব আল-হুযালী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতার খবর পেয়ে আমাদের গোত্রের মাঝে উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। এতে দীর্ঘ রাত নির্ঘুম কাটিয়ে ভোরের সময় একটু ঘুম এলে এক অদৃশ্য কণ্ঠে নিম্নের কবিতাটি ধ্বনিত হলো:

এটি একটি বড় ঘটনা যে, ইসলাম তার বাগানে মজবুত মাটিতে শিকড় গেড়েছে আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ বিদায় নিয়েছেন। তাঁর বিরহবেদনায় আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা বইতে শুরু করেছে।

অতঃপর ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তারপর আমি আসমানের দিকে চোখ ফেরাতেই সেখানে সা'আদুয যাবিহ (বিষুবরেখা) দেখতে পাই। এতে আমি নিশ্চিত হই যে, নবী করীম ﷺ নিশ্চয় বিদায় নিয়েছেন বা তিনি বিদায় নিতে যাচ্ছেন। অতঃপর আমি দ্রুত মদীনা পৌঁছুলাম, (এসে দেখি) হাজিরা ইহরামের সময় যেভাবে পাগলবেশে লাব্বায়েক বলতে থাকে মদীনাবাসীরা সেখানে বেসামাল কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? তাদের কেউ একজন বলল, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন।'[১]

ইমাম আদ-দামীরী رحمه الله তাঁর *হায়াতুল হায়ওয়ান* গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عَنِ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ شُيُوْخِهِ، أَنَّهُمْ قَالُوْا: لَـمَّا شُكَّ فِيْ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَضَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ يَدَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَدْ رُفِعَ الْخَاتَمُ مِنْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَكَانَ هَذَا الَّذِيْ عُرِفَ بِهِ مَوْتُ النَّبِيِّ ﷺ.

ইমাম আল-ওয়াকিদী رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর শায়খবর্গ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেছেন, যখন নবী করীম ﷺ-এর ওফাত নিয়ে মানুষের মাঝে সংশয় দানা বাঁধে; তখন হযরত আসমা বিনতে

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ১৭, পৃ. ৫৪, হাদীস: ২০২৭

উমায়স (রা.) স্বীয় হাত নবী করীম ﷺ-এর কাঁধে রেখে বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। কারণ নবী করীম ﷺ-এর কাঁধ থেকে মোহরে নুবুওয়ত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ থেকে পরিস্কার যে, নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেছেন।'[১]

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.)[২] ও ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী (রহ.)) বর্ণনা করেছেন।

وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَضَعْتُ يَدِيْ عَلَىٰ صَدْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ، فَمَرَّ بِيْ جُمَعٌ آكُلُ الطَّعَامِ، وَأَتَوَضَّأُ، مَا تَذْهَبُ رِيْحُ الْمِسْكِ مِنْ يَدِيْ.

'এ ছাড়াও হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় আমার হাতটি তাঁর পবিত্র বুকের ওপর রেখেছিলাম। এরপর অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে, আমি খাবার খেয়েছি, অযু করেছি। তবুও আমার হাত থেকে মিশকের সুগন্ধি যায়নি।'[৩]

ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী (রহ.)) বর্ণনা করেন,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَعِدَ مَلَكُ الْمَوْتِ بَاكِيًا إِلَى السَّمَاءِ، وَالَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا يُنَادِيْ مِنَ السَّمَاءِ: يَا مُحَمَّدَاهُ! كُلُّ الْمَصَائِبِ تَهُوْنُ عِنْدَ هَذِهِ الْمُصِيْبَةِ.

'হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন, তখন মালাকুল মওত কাঁদতে কাঁদতে আসমানে পৌঁছুন। সেই সত্ত্বার কসম! যিনি তাঁকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন তখন আমি আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পাই, হে মুহাম্মদ! এ-মসিবতের সামনে অন্য সব মসিবত তো অত্যন্ত সহজ।'[৪]

---

[১] আদ-দামীরী, *হায়াতুল হায়ওয়ান*, খ. ১, পৃ. ৩২৪
[২] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২১৯, হাদীস: ৩১৫৮
[৩] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২১৯, হাদীস: ৩১৫৯
[৪] আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭১

الْبَيْتِ: صَدَقَ، فَلَا تُغَسِّلُوْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا نَدَعُ سُنَّةً بِصَوْتٍ لَا تَدْرِيْ مَا هُوَ؟ وَغَشِيَهُمُ النُّعَاسُ ثَانِيَةً، فَنَادَاهُمْ مُنَادٍ: فَانْتَبِهُوْا بِهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: اغْسِلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ ثِيَابِهِ، فَقَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ: أَلَا لَا، فَقَالَ: أَلَا نَعَمْ، وَقَدْ كَانَ الْعَبَّاسُ حِيْنَ دَخَلَ الْكِلَّةَ لِلْغُسْلِ قَعَدَ مُتَرَبِّعًا، وَأَقْعَدَ عَلِيًّا مُتَرَبِّعًا مُتَوَاجِهَانِ، وَأَقْعَدَا النَّبِيَّ ﷺ عَلَىٰ حُجُوْرِهِمَا، فَنُوْدُوْا أَنْ أَضْجِعُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، ثُمَّ اغْسِلُوْا وَاسْتُرُوْا، فَثَارُوْا عَنِ الصَّفِيْحِ، وَأَضْجَعَاهُ، فَقَرَّبَا رِجْلَ الصَّفِيْحِ، وَشَرَّقَا رَأْسَهُ، ثُمَّ أَخَذُوْا فِيْ غُسْلِهِ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ، وَمِجْوَلُهُ مَفْتُوْحُ الشَّقِّ، وَلَمْ يَغْسِلُوْهُ إِلَّا بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَطَيَّبُوْهُ بِالْكَافُوْرِ، ثُمَّ اعْتُصِرَ قَمِيْصُهُ وَمِجْوَلُهُ، وَحَنَّطُوْا مَسَاجِدَهُ وَمَفَاصِلَهُ، وَوَضَّؤُا مِنْهُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ أُدْرِجُوْا أَكْفَانَهُ عَلَىٰ قَمِيْصِهِ وَمِجْوَلِهِ، وَجَمَّرُوْهُ عُوْدًا وَنَدًّا، ثُمَّ احْتَمَلُوْهُ حَتَّىٰ وَضَعُوْهُ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ وَسَجَّوْهُ.

'আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, নবী করীম ﷺ-এর গোসল কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে? জবাবে তিনি বলেছেন, হযরত আব্বাস ﷺ একটি ঝিল্লিসমৃদ্ধ ইয়ামেনি চাদর দিয়ে তাঁর চারপাশে পর্দা টাঙিয়ে নেন। পরবর্তী কালে এটি আমাদের মাঝে এবং অনেক পূন্যবানদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে যায়। এরপর বনী হাশিমের লোকরা যারা পরদা ও দেওয়ালসমূহের মাঝে বসা ছিলেন তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হল। তারপর হযরত আব্বাস ﷺ পর্দার ভেতরে প্রবেশ করে হযরত আলী ﷺ, হযরত ফযল ﷺ, হযরত আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ﷺ ও হযরত উসামা ইবনে যায়দ ﷺ-কে ডেকে নেন। অতঃপর যখন তাঁরা সবাই পরদার ভেতরে সমবেত হলেন, তারা, পরদার বাইরের লোকজন এবং পরিবার-পরিজন সকলেই হঠাৎ নিদ্রা আচ্ছন্ন করে ফেললো। এরপর একজন (অদৃশ্য) আহ্বায়কের আওয়াজে

সুনানু ইবনে মাজাহে বর্ণিত আছে যে, অসুস্থতার মাঝে নবী করী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيْبَتِيْ فِيْ عَيْنِ الْمُصِيْبَةِ الَّتِيْ تُصِيْبُهُ بِغَيْرِيْ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِيْ لَنْ يُّصَابَ بِمُصِيْبَةٍ بَعْدِيْ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيْبَتِيْ».

'হে লোকসকল! বা হে মুমিনগণ! তোমরা কেউ যদি বিপদে বিপন্ন হও, তবে সে যেন অন্যের কাছ পাওয়া আমার কষ্টের চিত্রটি নিজের সামনে রেখে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা আমার উম্মতের মাঝে আমার পর কারো আমার মতো দুঃসহ কষ্টে পড়তে হবে না।'[১]

নবী করীম ﷺ-এর গোসলের আলোচনা

নবী করীম ﷺ-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর رضي الله عنه-এ খলীফা মনোনীত হওয়া এবং তাঁর হাতে লোকজন বায়আত সম্পন্ন হওয়া মধ্য দিয়ে আল্লাহর মেহেরবানিতে উম্মার ঐক্য অটুট থাকে এবং যাবতী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে। হযরত আবু বকর رضي الله عنه-এর বায়আত সম্পন্নে অব্যবহিত পর সাহাবাগণ নবী করীম ﷺ-এর শেষক্রিয়া ও এর প্রস্তুতির জন মনোযোগী হন।[২]

وَرَوَىٰ: أَنَّهُ سُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَيْفَ كَانَ غَسْلُ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: ضَرَبَ الْعَبَّاسُ كِلَّةً لَهُ مِنْ ثِيَابٍ يَمَانِيَةٍ صِفَاقٍ، فَصَارَتْ سُنَّةً فِيْنَا وَفِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ صَالِحِيِ النَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لِرِجَالِ بَنِيْ هَاشِمٍ، فَعَدُوْا بَيْنَ الْحِيْطَانِ وَالْكِلَّةِ، ثُمَّ دَخَلَ الْعَبَّاسُ الْكِلَّةَ، وَدَعَا عَلِيًّا وَالْفَضْلَ وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا فِي الْكِلَّةِ أُلْقِيَ عَلَيْهِمُ النُّعَاسُ، وَعَلَىٰ مَنْ وَّرَاءَ الْكِلَّةِ فِي الْبَيْتِ، فَنَادَاهُمْ مُنَادٍ انْتَبِهُوْا بِهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: لَا تُغَسِّلُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَإِنَّهُ كَانَ طَاهِرًا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَلَا بَلَىٰ، وَقَالَ أَهْلُ

---

[১] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫১০, হাদীস: ১৫৯৯
[২] আবুর রবী আল-কালায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৫

তাঁদের সবার ঘুম ভেঙে যায়, তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল, নবী করীম ﷺ-কে গোসল দিও না, তিনি সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র। তবে হযরত আব্বাস رضي الله عنه বললেন, তবুও গোসল দিতে হবে। আর নবী করীম ﷺ-এর পরিবারবর্গ বললেন, এই আওয়াজ সম্পূর্ণ সত্য। অতএব তাঁকে গোসল দিতে হবে না। হযরত আব্বাস رضي الله عنه বললেন, কে বা কার যাকে আমরা জানি না সেরকম একটি আওয়াজ শুনে আমরা সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না। এরপর তাঁরা সবাই আবারো ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গেলেন। এবারও একজন (অদৃশ্য) আহ্বায়কের আওয়াজে তাঁদের সবার ঘুম ভেঙে যায়, তিনি বললেন, তোমরা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোসল দিতে পার, তবে কাপড়সহ তাঁকে গোসল দেবে। নবী করীম ﷺ-এর পরিবারবর্গ বললেন, না, এটি হতে পারে না। হযরত আব্বাস رضي الله عنهও বললেন, হ্যাঁ, এটিই ঠিক থাকলো। আর হযরত আব্বাস رضي الله عنه যখন পরদার ভেতর গোসলের জন্য গেলেন চারজানু বিছিয়ে বসলেন, হযরত আলী رضي الله عنهও চারজানু বিছিয়ে বসলেন; তাঁরা উভয়ে মুখোমুখি (হয়ে বসলেন) এবং নবী করীম ﷺ-কে উভয়ের কোলে বসালেন। অতঃপর আওয়াজ আসল, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চিৎ করে শোয়ানো হোক এবং পরদাসহকারে গোসল দেওয়া হোক। অতঃপর তাঁরা তক্তা থেকে সরে গেলেন এবং এর ওপর নবী করীম ﷺ-কে শোয়ালেন। তক্তার পা পূর্ব দিকে আর মাথা পশ্চিম দিকে ছিল। এরপর গোসলের কাজ আরম্ভ করা হলো। তাঁর শরীরের জামা ছিল; যার একটি আস্তিন একদিক থেকে খোলা ছিল। এর ওপরই তাঁকে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে গোসল দেওয়া হয় এবং কাফুরের সুগন্ধি লাগানো হয়। এরপর নবী করীম ﷺ-এর জামা ও আস্তিন নিংড়ানো হয় এবং কপালে সাজদার অংশ ও শরীরের জোড়াগুলোতে সুগন্ধি মাখানো হয়। নবী করীম ﷺ-এর চেহারা, দুই হাত কনুই পর্যন্ত অংশগুলো অযুর পদ্ধতিতে ধোয়া হয়। এরপর তাঁর জামা ও খোলা আস্তিনের ওপরই কাফন পরানো হয় এবং বেজোড় সংখ্যায় তাঁকে সুগন্ধির ধূপ করা হয়। এরপর নবী করীম ﷺ-কে উঠিয়ে খাটিয়ার ওপর শোয়ানো হয় এবং ঢেকে দেওয়া হয়।'[১]

---

[১] (ক) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭০; (খ) ইবনে কাসীর, *আস-সিরাতুন্নাবাবিয়া*, খ. ৪, পৃ. ৫২১

আরও বর্ণিত আছে যে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَهُمْ: اسْتُرُوْا نَبِيَّكُمْ يَسْتُرُكُمُ اللهُ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, তিনি সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, নিজেদের নবীকে ঢেকে রেখ! আল্লাহ তোমাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।'[১]

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: لَـمَّا أَرَادُوْا غَسْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ؛ فَقَالُوْا: وَاللهِ! مَا نَدْرِيْ أَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَوْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّىٰ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِيْ صَدْرِهِ، وَكَلَّمَهُمْ مُتَكَلِّمٌ مِّنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوْا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَغَسَلُوْهُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ.

'হযরত আয়িশা رضي الله عنها বলেন, যখন সাহাবাগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোসল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়; তাঁরা বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা কি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় খুলে ফেলব, যেমন– আমরা আমাদের অন্যান্য মৃত ব্যক্তির কাপড় খুলে ফেলি অথবা আমরা তাঁকে কাপড় পরা অবস্থায় গোসল দেব? যখন তাঁরা এ-নিয়ে তাঁদের মতভেদ করলেন, তখন আল্লাহ তাঁদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলেন। এমনকি তাঁদের একজনও ছিলেন না (নিদ্রার কারণে) যার থুতনী তার বুকের ওপর আপতিত হয়নি। এ-সময় জনৈক ব্যক্তি ঘরের এক কোণা থেকে বলল, তাঁরা জানতেন না, তিনি কে। তোমরা নবী করীম ﷺ-কে তাঁর পরিধেয় কাপড়সহ গোসল দাও। তখন সাহাবাগণ উঠে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাপড়সহ গোসল দিতে শুরু করেন। তখন তাঁর পরনে জামা পরিহিত ছিল।'[২]

---

[১] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭০

[২] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১৯৬–১৯৭, হাদীস : ৩১৪১; (খ) আবুর রবী আল-কালায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৮–৫৯

আল-মিশকাতে[১] আছে,

يَصُبُّوْنَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ وَيُدَلِّكُوْنَهُ بِالْقَمِيْصِ.

'তাঁরা জামার ওপর পানি ঢেলে দেন এবং ওই জামা দিয়ে তাঁর দেহ মুবারক ঘর্ষণ করেন।'

এটি ইমাম আল-বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক *দালায়িলুন নুবুওয়তে* বর্ণিত।[২]

وَكَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تَقُوْلُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَّا نِسَاؤُهُ».

'হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি যদি আগে বুঝতে পারতাম, যা আমি পরে বুঝতে পরি, তবে তাঁকে তাঁর বিবিগণ ছাড়া আর কেউই গোসল দিতে পারত না।'[৩]

وَيَرْوِيْ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا غَسْلَهُ ﷺ ابْنُ عَمِّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَعَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنَاهُ الْفَضْلُ، وَقُثَمُ، وَحُبُّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمَوْلَاهُ شُقْرَانُ.

'অনেকের মতে, নবী করীম ﷺ-এর গোসলে আরও যাঁরা দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা হলেন, চাচাতো ভাই হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু), চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু), তাঁরই দু'ছেলে: হযরত ফযল (ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)) ও হযরত কুসাম (ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)), নবী করীম ﷺ-এর পরম ভক্ত হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং নবী করীম ﷺ-এর ক্রীতদাস হযরত শুকরান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ।'[৪]

وَلَمَّا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِغَسْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، نَادَىٰ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَحَدُ بَنِيْ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَ بَدْرِيًّا عَلِيَّ بْنَ

---

[১] আত-তাবরীযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৬৭৫–১৬৭৬, হাদীস : ৫৯৪৮ (৫)

[২] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৪২, হাদীস: ৩১৯৬

[৩] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১৯৬–১৯৭, হাদীস : ৩১৪১; (খ) আবুর রবী আল-কালায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৯

[৪] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭০

أَبِيْ طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، نَشَدْتُكَ اللهَ، حَظَّنَا مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: ادْخُلْ، فَدَخَلَ، فَحَضَرَ غَسْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَلِ مِنْ غَسْلِهِ شَيْئًا.

'সকলে মিলে যখন তাঁর গোসলের জন্য সমবেত হন, এ-সময় হযরত আওস ইবনে খাওলী আল-আনসারী رضي الله عنه; যিনি আওফ ইবনুল খাযরাজ গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধেও শরিক ছিলেন— তিনি দরোজার বাইরে থেকে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه-কে ডাক দিয়ে বললেন, হে আলী! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি! আমাকে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসলকার্যে অংশ নিতে সুযোগ দিন। অতঃপর হযরত আলী رضي الله عنه বললেন, ঠিক আছে, ভেতরে চলে এসো। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসলক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, তবে গোসলের কোন কাজই তখন আর অবশিষ্ট ছিল না।'[১]

وَقِيْلَ: كَانَ يَحْمِلُ الْمَاءَ.

'কারো কারো মতে, তিনি (গোসলের জন্য) পানি বহন করেছিলেন।'[২]

قَالَ: فَأَسْنَدَهُ عَلِيٌّ إِلَى صَدْرِهِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمُ يُقَلِّبُوْنَهُ مَعَ عَلِيٍّ، وَكَانَ أُسَامَةُ وَشُقْرَانُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ عَلَيْهِ.

'(বর্ণনাকারী) বলেন, গোসলের সময় হযরত আলী رضي الله عنه নবী করীম ﷺ-কে নিজের বুকের সাথে ঠেকিয়ে রাখেন। তখন নবী করীম ﷺ-এর পরনে জামা ছিল। হযরত আলী رضي الله عنه-এর সাথে হযরত আব্বাস رضي الله عنه, হযরত ফযল (ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما) ও হযরত কসম (ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما) সম্মিলিতভাবেভাবে নবী করীম ﷺ-এর পাশ ফেরান। আর হযরত উসামা (ইবনে যায়দ رضي الله عنه) ও হযরত শুকরান رضي الله عنه নবী করীম ﷺ-এর শরীরে পানি ঢালেন।'[৩]

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৬–১৮৭, হাদীস: ২৩৫৭

[২] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭০

[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৮৬–১৮৭, হাদীস: ২৩৫৭; তবে এখানে হযরত শুকরান رضي الله عنه-এর স্থলে হযরত সালিহ رضي الله عنه-এর কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَأَعْيُنُهُمْ مَعْصُوْبَةٌ مِنْ وَّرَاءِ السَّتْرِ.

টুকরো কাপড় দিয়ে তাঁদের চোখ বন্ধ ছিল।'[১]

হযরত আলী -এর হাদীস মতে,

«لَا يَغْسِلُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَنْتَ».

'তুমি (হযরত আলী) ছাড়া অন্য কেউ নবী করীম -কে গোসল দেবে না।'[২]

অন্য এক বর্ণনা মতে,

أَوْصَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُغَسِّلُهُ غَيْرِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَرَىٰ أَحَدٌ عَوْرَتِيْ إِلَّا طُمِسَتْ عَيْنَاهُ».

'হযরত রাসূলুল্লাহ আমাকে অসিয়ত করেছেন যে, 'আমি ছাড়া আর কেউ যেন তাঁকে গোসল না দেয়। কারণ কেউ আমার সতর না দেখতে পারে না, এমনটি হলে তাদের দৃষ্টিশক্তি চলে যাবে।'[৩]

সিরাতে মুগলতায়ী[৪] ও *আশ-শিফা*[৫] গ্রন্থে এ-রকম বর্ণিত হয়েছে।[৬]

وَعَلِيٌّ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، وَلَمْ يُرَ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ مِّمَّا يُرَاهُ مِنَ الْمَيِّتِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، مَا أَطْيَبَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا.

'হযরত আলী নবী করীম -কে বড়ই (পাতায় সিদ্ধ) পানি দিয়ে গোসল দেন। সচরাচর মৃত লোকজনের শরীরে যা পরিদৃষ্ট হয়; আল্লাহর রাসূলের শরীরে তার কিছুই দেখা যায়নি। হযরত আলী বলেন, তাঁর ওপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আপনি জীবনে-মরণে কতই না পূত-পবিত্র।'[৭]

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন,

---

[১] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*

[২] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*

[৩] (ক) আল-বাযযার, *আল-বাহরুয যাখ্খার*, খ. ২, পৃ. ১৩৫–১৩৬, হাদীস: ৯২৫; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২২৪, হাদীস: ৩২০১

[৪] আলাউদ্দীন মুগলতায়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

[৫] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা*, খ. ১, পৃ. ৬৬

[৬] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭০

[৭] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৭, হাদীস: ২৩৫৭; তবে তাঁর বর্ণনায় বড়ই পাতায় সিদ্ধ পানির প্রসঙ্গটি নেই। (খ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*

عَنْ عَلِيٍّ يَرْفَعَهُ: «إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاغْسِلُوْنِيْ بِسَبْعِ قِرَبٍ مِّنْ بِئْرِيْ، بِئْرِ غَرْسٍ».

'হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সূত্র-পরম্পরায় বর্ণিত আছে, যখন আমি ইন্তিকাল করব, তবে আমাকে আমারই কূপ গারস কূপের পানি দিয়ে গোসল দেবে।'[১]

আন-নিহায়ায় গ্রন্থকার বলেন, (غَرْسٌ শব্দটি) সবিন্দু غ-এ যবর এবং ر-এ হসন্ত ও বিন্দুহীন س-সহকারে ব্যবহৃত হয়।[২]

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَشْرُبُ مِنْهَا.

'হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কূপ থেকে স্বয়ং পানি পান করতেন।'[৩]

ইমাম ইবনুন নাজ্জার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ أَنِّيْ أَصْبَحْتُ عَلَىٰ بِئْرٍ مِّنَ الْـجَنَّةِ»، فَأَصْبَحَ عَلَىٰ بِئْرِ غَرْسٍ، فَتَوَضَّأَ، وَبَزَقَ فِيْهَا».

"আমি রাতে (স্বপ্নে) দেখলাম সকালে জান্নাতের কোনো কূপের নিকটে বসে আছি।' ভোরে তিনি গরস কূপে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে তিনি অযু করলেন এবং কূপের মাঝে কিছু থুথু নিক্ষেপ করেন।'[৪]

ইমাম আস-সামহূদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর *তারিখুল মদীনায়* অনুরূপ এসেছে।[৫]

وَجَعَلَ عَلِيٌّ عَلَىٰ يَدِهِ خِرْقَةً، وَأَدْخَلَهَا تَحْتَ الْقَمِيْصِ.

'হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজের হাতে কাপড় মুড়িয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামার নিচে হাত চালিয়ে গোসল করান।'[১]

---

[১] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৭১, হাদীস: ১৪৬৮

[২] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৩, পৃ. ৩৫৯

[৩] (ক) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৫৫৫, হাদীস: ৬৬৫৭; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৪৫, হাদীস: ৩২০৪; (গ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৫, পৃ. ২৮২, হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত

[৪] ইবনুন নাজ্জার, *আদ-দিররাতুস সমীনা*, পৃ. ৬১, হযরত ইবরাহীম ইবনে ইসমাইল ইবনে মুজাম্মি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত

[৫] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

সিরাতে মুগলতায়ীতে এ-রকমই এসেছে।[২]

আরও বর্ণিত আছে,

أَنَّ الْغَسْلَةَ الْأُوْلَى كَانَتْ بِالْمَاءِ الْقِرَاحِ، وَالثَّانِيَةَ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُوْرِ.

'নবী করীম ﷺ-এর প্রথম গোসল ছিল খালি পানি দিয়ে, দ্বিতীয়বার বরই পাতার পানি দিয়ে আর তৃতীয়বারে কাপুর মিশ্রিত পানি দিয়ে।'[৩]

وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ الْمَاءُ يَجْتَمِعُ فِيْ جُفُوْنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَشْرَبُهُ.

'হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (গোসলের সময়) নবী করীম ﷺ-এর চোখের মধ্যে যে পানিটুকু জমতো ঘযরত আলী رضي الله عنه তা পান করে নিতেন।'[৪]

শাওয়াহিদুন নুবুওয়াত গ্রন্থে এসেছে যে,

سُئِلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَنْ سَبَبِ فَهْمِهِ وَحِفْظِهِ، قَالَ: لَمَّا غَسَّلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِجْتَمَعَ مَاءٌ فِيْ جُفُوْنِهِ، فَرَفَعْتُهُ بِلِسَانِيْ، وَازْدَرَدْتُهُ، فَأَرَى قُوَّةَ حِفْظِيْ مِنْهُ.

'হযরত আলী رضي الله عنه-কে তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, নবী করীম ﷺ-কে গোসল দেওয়ার সময় চোখে যে পানিগুলো জমে হতো আমি তা পান করে নিতাম, এতে আমার স্মরণশক্তি বেড়েছে।'[৫]

---

[১] আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ৩১৯৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] আলাউদ্দীন মুগলতায়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

[৩] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭১

[৪] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪, পৃ. ২২৯, হাদীস: ২৪০৩; (খ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭১

[৫] (ক) আল-জামী, *শাওয়াহিদুন নুবুওয়াত*, পৃ. ১৮৮; (খ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*

وَيُقَالُ: إِنَّ عَلِيًّا وَّالْفَضْلَ كَانَا غَسَّلَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَنُوْدِيَ عَلِيٌّ: أَنِ ارْفَعْ طَرْفَكَ إِلَى السَّمَاءِ.

'বলা হয়ে থাকে, হযরত আলী ও হযরত ফযল (ইবনে আব্বাস) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল দিয়েছেন। ওই সময় হযরত আলী-এর প্রতি আওয়াজ আসে, তোমার চোখ আকাশের দিকে নিবদ্ধ করো।'[১]

হাদীসটি *আশ-শিফায়* বর্ণিত হয়েছে।[২]

নবী করীম ﷺ-এর কাফনের আলোচনা

অতঃপর সাহাবাগণ নবী করীম ﷺ-এর গোসল সম্পন্নের পর তাঁর শরীর মুছে শুকিয়ে নেন। তারপর অন্যান্য মৃত মানুষের সাথে যা যা করা হয় নবী করীম ﷺ-এর বেলায়ও তার সবই করা হয়। এরপর ৩টি কাপড় পরানো হয়; যার দুটো ছিল সাদা ও অন্যটি ছিল ইয়েমেনি চাদর।

আল-ইকতিফা[৩] গ্রন্থে এসেছে, ইমাম আত-তিরমিযী[৪] বলেন,

فَذَكَرُوْا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: فِيْ ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلٰكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ، وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ.

'অতঃপর হযরত আয়িশা-কে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন, (নবী করীম ﷺ-কে) দুটো কাপড় ও একটি ইয়েমেনি (পরানো হয়েছে)। অতঃপর তিনি (হযরত আয়িশা) তখন বলেন, কয়েকটি চাদর আনা হয়েছিল ঠিক কিন্তু ওসব আবার ফেরত পাঠানো হয়েছে। এসব কাফনে ব্যবহার করা হয়নি।'[৫]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِيْ رَيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ نَجْرَانِيٍّ.

---

[১] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৪৫, হাদীস: ৩২০৩, হযরত আল-আলবা ইবনে আহমর থেকে বর্ণিত

[২] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*

[৩] আবুর রবী আল-কালায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬০

[৪] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৯৯৬, হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত

[৫] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭১

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবী করীম -কে দুটো সাধারণ কাপড় ও একটি নাজরানি চাদর দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে।'[১]

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ -بَلْدَةٌ مِّنَ الْيَمَنِ-، مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِيْ بَكْرٍ فِيْ مَرْضِهِ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَىٰ ثَوْبٍ عَلَيْهِ، كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ بِهِ رَدْعٌ مِّنْ زَعْفَرَانٍ، قَالَ: اغْسِلُوْا ثَوْبِيْ هَذَا وَزِيْدُوْا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْهَا، قُلْتُ: هَذَا خَلَقٌ، قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْنَةِ.

'হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম -কে ৩টি সাহুলী—ইয়েমেনের একটি শহর—সাদা চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছে। এতে জামা ও পাগড়ি ছিল না। তিনি (হযরত আয়িশা) বলেন, আমি হযরত আবু বকর -এর কাছে তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। এরপর অসুস্থকালীন তাঁর পরিধেয় কাপড়ের প্রতি লক্ষ করে তাতে জাফরানি রঙের চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, আমার এ কাপড়টি ধুয়ে তার সাথে আরও দুটো কাপড় বৃদ্ধি করে আমার কাফন দেবে। আমি (হযরত আয়িশা) বললাম, এতো পুরোনো! তিনি বললেন, মৃতব্যক্তির চেয়ে জীবিতদের নতুন কাপড়ের অধিকার বেশি। আর কাফন হল বিগলিত শবদেহের জন্য।'[২]

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন।[৩] ইমাম আবু আবদুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস -এর *মুওয়াত্তায়*[৪] আছে,

---

[১] (ক) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*; (খ) আল-বাযযার, *আল-বাহরুয যাখ্খার*, খ. ১৪, পৃ. ২৩৯, হাদীস: ৭৮১১, এটি হযরত কাতাদা, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত

[২] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭১

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৭, হাদীস: ১২৭৩, খ. ২, পৃ. ৭৫, হাদীস: ১২৬৪ ও খ. ২, পৃ. ১০২, হাদীস: ১৩৭৮

[৪] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৩৯৯, হাদীস: ১০১০, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত, খ. ১, ১০১১ ও ১০১২, হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত

كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ حِبَرَةٍ وَّسَحَّارِيَّيْنِ.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ৩টি ইয়েমেনি ও সাহারি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে।'[১]

আর ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর বর্ণনা হল,

...فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ.

'... নাজরানি ৩টি কাপড়ে (নবী করীম ﷺ-কে কাফন দেওয়া হয়েছে)।'[২]

আল-ইকলীল গ্রন্থে আছে,

كُفِّنَ فِيْ سَبْعَةِ أَثْوَابٍ، وَجُمِعَ فِيْهَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَّلَا عِمَامَةٌ مَحْشُوِيًّا.

'নবী করীম ﷺ-কে ৭টি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে।'[৩] 'আর এ-বিষয়ে সবাই একমত যে, নবী করীম ﷺ-এর কাফনে জামা ও প্রিয় পাগড়ি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'[৪]

ইয়াযিদ ইবনে আবু যিয়াদের একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসে যা এসেছে (...فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ), মূলত হাদীসটি দুর্বল।

নবী করীম ﷺ-এর কাফনে কাফুর মেশানো হয়েছিল। কারো মতে, সুগন্ধি মেশানো হয়েছিল। *সিরাতে মুগলতায়ীয়ে* এ-রকম আছে।[৫]

আর হযরত উরওয়া (রহ.)-এর হাদীসে আছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُوْلِيَّةٍ بِيْضٍ.

'হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ-কে ৩টি সাদা সূতি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে।'

---

[১] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*

[২] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ৩১৫৩, ইয়াযিদ ইবনে আবু যিয়াদ>মিক্সাম> হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ১৩২, হাদীস: ৮২৮ ও খ. ২, পৃ. ১৮২, হাদীস: ৮০১; (খ) আল-বায্যার, *আল-বাহরুল-যাখ্খার*, খ. ২, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ৬৪৬; (গ) ইবনে আবু শায়বা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৬৫, হাদীস: ১১০৮৪, হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত

[৪] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭১

[৫] আলাউদ্দীন মুগলতায়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

ফাতাহ-সহকারে এটি السَّحُوْلُ-এর সাথে সম্পর্কিত। (السَّحُوْلُ) অর্থ اَلْقَصَّارُ (ধুপী)। কারণ يَسْحَلُهَا: أَيْ يَغْسِلُهَا (সে কাপড় কাচে তথা কাপড় ধোয়া-পালা করে) অথবা سَحُوْلُ-এর প্রতি সম্বন্ধিত; আর এটি ইয়েমেনের একটি গ্রাম। আর যাম্মার ক্ষেত্রে শব্দটি سَحْلُ-এর বহুবচন। অর্থ اَلثَّوْبُ الْأَبْيَضُ النَّقِيُّ (মিহি সাদা কাপড়)। এ-কাপড় তুলোর সূতোয় বোনা কাপড় ছাড়া তৈরি হয় না। তবে এটি বিরল-ব্যবহৃত। যেহেতু শব্দটি বহুবচনের প্রতি সম্বন্ধিত। কারো মতে, যাম্মা-সহকারে এখানে একটি গ্রামের নাম।[১]

الْكُرْسُفُ শব্দটি ك-এ যাম্মা, ر-এ হসন্ত, বিন্দুহীন س-এ যাম্মা; এরপর ف। অর্থ: তুলোর সূতো।[২]

আর ইমাম আত-তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

رُوِيَ فِيْ كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الْأَحَادِيْثِ الَّتِيْ رُوِيَتْ فِيْ ذَلِكَ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ.

'নবী করীম ﷺ-এর কাফন প্রসঙ্গে অনেকগুলো বর্ণনা এসেছে, আর এসব হাদীসের মধ্যে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনাটি সর্ববিশুদ্ধ। সাহাবা ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ এর ওপর আমল করেছেন।'[৩]

ইমাম আল-বায়হাকী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *খিলাফিয়াত* গ্রন্থে বলেন,

قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي الْحَاكِمَ: ... تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فِيْ تَكْفِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

'আবু আবদুল্লাহ তথা ইমাম আল-হাকিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু,

[১] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ৩৪৭
[২] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মজমূ' শরহুল মুহাযযাব*, খ. ১১, পৃ. ৩৬৫
[৩] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৩১৩, হাদীস: ৯৯৭

হাদীসটি ইমাম আন-নাসায়ী[1] ইমাম আবদুর রায্‌যাক[2]>ইমাম মা'মর (ইবনে রাশিদ)>ইমাম আয-যুহরী> হযরত উরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ৬ বিশিষ্ট ইমাম এর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[3] তবে হিশাম ইবনে উরওয়াহ>হযরত আয়িশা-সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কিছুটা অতিরিক্ত আছে,

...مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ، وَّلَا عِمَامَةٌ.

'(নবী করীম ﷺ-কে ৩টি সাদা সাহুলী) সূতি (কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে)। এতে জামা ও পাগড়ি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'[4]

ইমাম আল-বায়হাকী-এর বর্ণনায় আছে,

...فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُوْلِيَّةٍ جُدُدٍ.

'(আমরা নবী করীম ﷺ-কে) ৩টি নতুন সুতি কাপড়ে কাফন দিয়েছি।'[5]

اَلسُّحُوْلِيَّةِ শব্দটি س-এ ফাতাহ ও যাম্মা উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[6]

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী বলেন, س-এ ফাতাহ-সহকারেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এটিই অধিকাংশ বিশষজ্ঞের বর্ণনা।[7]

---

[1] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ৩৫, হাদীস: ১৮৯৭

[2] আবদুর রায্‌যাক আস-সানআনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৩, পৃ. ৪২১, হাদীস: ৬১৭১

[3] (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৩৯৯, হাদীস: ১০১০, ১০১১ ও ১০১২; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৫, হাদীস: ১২৬৪, খ. ২, পৃ. ৭৭, হাদীস: ১২৭৩ ও খ. ২, পৃ. ১০২, হাদীস: ১২৭৮; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬৪৯–৬৫০, হাদীস: ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ (৯৪১); (ঘ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৭২, হাদীস: ১৪৬৯; (ঙ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১৯৮, হাদীস : ৩১৫১; (চ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৯৯৬; (ছ) আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৫, হাদীস: ১৮৯৭, ১৮৯৮ ও ১৮৯৯

[4] (ক) আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৫, হাদীস: ১২৬৪ ও খ. ২, পৃ. ৭৭, হাদীস: ১২৭১; (খ) মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬৪৯, হাদীস: ৪৫ (৯৪১); (গ) আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৫, হাদীস: ১৮৯৯

[5] আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৫৬০, হাদীস: ৬৬৭৩, হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত

[6] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ*, খ. ৭, পৃ. ৭, হাদীস: ৯৪১

[7] আন-নাওয়াওয়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৭, হাদীস: ৯৪১

হযরত আয়িশা, হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল প্রমুখ থেকে মুতাওয়াতির (সুনিশ্চিত সনদে) বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম-কে ৩টি কাপড়েই কাফন দেওয়া হয়েছে। আর এতে জামা ও পাগড়ি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'[১]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ سَبْعَةِ أَثْوَابٍ.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল থেকে বর্ণিত, (হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী) ইবনুল হানাফিয়া থেকে বর্ণিত, হযরত আলী থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ-কে ৭টি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে।'

এ-হাদীসটি ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল) তাঁর *মুসনদে* বর্ণনা করেছেন।[২]

ইমাম ইবনে হাযম বলেন, (হযরত রাসূলুল্লাহ-কে ৭টি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে—এ-ব্যাপারে) আকীল ও তাঁর পরবর্তী লোকেরা এখানে সন্দিহান ছিলেন।[৩]

হাদীসের ভাষ্য: لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَّلَا عِمَامَةٌ-এর অর্থ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এর সঠিক অর্থ হল, কাফনে জামা ও পাগড়ি আসলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, নবী করীম-কে যে ৩টি কাপড়ের কাফন দেওয়া হয়েছে সেসব ছিল জামা ও পাগড়ির বাইরে।[৪]

শায়খ তকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেছেন, 'উদ্দেশ্যগতভাবে প্রথমটিই (কাফনে জামা ও পাগড়ি আসলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল না) সুস্পষ্ট।'[৫]

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী *সহীহ মুসলিমের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'নিশ্চয়ই প্রথম মতটিই (কাফনে জামা ও পাগড়ি আসলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল না) অধিকাংশ আলিমের মত।'

---

[১] আল-বায়হাকী, *মুখতাসারুল খিলাফিয়াত*, খ. ২, পৃ. ৩৯৯, মাসআলা: ১৯১
[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ১৮২, হাদীস: ৮০১
[৩] ইবনে হাযম আল-উন্দুলুসী, *আল-মুহাল্লা বিল-আসার*, খ. ৩, পৃ. ৩৪০, মাসআলা: ৫৬৫
[৪] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৯
[৫] ইবনে দকীকুল ঈদ, *ইহকামুল ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ৩৬৬, হাদীস: ১৫৯ (৪)

তিনি আরও বলেন, 'হাদীস প্রকাশ্য দাবি অনুযায়ী (কাফনে জামা ও পাগড়ি আসলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল না) কথাটিই সঠিক।'

তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় (নবী করীম ﷺ-কে যে ৩টি কাপড়ের কাফন দেওয়া হয়েছে সেসব ছিল জামা ও পাগড়ির বাইরে—এ) মতটি দুর্বল। নবী করীম ﷺ-এর কাফনে জামা ও গাড়ড়ি ছিল বিষয়টি প্রমাণিত নয়।[১] সমাপ্ত।

আলিমগণ বলেন, হাদীসের ব্যাখ্যায় এ-মতভেদের ভিত্তিতে তাঁদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয় যে, কাফনে জামা ও পাগড়ি দেওয়া মুস্তাহাব কি না?

এ-কারণে কাফনে ৩ লিফাফার সঙ্গে জামা ও পাগড়ি অতিরিক্তসহ মোট ৫টি (কাপড়) দেওয়া বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। হাম্বলিদের এটা মাকরূহ। শাফিয়ীদের মতে, এটি জায়িয, তবে মুস্তাহাব নয়। আর মালিকিদের মতে, পুরুষ-মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে এটি মুস্তাহাব। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা এও বলেন যে, ৭টি পর্যন্ত অতিরিক্ত দেওয়া যেতে পারে, এতে মকরূহ হবে না; তবে এর বেশি হলে সেটি অপচয়ের পর্যায়ে পড়বে। হানাফীদের মতে, নিশ্চয় তিন কাপড় হচ্ছে ইযার, জামা ও লিফাফা।[২]

হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যে-জামায় নবী করীম ﷺ-কে গোসল দেওয়া হয়েছিল তা তাঁর কাফনের সময় খুলে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ *সহীহ মুসলিমের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, এটিই সঠিক, এ-ক্ষেত্রে অন্যকিছু বিবেচ্য নয়। তবে *সুনানে আবু দাউদে* বর্ণিত হাদীস,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: اَلْـحُلَّةُ ثَوْبَانِ، وَقَمِيْصُهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-কে ৩টি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দুটো সাধারণ কাপড় ও একটি জামা যা ইন্তিকালের সময় তাঁর পরনে ছিল।'[৩]

---

[১] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ*, খ. ৭, পৃ. ৮, হাদীস: ৯৪১
[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৮০
[৩] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১৯৯, হাদীস : ৩১৫৩

এই হাদীসটি দুর্বল। এটি দ্বারা দলিল হিসেবে পেশ করা সঠিক নয়। কারণ (এর অন্যতম বর্ণনাকারী) ইয়াযীদ ইবনে যায়দ সর্বসম্মতভাবে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। বিশেষত নির্ভরযোগ্য হাদীসের বিরোধী বর্ণনা (সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য)।[১]

নবী করীম ﷺ-এর সালাতে জানাযা

وَرَوٰى عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِغَيْرِ إِمَامٍ.

'আর হযরত মুহাম্মদ (ইবনে আলী ইবনে হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ-এর নামায ইমাম ছাড়াই পড়া হয়েছে।'[২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

أَفْذَاذًا؛ لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ، يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ زُمَرًا، فَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ وَيَخْرُجُوْنَ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ نَادَىٰ عُمَرُ: خَلُّوا الْجَنَازَةَ وَأَهْلَهَا.

'(নবী করীম ﷺ-এর নামায) পৃথক পৃথকভাবে (পড়া হয়েছে); নবী করীম ﷺ-এর নামাযে কোন ইমাম ছিল না। মুসলিমরা জনে জনে (নবী করীম ﷺ-এর হুজরায়) প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর নামায আদায় করে বেরিয়ে পড়েছেন। যখন সবাই নামায পড়া শেষ করেন হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু) ডেকে বললেন, জানাযার জন্য আহলে বায়তকে সুযোগ দাও।'[৩]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

صَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ، وَالْعَبَّاسُ، وبَنُوْ هَاشِمٍ، ثُمَّ دَخَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ، ثُمَّ الْأَنْصَارُ، ثُمَّ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا؛ لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ النِّسَاءُ، ثُمَّ الْغِلْمَانُ.

---

[১] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ*, খ. ৭, পৃ. ৮, হাদীস: ৯৪১
[২] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ২৩৪৯
[৩] (ক) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭১; (খ) ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ২৩৪৯, হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত ও খ. ২, পৃ. ২৫২, হাদীস: ২৩৩৬, হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

'হযরত আলী, হযরত আব্বাস ও বনী হাশিমের লোকজন (সর্বপ্রথম) নবী করীম-এর জানাযার নামায পড়েন। তারপর মুহাজিরগণ প্রবেশ করেন, এরপর আনসারগণ, এরপর অন্যান্য লোকজন; পৃথক পৃথকভাবে (নবী করীম-এর নামায পড়েছেন); তাঁর নামাযে কোন ইমাম ছিল না। অতঃপর মহিলাগণ, এরপর শিশু-কিশোরগণ (জানাযা আদায় করেন)।'[১]

বলা হয়েছে যে, এ-ব্যাপারে নবী করীম অসিয়ত করেছেন, তিনি বলেন,

«أَوَّلُ مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيَّ رَبِّيْ، ثُمَّ جِبْرَئِيْلُ، ثُمَّ مِيْكَائِيْلُ، ثُمَّ إِسْرَافِيْلُ، ثُمَّ مَلَكُ الْمَوْتِ مَعَ جُنُوْدِهِ، ثُمَّ الْمَلَائِكَةُ؛ ثُمَّ ادْخُلُوْا فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ».

'(ইন্তিকালের পর) সর্বপ্রথম যিনি আমার ওপর দরূদ পড়বেন তিনি হলেন আমার প্রভু, এরপর হযরত জিবরাইল, এরপর হযরত মিকাইল, এরপর হযরত ইসরাফিল, এরপর মালাকুল মওত (হযরত আযরাইল), এরপর ফেরেশতাকুল। এরপর তাঁরা সদলবলে প্রবেশ করবেন।'[২]

হাদীস; এ-হাদীসটি দুর্বল। আরও বলা হয়েছে যে,

بَلْ كَانُوْا يَدْعُوْنَ وَيَنْصَرِفُوْنَ.

'রবং ফেরেশতাগণ প্রার্থনা করতেন এবং পর্যায়ক্রমে চলে যেতেন।'[৩]

ইমাম ইবনুল মাজিশূন বলেন,

لَمَّا سُئِلَ كَمْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةً؟ قَالَ: اثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ صَلَاةً كَحَمْزَةَ، فَقِيْلَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ: مِنَ الصَّنْدُوْقِ الَّذِيْ تَرَكَهُ مَالِكٌ بِخَطِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

'যখন প্রশ্ন করা হল যে, নবী করীম-এর ওপর কতবার দরূদ পাঠ করা হয়েছে? জবাবে বলেন, ৭২ হাজার বার। অতঃপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়, বিষয়টি আপনি কীভাবে জানলেন? তিনি বললেন,

[১] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*
[২] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*
[৩] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*

মালিকের সিন্দুকে পাওয়া তাঁর এক চিঠির সূত্রে (এ-তথ্য পাওয়া গেছে), যা হযরত নাফি' কর্তৃক হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে।'[১]

সিরাতে মুগলতায়ীতে এ-রকমই এসেছে।[২] ইমাম ইবনে মাজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে,

لَمَّا فَرَغُوْا مِنْ جِهَازِهِ ﷺ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وُضِعَ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ فِيْ بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ ﷺ أَرْسَالًا يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغُوْا دَخَلَ النِّسَاءُ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغْنَ دَخَلَ الصِّبْيَانُ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ.

'মঙ্গলবারে যখন সাহাবাগণ নবী করীম ﷺ-এর গোসলের কাজ শেষ করেন, তখন তাঁকে তাঁর ঘরের ভেতরে তাঁরই খাটের ওপর রাখা হয়। এরপর লোকজন দলে দলে ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাঁর নামাযে জানাযা আদায় করেন। তাঁদের নামায আদায়ের পর মহিলারা প্রবেশ করেন, তাঁদের অব্যবহিত পর শিশু-কিশোরগণ প্রবেশ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাযায় কোনো ইমাম ছিল না।'[৩]

অন্য এক বর্ণনা আছে,

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَفْوَاجًا، ثُمَّ أَهْلُ بَيْتِهِ، ثُمَّ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، ثُمَّ نِسَاؤُهُ آخِرًا.

'সর্বপ্রথম দলে দলে নবী করীম ﷺ-এর জানাযা নামায পড়েন ফেরেশতাগণ, এরপর নবী করীম ﷺ-এর পরিবার-পরিজন, এরপর সাধারণ মুসলিমরা দলে দলে (তাঁর জানাযার নামায পড়েন), এরপর অন্যান্য মহিলাগণ।'[৪]

---

[১] আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭১

[২] আলাউদ্দীন মুগলতায়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮—১০৯

[৩] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫২০, হাদীস: ১৬২৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত

[৪] মোল্লা আলী আল-কারী, *জমউল ওয়াসায়িল শরহুশ শামায়িল*, খ. ২, পৃ. ২১৭

وَرَوَى، أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى أَهْلُ بَيْتِهِ، لَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَا يَقُوْلُوْنَ، فَسَأَلُوْا ابْنَ مَسْعُوْدٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوْا عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُمْ: قُوْلُوْا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾ [الأحزاب]، لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، صَلَوَاتُ اللهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَالنَّبِيِّيْنَ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِيْنَ، وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الشَّاهِدِ، الْبَشِيْرِ، الدَّاعِيْ إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ، السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ، وَعَلَيْهِ السَّلَامِ.

'আরও বর্ণনা করেন, যখন নবী করীম ﷺ-এর পরবিার-পরিজন নামায পড়েন। তখন লোকজন বুঝতে পারছিল না, তাঁরা কী পড়ছিলেন। তাঁরা হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ رضي الله عنه-এর কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি তাঁদেরকে হযরত আলী رضي الله عنه-এর কাছে বিষয়টি জিজ্ঞেস করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবী করীম ﷺ-এর ওপর রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবী করীম ﷺ-এর জন্যে রহমতের তরে দুআ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।'[১] হে আল্লাহ! আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিই আমাদের সাহায্যকারী। আল্লাহ যিনি পবিত্র ও দয়ালু, তাঁর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণ, সকল নবী, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ, পূণ্যাবানগণ, হে বিশ্বজাহানের মালিক! যারা পবিত্রতার সাথে আপনার তাসবীহ পাঠ করেন; এদের সকলের পক্ষ থেকে শেষনবী, রাসূল-সরদার, আল্লাহভীরুদের মধ্যমণি, বিশ্বজাহানের রাসূল, সাক্ষী, সুসংবাদতা, আপনার নির্দেশে আপনার পথের আহবায়ক ও উজ্জ্বল প্রদীপ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর ওপর দরুদ ও সালাম।'[২]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব,* ৩৩:৫৬

[২] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা,* খ. ২, পৃ. ৭২; এ-দুআটি ও বর্ণনাটি কোনো হাদীস বা দুআ-বিষয়ক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, সাধারণত মুসলিমরা বিশেষত হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা জানাযার নামাযে নিচের দুআটিই পড়ে থাকেন,

লোকটি হযরত আবু ওবায়দা ﷛-কে খুঁজে পাননি। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বগলী কবর খনন করা হয়।'[১]

وَرَوَى، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوْا فِيْ مَوْضِعِ دَفْنِهِ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِيْنَةِ فِي الْبَقِيْعِ أَوِ الْقُدْسِ حَتَّىٰ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَمْ يُقْبَرْ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوْتُ».

'আরও বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ নবী করীম ﷺ-এর দাফনের জায়গা মক্কায় হবে কি, মদীনার বকিতে হবে, আল-কুদসে হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একপর্যায়ে হযরত আবু বকর ﷛ বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক নবী যে-জায়গায় ইন্তিকাল করেছেন সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়।''[২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

«مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ»، فَأَخَّرُوْا فِرَاشَهُ، وَحَفَرُوْا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ.

'আল্লাহ নবীগণকে সেই জায়গাতেই ইন্তিকালের ব্যবস্থা করেন, যেখানে তিনি সমাধিস্থ হতে পছন্দ করেন। অতএব তোমরা নবী করীম ﷺ-এর বিছানাপত্র উঠিয়ে এবং বিছানার নিচেই তাঁর জন্য সমাধি তৈরি কর।'[৩]

وَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَالْعَبَّاسُ، وَالْفَضْلُ، وَقُثَمُ أَبْنَاءُ الْعَبَّاسِ، وَكَانَ قُثَمُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، لِأَنَّهُ آخِرُ مَنْ صَعِدَ مِنْ قَبْرِهِ.

---

[১] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৫২, হাদীস: ৩২১৭

[২] (ক) আবদুর রায্যাক আস-সানআনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৫, পৃ. ৪৩২, হাদীস: ৯৫২২; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ২০৬, হাদীস: ২৭

[৩] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৩২৯, হাদীস: ১০১৮; (খ) আবদুর রায্যাক আস-সানআনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৪৩২, হাদীস: ৯৫২২; (গ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০৬, হাদীস: ২৭, হযরত আবু বকর ﷛ থেকে বর্ণিত

বর্ণনাটি শায়খ যয়নুদ্দীন আল-মারাগী তাঁর *তাহকীকুন নুসরা* গ্রন্থে উল্লেখ করেন।[১]

নবী করীম ﷺ-এর দাফন ও রওযার ধরন বিষয়ে আলোচনা

كَانَ فِي الْـمَدِيْنَةِ حُفَّارَانِ: أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ، وَالْآخَرُ لَا يَلْحَدُ، وَدَعَا الْعَبَّاسُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: لِيَذْهَبْ أَحَدٌ كُمَا إِلَىٰ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْـجَرَّاحِ، وَهُوَ كَانَ يَضْرَحُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَلِيَذْهَبِ الْآخَرُ إِلَىٰ أَبِيْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ كَانَ يَلْحَدُ لِأَهْلِ الْـمَدِيْنَةِ، ثُمَّ قَالَ الْعَبَّاسُ: اَللّٰهُمَّ خِرْ لِرَسُوْلِكَ، فَذَهَبَا، فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُ أَبِيْ عُبَيْدَةَ أَبَا عُبَيْدَةَ. فَلُحِدَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

'মদীনায় দু'জন কবর খননকারী লোক ছিলেন; একজন বগলী কবর তৈরি করতেন, অন্যজন কবর বগলী করতেন না। হযরত আব্বাস দু'জন লোক ডেকে বললেন, একজন যেন হযরত আবু ওবাইদা ইবনুল জাররাহ-এর কাছে যাবে যিনি মক্কাবাসীর জন্য সিন্দুকি কবর খনন করেন এবং অন্যজন যেন হযরত আবু তালহা আল-আনসারী-এর কাছে যাবে যিনি মদীনাবাসীর জন্য বগলী কবর খনন করেন। এরপর হযরত আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তোমার রাসুলের জন্য উত্তম ব্যবস্থাটিই করো। তাঁরা দু'জনই বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর হযরত আবু ওবায়দা-এর নিকট পাঠানো

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ».

'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী; সবারই আপনি ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে যাদের আপনি জীবিত রাখতে চান তাকে ইসলামী জীবনাদর্শে জীবিত রাখুন। আর যাদের আপনি মৃত্যুদান করতে চান তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যুদান করুন।'

—আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৪, পৃ. ৪০৬, হাদীস: ৮৮০৯, হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন জানাযার নামাযে বলতেন যে, '... ।'

[১] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৮১

'হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ؓ, হযরত আব্বাস ؓ, তাঁর দু'পুত্র হযরত ফযল (ইবনে আব্বাস ؓ) ও হযরত কুসাম (ইবনে আব্বাস ؓ) প্রমুখ নবী করীম ﷺ-এর কবরে অতরন করেন। আর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে শেষ পর্যন্ত যিনি ছিলেন তিনি হলেন হযরত কুসাম (ইবনে আব্বাস ؓ)। কেননা তিনিই নবী করীম ﷺ-এর রওযা থেকে সর্বশেষে ওঠে এসেছেন।'[১]

নবী করীম ﷺ-এর রওযায় হযরত আল-মুগীরা (ইবনে শু'বা ؓ)-এর আংটি ফেলে আসা এবং সেটি উদ্ধারের জন্য তিনি পুনরায় রওযায় নেমেছিলেন মর্মে যে-ঘটনাটি রয়েছে তা সঠিক নয়।[২] আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

وَشُقْرَانُ مَوْلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ قَالَ أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ: يَا عَلِيُّ! أَنْشُدُكَ اللهَ، حَظَّنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: انْزِلْ، فَنَزَلَ مَعَ الْقَوْمِ، وَكَانُوْا خَمْسَةً.

'(নবী করীম ﷺ-এর কবরে আরও যারা অবতরন করেন তারা হলেন) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদিম হযরত শুকরান ؓ। হযরত আওস ইবনে খাওলী ؓ হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ؓ-কে বললেন, হে আলি! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি! আমাকে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম খিদমতে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিন। হযরত আলী ؓ বললেন, এসে পড় তাহলে। অতএব তিনিও তাঁদের সাথে যোগ দেন, তাঁরা মোট ৫জন (নবী করীম ﷺ-এর দাফনে অংশ) নেন।'[৩]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

عَنْ عَلِيٍّ، نَزَلَ فِيْ حُفْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ، وَالْعَبَّاسُ، وَعَقِيْلُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عَوْفٍ، وَأَوْسُ بْنُ خَوَلِيٍّ؛ وَهُمُ الَّذِيْنَ وَلُّوْا كَفَنَهُ.

---

[১] (ক) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ৩২২১; হযরত আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত; (খ) আল-কাসৃতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৮২; (গ) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭২

[২] আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ২৫৭, হাদীস: ৩২৩০

[৩] আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ৩২২১, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ؓ থেকে বর্ণিত; (খ) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭১

'হযরত আলী ﵁ থেকে বর্ণিত, আমি, হযরত আব্বাস ﵁, হযরত আকীল ইবনে আবু তালিব ﵁, হযরত উসামা ইবনে যায়দ ﵁, হযরত (আবদুর রহমান) ইবনে আউফ ﵁ ও হযরত আওস ইবনে খাওলী ﵁; নবী করীম ﷺ-এর রওযায় নেমেছিলেন আর এরা সবাই তাঁরর কাফনে অংশ নিয়েছিলেন।'[১]

প্রথম বর্ণনাই অধিকতর বিশুদ্ধ।[২]

وَقَدْ كَانَ شُقْرَانُ حِيْنَ وُضِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حُفْرَتِهِ، أَخَذَ قَطِيْفَةً نَجْرَانِيَّةً حَمْرَاءَ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهَا، وَيَفْرِشُهَا، فَطَرَحَهَا تَحْتَهُ، فَدَفَنَهَا مَعَهُ فِي الْقَبْرِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরে রাখার সময় হযরত শুকরান ﵁ একটি চাদর বিছিয়ে দেন, এটি একটি লাল নজরানি রেশমি চাদর যা খায়বার যুদ্ধের দিন তাঁর হস্তগত হয়েছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি পরতেন এবং বিছানায় ব্যবহার করতেন। অতঃপর চাদরখানি তিনি নবী করীম ﷺ-এর (রওযার) তলায় বিছিয়ে দেন আর এটিও নবী করীম ﷺ-এর সাথে রওযায় দাফন করে দেন। হযরত শুকরান ﵁ বলেন, আল্লাহর কসম! আপনার পর এটি আর কেউ পরতে পারে না।'[৩]

وَبُنِيَ فِيْ قَبْرِهِ اللَّبِنُ، يُقَالُ: تِسْعُ لَبِنَاتٍ.

'আর নবী করীম ﷺ-এর রওযায় কিছু ইঁট লাগানো হয়েছিল। বলা হয় যে, ৯টি ইঁট ছিল।'[৪]

فَلَمَّا فَرَغُوْا عَنْ وَضْعِ اللَّبِنَاتِ التِّسْعِ أَخْرَجُوا الْقَطِيْفَةَ.

---

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৬২, হাদীস: ২৪০১; এখানে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ﵁-এর প্রসঙ্গ নেই; (খ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭১

[২] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ৩২২১

[৩] আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ৩২২১, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত

[৪] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৫২, হাদীস: ৩২১৭, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত

'অতঃপর ইঁট নয়টি লাগানো হলে তাঁরা রেশমি চাদরটি উঠিয়ে নিয়ে নেন।'[1]

ইমাম আবু আমর ও ইমাম আল-হাকিম একথা বলেছেন।[2]

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী বলেন, ইমাম আশ-শাফিয়ী ও তাঁর অনুসারী অন্যান্য আলিমগণ পরিষ্কার বলেছেন যে, কবরে লাশের নিচে চাদর বা এ-জাতীয় কোনো কিছু রাখা মাকরূহ।

অবশ্য আমাদের অনুসারীদের মধ্যে একমাত্র আল-বগওয়ি বলেছেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। এ-হাদীসটি এর প্রমাণ।

তবে সঠিক বক্তব্য হল, এসব (কবরে লাশের নিচে চাদর বা এ-জাতীয় কোনো কিছু রাখা) মাকরূহ। সর্বসম্মতভাতে আলিমরা এই কথা বলেছেন।

তাঁরা এই হাদীসটির জবাবে বলেছেন যে, একমাত্র হযরত শুকরান-ই এ-কাজটি করেছেন, সাহাবাগণের কেউ এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। আর হযরত শুকরান এটি কেন করেছিলেন এর কৈয়ফিত আমরা তাঁর পক্ষ থেকে দিয়েছি যে, নবী করীম-এর পর কেউ সেটি ব্যবহার করবে তা তাঁর অপছন্দ ছিল।[3] (এখানে ইমাম আন-নাওয়াওয়ী-এর বক্তব্য) সমাপ্ত।

আর সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে,

أَنَّهَا أُخْرِجَتْ يَعْنِي الْقَطِيفَةَ مِنَ الْقَبْرِ لَـمَّا فَرَغُوا مِنْ وَضْعِ اللَّبِنَاتِ التِّسْعِ.

'নিশ্চয় যখন কবরে ইঁট রাখার অব্যবহিত পর রওযা থেকে চাদরখানি বের করে আনা হয়েছে।'[4]

এমনটি *সিরাতে মুগলতায়ী*তে উল্লেখ আছে।[5]

এরপর যথারীতি নবী করীম-এর কবরে মাটি ফেলা হয়।

وَجُعِلَ قَبْرُهُ مَسْطُوْحًا.

---

[1] আস-সনদী, *কিফায়াতুল হাজা*, খ. ১, পৃ. ৪৯৭, হাদীস: ১৬২৮; ইবনে ইবনে আবদুল বার্‌র থেকে উদ্ধৃত

[2] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭২

[3] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ*, খ. ৭, পৃ. ৩৪, হাদীস: ৯৬৭

[4] আস-সনদী, *প্রাগুক্ত*

[5] আলাউদ্দীন মুগলতায়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

'আর নবী করীম ﷺ-এর রওযা (মাটির সাথে) সমান করে দেওয়া হয়।'[১]

মিশকাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

عَنْ جَابِرٍ، وَكَانَ الَّذِيْ رَشَّ الْمَاءَ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﷺ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بِقِرْبَةٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ رِجْلَيْهِ.

'হযরত জাবির ইবনে (আবদুল্লাহ رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আর নবী করীম ﷺ-এর কবরে যিনি পানি ঢেলেছিলেন তিনি হলেন হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ رضي الله عنه; তিনি এক মশক পানি নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর মাথার দিক থেকে (ঢালা) শুরু করে পায়ের দিক পর্যন্ত গিয়ে শেষ করেন।'[২]

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী رحمه الله তাঁর *দালায়িলুন নুবুওয়ত* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৩]

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَآهُ مُسَنَّمًا.

'হযরত সুফিয়ান ইবনুত তামার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-এর রওযা উটের পিঠের মতো দেখেছেন।'[৪]

*সহীহ আল-বুখারী*তে হযরত আবু বকর ইবনে আইয়াশ رحمه الله-এর হাদীসে এসেছে,

أَنَّهُ رَأَىٰ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا أَيْ مُرْتَفِعًا.

'নিশ্চয় তিনি (সুফয়ান আত-তামার رضي الله عنه) নবী করীম ﷺ-এর রওযাকে উটের পিঠের আকারে অর্থাৎ উঁচু অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন।'[৫]

---

[১] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৬৪, হাদীস: ৩২৪০, হযরত মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] আত-তাবরীযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫৩৫, হাদীস : ১৭১০ (১৮)

[৩] আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ২৬৪, হাদীস: ৩২৪১, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৪] আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ২৬৪, হাদীস: ৩২৩৯; (খ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭২

[৫] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০৩, হাদীস: ১৩৯০; (খ) আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৮৩

ইমাম আবু নুআইম (আল-আসবাহানী) তাঁর আল-মুস্তাখরাজ গ্রন্থে অতিরিক্ত আরও উল্লেখ করেন যে,

وَقَبْرُ أَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَذٰلِكَ.

'হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব)-এর রওযাও অনুরূপ ছিল।'[১]

এর দ্বারা দলিল দেওয়া হয় যে, উটের পিঠের আকারে কবর তৈরি করা মুস্তাহাব। এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক (ইবনে আনাস), ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল), ইমাম আল-মুযানী ও অধিকাংশ শাফিয়ীদের বক্তব্য।

তবে পূর্বসূরি কিছু শাফিয়ীদের মতে, তাঁরা (কবরকে) সমতলভাবে তৈরি করাকে মুস্তাহাব মনে করেন। আর প্রথম দিকে (নবী করীম ﷺ-এর কবর) সমতল ছিল, একথার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।[২]

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّهُ كَشَفَتْ عَائِشَةُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ قَبْرِهِ ﷺ وَعَنْ قَبْرِ صَاحِبَيْهِ ثَلَاثَةِ قُبُوْرٍ لَا مُشْرِفَةٍ، وَلَا لَاطِئَةٍ، مَبْطُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ.

'হযরত আয়িশা কাসিম ইবনে মুহাম্মদের জন্য নবী করীম ﷺ-এর রওযা ও তাঁর দু'সঙ্গী (হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব); এই তিন জনের রওযা খুলে দেন। যা বেশি উঁচুও ছিল না, আবার নিচুও ছিল না। আর এগুলোর ওপর ময়দানের লাল কাঁকর ছড়ানো ছিল।'[৩]

অন্য এক বর্ণনা মতে,

حَمْرَاءَ وَبَيْضَاءَ.

---

[১] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*

[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৮৩–৫৮৪

[৩] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ২১৫, হাদীস : ৩২২০; (খ) আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫২৪, হাদীস: ১৩৬৮, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত; (গ) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭২

'মক্কার লাল ও শ্বেতপাথরের তৈরি ছিল।'[১]

وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ.

'নবী করীম ﷺ-এর রওযা মাটি থেকে এক বিঘতের মতো উঁচু ছিল।'[২]

বস্তুত কবর উঁচু করার কাজটি হযরত মুআবিয়া رضي الله عنه-এর খিলাফতামলে সম্পন্ন হয়েছিল। নবী করীম ﷺ-এর রওযা প্রথমে সমতল ছিল, এরপর (খলীফা) ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয رحمه الله মদীনার শাসক ছিলেন, সেসময় যখন কবরের দেয়াল তৈরি করেন তখন নবী করীম ﷺ-এর রওযা উঁচু করার কাজটি সম্পন্ন করেন।[৩]

এরপর (উঁচু কবর, না সমতল) কোনটি উত্তম এ-বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ই বৈধ, তবে সমতল করা প্রাধান্য পাবে। যেহেতু মুসলিম কর্তৃক হযরত ফুযালা ইবনে আবু ওবাইদুল্লাহ رحمه الله-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرٍ، فَسَوَّى، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.

'তিনি একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর সেটি সমান করে দেন। তারপর তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরকে সমতল করতে নির্দেশ দিতে শুনেছি।'[৪]

وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُقَدَّمٌ، وَأَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ بَيْنَ كَتِفَيِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ هٰكَذَا.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছিলেন সবার আগে, নবী করীম ﷺ-এর দু'কাঁধ বরাবর তাঁর মাথার কাছে হযরত আবু বকর رضي الله عنه ছিলেন আর হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه)-এর ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর পায়ের কাছে এ-রকম ছিলেন:'[১]

---

[১] মোল্লা আলী আল-কারী, *জমউল ওয়াসায়িল শরহুশ শামায়িল*, খ. ২, পৃ. ২১৮

[২] ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ১৪, পৃ. ৬০২, হাদীস : ৬৬৩৫, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৩] আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৮৪

[৪] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬৬৬, হাদীস: ৯২ (৯৬৮), হযরত সুমামা ইবনে সুফাইয়া رحمه الله থেকে বর্ণিত
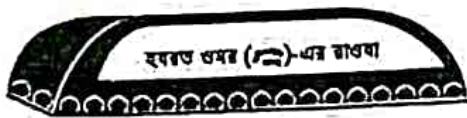
ইমাম আস-সামহূদী তাঁর *খুলাসাতুল ওফায়* এমনটি বর্ণনা করেছেন।[২]

ইমাম রাযীন উল্লেখ করেছেন যে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مُقَدَّمٌ، وَأَبُوْ بَكْرٍ خَلْفَ رَأْسِهِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ ﷺ، وَطَالَتْ رِجْلَاهُ أَسْفَلَ، وَعُمَرُ خَلْفَ أَبِيْ بكر بَكْرٍ هَكَذَا.

'হযরত রাসূলুল্লাহ সর্বাগ্রে ছিলেন, নবী করীম -এর মাথার একটু পিছে তাঁর কাঁধ বরাবর হযরত আবু বকর ছিলেন; তাঁর দু'পা কিছু আগে বেরিয়ে ছিল, আর হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) ছিলেন হযরত আবু বকর -এর একটি পিছে। এ-রকম:[৩]
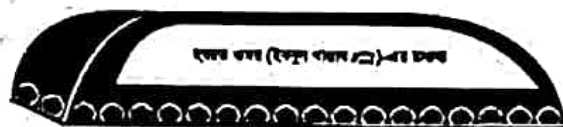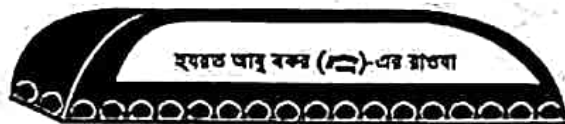
وَصِفَةُ الْقُبُوْرِ الشَّرِيْفَةِ بِالْحُجْرَةِ الْمُنِيْفَةِ، فَقِدِ اخْتَلَفَ فِيْهَا عَلَىٰ نَحْوِ سَبْعِ كَيْفِيَاتٍ؛ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ بِأَدِلَّتِهَا، وَالَّذِيْ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَامَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ مُقَدَّمًا أَيْ لِجِدَارِ الْقِبْلَةِ كَمَا سَيَأْتِيْ، ثُمَّ قَبْرُ أَبِيْ

---

[১] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ২১৫, হাদীস : ৩২২০; (খ) আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫২৪, হাদীস: ১৩৬৮, হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত

[২] আস-সামহূদী, (ক) *ওয়াফাউল ওয়াফা*, খ. ২, পৃ. ১১৬; (খ) *খুলাসাতুল ওয়াফা*, খ. ২, পৃ. ১৪৩

[৩] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭২

بَكْرٍ عِنْدَ حِذَاءِ مَنْكِبَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَبْرُ عُمَرَ عِنْدَ مَنْكِبَيْ أَبِيْ بَكْرٍ، وَهٰذِهِ صِفَتُهُ.

'গৃহাভ্যন্তরের (নবী করীম ﷺ ও দু'খলীফার) পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ রওযার তাৎপর্য কি এ-নিয়ে সাত সাতটি মতভিন্নতা পাওয়া যায়। মূল[১] কিতাবে গ্রন্থে আমরা তা প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তবে অধিকাংশের কাছে নবী করীম ﷺ-এর মাথা কিবলা তথা কিবলার দেওয়ালের সাথে অগ্রগণ্য ছিল; বিবরণ সামনে আসবে। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধ বরাবর থেকে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর রওযা। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর কাঁধ বরাবর থেকে শুরু হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব (রাযি.))-এর রওযা। এই ছিল এর তাৎপর্য।'

এ-বিবরণ *খুলাসাতুল ওয়াফা* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।[২]

হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর হাদীসে আছে, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، لَوْلَا ذٰلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ - أَوْ خُشِيَ - أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগশয্যায় বলেছেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর লা'নত হোক। কারণ তারা নিজেদের নবীগণের কবরকে সাজদার স্থানে পরিণত করেছে। (হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন,) এ-ধরনের আশঙ্কা না থাকলে তাকলে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরকে (ঘরের বেষ্টনীতে সংরক্ষিত না রেখে) খোলা রাখতো বা খোলা রাখা হতো।'[৩]

বর্ণনাকারীর সংশয়, শব্দটি خُشِيَ কর্মবাচক, না خَشِيَ কর্তাবাচক! প্রথম অবস্থায় ক্রিয়াটি সর্বনাম ঘটনার পটভূমি বর্ণনার জন্য; এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, (নবী করীম ﷺ-এর রাওযা ঘরের বেষ্টনীতে সংরক্ষিত রাখার) বিষয়টি সাহাবাগণ সম্মিলিতভাবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে করেছেন। আর দ্বিতীয়

---

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা*, খ. ২, পৃ. ১১৫
[২] আস-সামহূদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা*, খ. ২, পৃ. ১৪২
[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০২–১০৩, হাদীস: ১৩৯০ ও খ. ৬, পৃ. ১১, হাদীস: ৪৪৪১

অবস্থায় এর তাৎপর্য হবে নবী করীম ﷺ নিজেই এ-ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

أُبرِزَ قَبرُهُ-এর অর্থ হলো নবী করীম ﷺ-এর রাওযা খোলা রাখা হতো, চারপাশে দেয়াল নির্মাণ না করা হতো। অর্থাৎ ঘরের বাইরে বাইরে দাফন করা।

হযরত আয়িশা رضي الله عنها একথা মসজিদে নববী সম্প্রসারণের পূর্বে ব্যক্ত করেছিলেন। এজন্য যখন মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয় তখন নবী করীম ﷺ-এর হুজরাকে ত্রিকোণ আকৃতি করে দেওয়া হয়, যাতে কেউ নামাযের সময় কিবলামুখী হতে হয়ে মর্যাদাপূর্ণ রওযাকে সাজদা না করতে হয়।

সিরাত-বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেন,

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: بَقَىٰ فِي الْبَيْتِ مَوْضَعُ قَبْرٍ فِي السَّهْوَةِ الشَّرْقِيَّةِ يُدْفَنُ فِيْهِ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ ﷺ.

'হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘরের ভেতরে পূর্ব পাশে একটি কবরের জায়গা খালি রয়েছে। সেখানে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-কে দাফন করা হবে।'[১]

নবী করীম ﷺ-এর দাফনের সময়ের আলোচনা

নবী করীম ﷺ-এর দাফন নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে।

رَوَىٰ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ فِي السَّحَرِ.

'হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন বিষয়ে আমাদের কিছুই জানাই ছিলো না। পরিশেষে মঙ্গলবার ভোরে খুন্তি দিয়ে মাটি খোঁড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম।'[২]

আর *আল-মুওয়াত্তা* গ্রন্থে এসেছে,

بَلَغَ مَالِكًا، أَنَّهُ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ.

---

[১] ইবনুন নাজ্জার, *আদ-দিররাতুস সমীনা*, পৃ. ১৪৬

[২] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৬৫, হাদীস: ২৪১৯

'ইমাম মালিক (ইবনে আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জানতে পেরেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেছেন সোমবারে, আর তাঁকে দাফন করা হয়েছে মঙ্গলবারে।'[১]

ইমাম আত-তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনা মতে,

فِيْ لَيْلَتِهَا فِيْ مَكَانِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ.

'যে-মাটিতে তিনি ইন্তিকাল করেন সেই মাটিতে তাঁকে রাতে দাফন করা হয়।'[২]

وَرَوَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ قَالَ: قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، فَمَكَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ فِي اللَّيْلِ أَيْ لَيْلَةَ الْأَرْبَعَاءِ.

'ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার বিদায় নেন, সেদিন ও মঙ্গলবার পর্যন্ত তিনি ওই অবস্থায় ছিলেন। এর পরের রাত অর্থাৎ বুধবার তাঁকে দাফন করা হয়।'[৩]

কেউ কেউ বলেছেন,

دُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ.

'মঙ্গলবারে সূর্যাস্তের পর তাঁকে দাফন করা হয়।'[৪]

ইমাম আশ-শাআবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *কিফায়া* গ্রন্থে আছে,

صَلُّوْا عَلَيْهِ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، ثُمَّ دُفِنَ.

'মঙ্গলবার তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর নামাযে জানাযা আদায় করেন এবং এরপর তাঁকে দাফন করা হয়।'[৫]

---

[১] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৩৮৩, হাদীস: ৯৭১

[২] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭২

[৩] (ক) আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭২; (খ) আত-তিরমিযী, *আশ-শামায়িল*, পৃ. ৩৩৫, হাদীস: ৩৯৫; তিনি মুহাম্মদ আল-বাকির রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন

[৪] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৬৫, হাদীস: ২৪২১ ও ২৪২২; হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, খ. ৩, পৃ. ৬–৭, হাদীস: ২৭৬৮ ও ২৭৬৯; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[৫] আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭২

যদি আপনি জানতে চান, নবী করীম ﷺ-এর দাফনে বিলম্ব করা হ কেন? অথচ নবী করীম ﷺ তাঁর পরিবার যাঁরা তাঁদের কোন মৃত্যুব্যক্তি দাফনে বিলম্ব করছিলেন তাঁদেরকে বলেছেন যে,

«عَجِّلُوْا دَفْنَ مَيِّتِكُمْ، وَلَا تُؤَخِّرُوْهُ».

'তোমরা তোমাদের মৃতদেহ দ্রুত দাফন কর, বিলম্ব করো না।'[১]

এর জবাব হচ্ছে, উল্লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকাল নিয়ে সাহাবাগণের ঐক্যমত্যে না পৌছুতে পারা এবং তাঁর দাফনের স্থান নিয়ে তাঁদের মতপার্থক্য এর অন্যতম কারণ।

অথবা খিলাফতের নেতা মনোনয়ন নিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার মতভেদ নিরসনে তাঁরা প্রয়াসী ছিলেন। যা ইসলামের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতঃপর তাঁরা হযরত আবু বকর رضي الله عنه-এর হাতে বায়আত নেন। এরপর সবাই সমবেতভাবে দ্বিতীয়বার বায়আত নেন। এরপর তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর দিকে মনোযোগ দেন এবং তাঁর দাফনের কাজে লেগে যান। পর্যায়ক্রমে তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর গোসল, কাফন ও দাফনের কাজ সম্পন্ন করেন। আল্লাহ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।[২]

ইমাম আদ-দারিমী رحمه الله-এর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ وَلَا أَضْوَأَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ، وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَّاتَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

হযরত আনাস (ইবনে মালিক رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের (মদীনায়) আগমন করেন সেদিনটির চেয়ে সুন্দর ও রৌদ্রোজ্জ্বল দিন দ্বিতীয়টি আমি দেখিনি। আর যেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ছেড়ে বিদায় নেন সেই দিনটার মতো গুমোট ও ধুয়াশাচ্ছন্ন দিন দ্বিতীয়টা আমি দেখিনি।'[৩]

ইমাম আত-তিরমিযী رحمه الله-এর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْهُ، قَالَ: لَـمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْـمَدِيْنَةَ أَضَاءَ

---

[১] মোল্লা আলী আল-কারী, *জমউল ওয়াসায়িল শরহুশ শামায়িল*, খ. ২, পৃ. ২১০
[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৮৫–৫৮৬
[৩] আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৩, হাদীস: ৮৯

مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا مِنَ التُّرَابِ، وَإِنَّا لَفِيْ دَفْنِهِ حَتَّىٰ أَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا.

'(হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আগমন করেন সবকিছু ছিলো ঝলমলে। আর যেদিন তিনি প্রভুর ডাকে সাড়া দেন সেদিন সবকিছুই ছিল শোকাচ্ছন্ন। আমরা দাফনের কাজ সম্পন্ন করে হাতের মাটি এখনো ঝেড়ে নেয়নি, ইত্যবসের আমাদের মানসিক পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়ে উঠে।'[১]

নবী করীম ﷺ-এর ওপর শোকগাঁথা ও মরসিয়া বিষয়ে আলোচনা

وَلَـمَّا دُفِنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ ﷺ، فَقَالَتْ: كَيْفَ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوْا عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ.

'আর যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাফনের কাজ সম্পন্ন হয়, হযরত ফাতিমা ﷺ এসে বললেন, তোমাদের মন কীভাবে সায় দিলো হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর মাটি ঢালতে?'[২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

لَمَّا فَرَغُوْا مِنْ دَفْنِهِ ﷺ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ ﷺ، قَالَتْ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! دَفَنْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! كَيْفَ طَابَتْ قُلُوْبُكُمْ أَنْ تَحْثُوا التُّرَابَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَلَيْسَ كَانَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا مَرَدَّ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَقَعَدَتْ تَنْدُبُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَقُوْلُ: يَا أَبَتَاهُ! وَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! وَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، الْآنَ لَا يَأْتِي الْوَحْيُ، الْآنَ يَنْقَطِعُ عَنَّا جِبْرَئِيْلُ ﷺ، اَللّٰهُمَّ أَلْحِقْ رُوْحِيْ بِرُوْحِهِ، وَاشْفِعْنِيْ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ، وَلَا تَحْرِمْنِيْ أَجْرَهُ وَشَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৮৮–৫৮৯, হাদীস: ৩৬১৮

[২] (ক) ইবনুল জওযী, *সিফাতুস সাফওয়া*, খ. ১, পৃ. ৮৬; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ১৫, হাদীস: ৪৪৬২, হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত

'যখন সাহাবাগণ নবী করীম ﷺ-এর দাফনের কাজ সম্পন্ন করেন, তখন হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এসে বললেন, হে হাসানের পিতা! আপনারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। (হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে হাসানের পিতা! তোমাদের মন কীভাবে সায় দিলো যে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর মাটি ঢালতে? তিনি কি রহমতের নবী নন? তিনি (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ, (নিশ্চয় নবী করীম ﷺ শান্তির দূত)। হযরত কিন্তু আল্লাহ তাআলার হুকুম কেউ এতটুকু হেরফের করতে পারে না। একথায় হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলতে লাগলেন, হায় পিতা! হায় হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ! হায় রহমতের নবী! এখন থেকে আর ওহী আসবে না, এখন থেকে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম-এর আসাও বন্ধ হয়ে গেল। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে নবী করীম ﷺ-এর আত্মার সাথে মিলিয়ে দিন। তাঁর দর্শনের মাধ্যমে আমার চক্ষু শীতল করুন। কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত করো না।'[১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

أَخَذَتْ تُرْبَةً مِّنْ تُرَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَشَمَّتْ، ثُمَّ أَنْشَدَتْ: شِعْرٌ:

مَاذَا عَلَىٰ مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ	*	أَنْ لَا يَشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا
صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا	*	صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

'(হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র (রওযার) মাটি থেকে কিছু মাটি উঠিয়ে চোখে-মুখে মাখলেন, কবিতা আবৃত্তি করলেনঃ কবিতা,

যে নিয়েছে মাটির সুগন্ধি
হাবীবে খোদার রওযা মোবারকের।
প্রয়োজন হয় না, তার
মিশক কিংবা অন্য কোন সুঘ্রাণের।

---

[১] (ক) আত-তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, খ. ৩, পৃ. ৬৪, হাদীসঃ ২৬৭৬; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ. ৪, পৃ. ৭৩; হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত; (গ) আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৩

আমার ওপর রয়েছে যে,
কঠিন বিপদের ঘনঘটা
বইত যদি দিনের ওপর
হয়ে যেত আঁধার রূপান্তর।'[১]

আর *আল-ইকতিফা* গ্রন্থে আছে, 'হযরত ফাতিমা বা হযরত আলী-এর কবিতা হিসেবে ... مَاذَا عَلَىٰ مَنْ شَمَّ এ-কবিতাদুটো পরিচিত।'[২]

وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَـمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ؓ: وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ»، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرَئِيْلَ أَنْعَاهْ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَتْ: يَا أَنَسُ! أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوْا عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ.

'আর হযরত আনাস (ইবনে মালিক) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন নবী করীম-এর রোগ প্রকটরূপ ধারণ করে তখন তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এ-অবস্থায় হযরত ফাতিমা বললেন, উহ! আমার পিতার ওপর কত কষ্ট! তখন হযরত রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আজকের পরে তোমার পিতার ওপর আর কোনো কষ্ট নেই।' অতঃপর যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন হযরত ফাতিমা বললেন, হায় আমার পিতা! প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাওস তাঁর ঠিকানা। হায় পিতা! হযরত জিবরাইল-কে তাঁর ইন্তিকালের খবর পরিবেশন করছি। যখন নবী করীম-কে সমাহিত করা হল, তখন হযরত ফাতিমা বললেন, হে আনস! হযরত রাসূলুল্লাহ-এর ওপর মাটি ঢালতে কি করে তোমাদের মন কীভাবে সায় দিল?'[৩]

হাদীসটি এককভাবে ইমাম আল-বুখারী-ই বর্ণনা করেছেন। ইমাম আত-তাবরানী অতিরিক্ত এটুকু বর্ণনা করেছেন,

---

[১] (ক) ইবনে নাসিরুদ্দীন আদ-দামিশকী, *সালওয়াতুল কাঈব*, পৃ. ১৬২; (খ) আস-সালিহী আশ-শামী, *সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ*, খ. ১২, পৃ. ৩৩৭; হযরত আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত; (গ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৩

[২] (ক) আবুর রবী আল-কালায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬২; (খ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ১৫, হাদীস: ৪৪৬২

يَا أَبَتَاهُ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ.

'হায় পিতা! আপনার প্রভুর কেমন নৈকট্যই না আপনি লাভ করেছেন।'[১]

وَقَدْ عَاشَتْ فَاطِمَةُ ﵂ بَعْدَهُ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَمَا ضَحِكَتْ تِلْكَ الْمُدَّةَ، وَيَحِقُّ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ.

'নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পর হযরত ফাতিমা ﵂ মাত্র ৬ মাস বেঁচে ছিলেন। তাঁকে দাফন করা হয়েছে রাতে। এ-সময়ের মধ্যে তিনি কখনো হাসেননি। বস্তুত না হাসাই তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল।'[২]

وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىٰ بَابِ عَائِشَةَ ﵂، وَكَانَتْ تَنْدُبُ النَّبِيَّ ﷺ، وَتَقُوْلُ: شِعْرٌ:

يَا مَنْ لَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ
يَا مَنِ اخْتَارَ الْحَصِيْرَ عَلَى السَّرِيْرَ
يَا مَنْ لَمْ يَنَمِ اللَّيْلَ كُلَّهُ
مِنْ خَوْفِ عَذَابِ رَبِّ السَّعِيْرِ

'আর হযরত আনাস (ইবনে মালিক) ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা ﵂-এর ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি নবী করীম ﷺ-এর জন্য শোকপ্রকাশ করে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, হে সেই নবী! যিনি কখনো পেটভরে তৃপ্ত হয়ে রুটিও খেতে পারেননি। হে সেই নবী! যিনি পালঙ্কের পরিবর্তে সাদামাটা চাটাইয়ের বিছানা বেছে নিয়েছিলেন। হে সেই নবী! যিনি জাহান্নামের মালিকের শাস্তির ভয়ে কখনো রাতে ঘুমাননি।'[৩]

---

[১] আত-তাবারানী, (ক) *আল-মু'জামুল কবীর,* খ. ২২, পৃ. ৪১৫–৪১৬, হাদীস: ১০২৮ ও ১০২৯; (খ) *আল-মুজামুল আওসাত,* খ. ৮, পৃ. ২০৯, হাদীস: ৮৪২২; হযরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত

[২] (ক) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* খ. ৬, পৃ. ৩৬৭, হযরত আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত; (খ) আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৫৭১

[৩] (ক) আস-সাফূরী, *নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতাখাবুন নাফায়িস,* খ. ২, পৃ. ১৩০; (খ) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ১৭৩

وَعَنْ عَائِشَةَ ﷺ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ، فَقَالَ: وَانَبِيَّاهُ، واخَلِيْلَاهُ، وَاصَفِيَّاهُ.

'আর হযরত আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর রওযায় হযরত আবু বকর ﷺ প্রবেশ করলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর দু'চোখের বরাবর মুখোমুখী হন এবং নবী করীম ﷺ-এর কানপট্টির উপরিভাগে হাত রেখে বললেন, হায় নবী! হায় বন্ধু! হায় প্রিয়বন্ধু!'[১]

অপর এক বর্ণনায় আছে,

قَالَتْ: لَـمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَرَفَعَ الْحِجَابَ، وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَاسْتَرْجَعَ، فَقَالَ: مَاتَ وَاللهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَقَالَ: وَانَبِيَّاهُ، ثُمَّ حَدَرَ فَمَهُ، وَقَبَّلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: وَاخَلِيْلَاهُ، ثُمَّ حَدَرَ فَمَهُ، وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، فَقَالَ: وَاصَفِيَّاهُ، ثُمَّ حَدَرَ فَمَهُ، فَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ سَجَّاهُ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ خَرَجَ.

'হযরত আয়িশা ﷺ বলেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পান, তখন হযরত আবু বকর ﷺ নবী করীম ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করেন, অতঃপর পর্দা সরিয়ে তাঁর চেহারা মুবারক উন্মুক্ত করেন এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিনউন পড়েলন। অতঃপর বলেন, আল্লাহর কসম! হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। এরপর নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র মাথার ঘুরে এসে বলেন, হায় নবী! এরপর তিনি তাঁর মুখ নুইয়ে নবী করীম ﷺ-এর চেহারায় চুম্বন করেন। এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, হায় বন্ধু! এরপর তিনি আবারও তাঁর মুখ নুইয়ে নবী করীম ﷺ-এর কপালে চুম্বন করে বলেন, হায় প্রিয়বন্ধু!। এরপর তিনি পুনরায় তাঁর মুখ নুইয়ে নবী

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪০, পৃ. ৩২, হাদীস: ২৪০২৯

করীম ﷺ-এর কপালে চুম্বন করে চাদর টেনে দিয়ে বাইরে চলে আসেন।'[১]

ইমাম আল-বুসিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *আল-বুরদার* ব্যাখ্যাগ্রন্থে আবুল আব্বাস আল-কাস্‌সার রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন যে,

أَنَّهُ لَـمَّا تَحَقَّقَ عُمَرُ بْنُ الْـخَطَّابِ ﷺ مَوْتَهُ ﷺ بِقَوْلِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِهِ، قَالَ وَهُوَ يَبْكِيْ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! لَقَدْ كَانَ جِذْعٌ تَخْطُبُ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرُوْا اتَّخَذْتَ مِنْبَرًا لِتُسْمِعَهُمْ، فَحَنَّ الْـجِذْعُ لِفِرَاقِكَ، حَتَّىٰ جَعَلْتَ يَدَكَ عَلَيْهِ، فَسَكَنَ، فَأُمَّتُكَ كَانَتْ أَوْلَىٰ بِالْـحَنِيْنِ عَلَيْكَ حِيْنَ فَارَقْتَهُمْ.

بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْدَ اللهِ أَنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَهُ، فَقَالَ: ﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ﴾ [النساء].

بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ بَعَثَكَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَذَكَرَكَ فِيْ أَوَّلِهِمْ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ ﴾ [الأحزاب].

بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْدَهُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَوَدُّوْنَ أَنْ يَكُوْنُوْا أَطَاعُوْكَ وَهُمْ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا يُعَذَّبُوْنَ يَقُوْلُوْنَ ﴿يٰلَيْتَنَاۤ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴾ [الأحزاب].

'হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্যে যখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের বিষয়ে নিশ্চিত হন তখন তিনি তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করে নেন। হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু) কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার ওপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক। আপনি খেঁজুরের

[১] ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৩১, হাদীস: ২২২৭

একটি ডালে ভর দিয়ে খুতবা দান করতেন। যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন আপনি একটি মিম্বর তৈরি নিয়েছিলেন, লোকজনকে আপনার বক্তব্য শোনানোর উদ্দেশ্যে। এরপর সেই খেজুর শাখাটি আপনার বিরহে ক্রন্দন করেছিল। পরে নবী করীম ﷺ খেজুর শাখাটির ওপর আপনার হাত বুলিয়ে দিলেন শাখাটির কান্না থামে। এ-দৃষ্টিতে আপনার বিদায়ের জন্য আপনার উম্মত অঝোর ধারায় কান্নার বেশি হকদার।

হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার ওপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক। আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা বহু উঁচুতে; আপনার অনুসরণকে তিনি তাঁর অনুসরণ বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, 'যে রাসুলের অনুসরণ করবে সে যেন আল্লাহকে অনুসরণ করল।'[১]

হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা বহু উঁচুতে; আপনাকে তিনি শেষনবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন আর আপনার আলোচনা করেছেন সবার আগে। মহান আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল! সে সময়ের কথা স্মরণ করুন), যখন আমি নবীদের কাছ থেকে; আপনি ও নুহের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছি।'[২]

হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা বহু উঁচুতে; জাহান্নামবাসীগণ আযাব ভোগ করা অবস্থায় পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করবে, হায় যদি তারা আপনার অনুসারী হত! তারা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করতাম!''[৩]

আর ইমাম আবুল জাওযা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ جَاءَ أَخُوْهُ، يُصَافِحُهُ، وَيَقُوْلُ: يَا عَبْدَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ، فَإِنَّ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً.

'কোনো মদীনাবাসী কষ্টে পতিত হলে অন্যজন তাঁর সাথে হাত মিলিয়ে বলতো, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর, কেননা আল্লাহর রাসুলের অনুসরণের ফলেই অনুপম চরিত্রের রূপ প্রতিফলিত হয়।'[৪]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪:৮০

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব* ৩৩:৭

[৩] (ক) আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব* ৩৩:৬৬; (খ) আল-গাযালী, *ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ. ১, পৃ. ৩১০; (গ) আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৫

[৪] (ক) আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭২; (খ) মোল্লা আলী আল-কারী, *জমউল ওয়াসায়িল শরহুশ শামায়িল*, খ. ২, পৃ. ২২৩

কোন কবি চমৎকার বলেছেন, কবিতা:

اصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيْبَةٍ وَّتَجَلَّدِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ
وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ الْكِرَامُ فَإِنَّهَا
نُوَبٌ تَنُوْبُ الْيَوْمَ تَكْشِفُ فِيْ غَدِ
وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيْبَةً تَشْجِيْ بِهَا
فَاجْبُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ

'প্রত্যেক বিপদে ধৈর্য ধরো এবং দৃঢ়বিশ্বাস রাখো! আর জেনে রেখ, কোনো মানুষ চিরস্থায়ী নয়। বড়দের মতো তুমিও সহ্য করো। কেননা বিপদ একটা যন্ত্রণা যা আজ আছে, কাল থাকবে না। তুমিও যখন কোনো বিপদে পতিত হয়ে চিন্তিত হও, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কষ্টের কথা ভেবে নিজের বিপদে ধৈর্যধারণের সাহস সঞ্চয় কর।'[১]

অন্য এক কবি বলেন, কবিতা:

تَذَكَّرْتُ لَـمَّا فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا
فَعَزَّيْتُ نَفْسِيْ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ
وَقُلْتُ لَـهَا إِنَّ الْمَنَايَا سَبِيْلُنَا
فَمَنْ لَّمْ يَمُتْ فِيْ يَوْمِهِ مَاتَ فِيْ غَدِ

'যখন সময় আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, সেকথা আমি স্মরণ করছি; তখন আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ-এর বিদায়ে) নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে বলেছি যে, মৃত্যু সে তো আমাদের পথ, আজ না হোক কাল মানুষকে তো মরতেই হবে।'[২]

وَرُوِيَ: أَنَّ بِلَالًا لَـمَّا كَانَ يُؤَذِّنُ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ، ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ بِالْبُكَاءِ وَالنَّحِيْبِ، فَلَمَّا دُفِنَ

[১] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭২
[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭২

تَرَكَ بِلَالُ الْأَذَانَ.

'বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পর হযরত বিলাল رضي الله عنه আযান দিতেন; যখন একপর্যায়ে أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله ﷺ বলতেন তখন কাঁদাকাটি ও পরিবেদনায় পুরো মসজিদ উদ্বেলিত হয়ে ওঠতো। এজন্য নবী করীম ﷺ-এর ওফাতের পর তিনি আযান দেওয়া ছেড়ে দেন।'[1]

কবিতা:

لَوْ ذَاقَ طَعْمَ الْفِرَاقِ رَضْوَىٰ

لَكَانَ مِنْ وَجْدِهٖ يَمِيْدُ

فَقَدْ حَمَّلُوْنِيْ عَذَابُ شَوْقٍ

يَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ الْحَدِيْدُ

'যদি রাযওয়া[2] পাহাড়ও এই বিরহের যন্ত্রণা অনুভব করতে পারতো তবে সে বিপর্যস্ত হয়ে যেতো, শোকসন্তাপের বাঁধভাঙা আবেগের তোড়ে আমি ভাসছি যা ইস্পাতের ক্ষেত্রে হলেও সে গলে যেতো।'[3]

নবী করীম ﷺ-এর ফুফী সাফিয়াও বহু শোকগাথা আবৃত্তি করেছেন। এর মধ্যে তাঁর কয়েকটি গীতি হচ্ছে। কবিতা:

أَلَا يَا رَسُوْلَ الله كُنْتَ رَجَاءَنَا

وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَّلَمْ تَكُ جَافِيَا

وَكُنْتَ رَحِيْمًا هَادِيًا مُّعَلِّمًا

لِيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيَا

لَعَمْرِكَ مَا أَبْكِي النَّبِيَّ لِفَقْدِهٖ

وَلَكِنْ لِّمَا أَخْشَىٰ مِنَ الْهَجْرِ آتِيَا

---

[1] আল-কাসত্বাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭২

[2] কাযী আয়ায, *মাশারিকুল আনওয়ার*, খ. ১, পৃ. ৫৯; رَضْوَىٰ হচ্ছে, মক্কা ও মদিনা শরীফের মধ্যস্থিত ইয়ানবুউ (يَنْبُع)-এর একটি পাহাড়।

[3] আল-কাসত্বাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭২

كَـأَنَّ عَـلَىٰ قَلْبِـيْ لِـذِكْرِ مُحَمَّـدٍ
وَمَا خِفْتُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ الْـمَكَاوِيَا
أَفَـاطِمُ صَـلَّى اللهُ رَبُّ مُحَمَّـدٍ
عَلَىٰ جَدَثٍ أَمْسَىٰ بِيَثْرِبَ ثَاوِيَـا
فِـدًا لِّرَسُـوْلِ اللهِ أُمِّـيْ وَخَـالَتِيْ
وَعَمِّـيْ وَخَـالِيْ ثُـمَّ نَفْسِيْ وَمَالِيَـا
فَلَـوْ أَنَّ رَبَّ النَّـاسِ أَبْقَـىٰ مُحَمَّـدًا
سُرُرْنَـا وَلَكِـنْ أَمْـرُهُ كَـانَ مَاضِـيَا
عَلَيْـكَ مِـنَ اللهِ الـسَّلَامُ تَحِيَّـةً
وَأُدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِّنَ الْعَدْنِ رَاضِيَا

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আপনি আমাদের পরম হিতৈষী। আপনি কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করেন না।

আপনি দয়ালু, পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক। তাই আজ সকলেই আপনার বিরহে মূহ্যমান।

আপনার জীবনের শপথ! নবী করীম ﷺ-এর বিরহে আমি কাঁদছি তা নয়। আমি তো ভবিষ্যতে তাঁর শূন্যতার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন।

মুহাম্মদের স্মরণে আমার অন্তর পরিপূর্ণ। আমি নবী করীম ﷺ-এর অবর্তমানে (জাতির) দিক্‌ভ্রান্তি নিয়ে আশঙ্কা করছি।

হে ফাতিমা! মুহাম্মদের প্রভু আল্লাহ সেই সমাধির ওপর শান্তি বর্ষণ করেছেন যা ইয়াসরবে অবস্থিত।

আল্লাহর রাসুলের জন্য আমার মা, আমার খালা, আমার চাচা, আমার খালু, আমি নিজে এবং আমার ধন-সম্পদ সবই উৎসর্গিত।

যদি মানুষের প্রভু মুহাম্মদকে ইহজগতে রাখলে আমরা খুশি হতাম। তবে তাঁর নির্দেশ ছিলো তিনি বিগত হন।

আপনার ওপর আল্লাহর তরফ থেকে শান্তি ও শুভেচ্ছা রইল। আপনি আদনের (জান্নাতের) পুষ্পোদ্যানে সন্তুষ্টচিত্তে বিচরণ করবেন।'[১]

নবী করীম ﷺ-এর চাচাতো ভাই হযরত আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবনে আবদিল মুত্তালিব رضي الله عنه ও শোকগাথা আবৃত্তি করেছেন। কবিতাঃ

أَرِقْتُ فَبِتُّ هَمِّيْ لَا يَزُوْلُ

وَدَلِيْلُ أَخِي الْمُصِيْبَةِ فِيْهِ طُوْلُ

وَأَسْعَدَنِي الْبُكَاءُ وَذَاكَ فِيْمَا

أُصِيْبَ الْمُسْلِمُوْنَ بِهِ قَلِيْلُ

لَقَدْ عَظُمَتْ مُصِيْبَتُنَا وَجَلَّتْ

عَشِيَّةَ قِيْلَ قَدْ قُبِضَ الرَّسُوْلُ

وَأَضْحَتْ أَرْضُنَا مِمَّا عَرَاهَا

تَكَادُ بِنَا جَوَانِبُهَا تَمِيْلُ

فَقَدْنَا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيْلَ فِيْنَا

يَرُوْحُ بِهِ وَيَغْدُوْ جَبْرَئِيْلُ

وَذَاكَ أَحَقُّ مَا سَالَتْ عَلَيْهِ

نُفُوْسُ النَّاسِ أَوْ كَادَتْ تَسِيْلُ

نَبِيٌّ كَانَ يَجْلُو الشَّكَّ عَنَّا

بِمَا يُوْحَى إِلَيْهِ وَمَا يَقُوْلُ

وَيَهْدِيْنَا فَلَا نَخْشَى ضَلَالًا

---

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৮২, হাদীস: ২৪৮৯, হযরত সাইদ ইবনে আবু হিলাল رحمه الله থেকে বর্ণিত; (খ) আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৩; (গ) আল-কাস্‌তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩

عَلَيْنَـا وَالرَّسُـوْلُ لَنَـا دَلِيْـلُ

أَفَـاطِمُ إِنْ جَزِعْـتِ فَـذَاكَ عُـذْرٌ

وَإِنْ لَّـمْ تَجْزَعِـيْ، ذَاكَ السَّبِيْلُ

فَقَـبْرُ أَبِيْـكِ سَـيِّدُ كُـلِّ قَـبْرٍ

وَفِيْـهِ سَـيِّدُ النَّـاسِ الرَّسُـوْلُ

'নিদ্রা দূর হয়ে চিন্তা হয়ে গেল স্থায়ী। বিপথগামিতাই যেন আমার চিরসাথী। আর বিপদগ্রস্থ মানুষের কাসুন্দি দীর্ঘ হয়ে থাকে। দীর্ঘাশ্বাস আর কান্না আমার নিত্য সঙ্গী হয়ে রইল। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর নিপতিত বিপদের তুলনায় আমার বিপদকে বড় করে দেখার সুযোগ নেই।

সেই রাতটি ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদের রাত যেদিন কেউ এসে আমাকে খবর দিল, হযরত রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

পৃথিবীর ওপর যত বড় বিপদ বয়ে গেল এর দরুণ হয়তো এক একপ্রান্ত আমার ওপর হেলে পড়বে। সকাল-সন্ধ্যায় জিবরাইলের আগমন আর ওহির অবতরণধারা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। যাদের অন্তরের ওপর দিয়ে এই ঝড় বয়ে গেছে তার হৃদয় থেকে চিরদিন রক্তক্ষরণ হতে থাকবে।আপনার ওপর অবতারিত ওহির আলোকউদ্ভাসে আমাদের মনের সংশয়-অন্ধকার আপনি দূর করে দিতেন।

হে প্রিয়তম! আপনি আমাদের পথ দেখাতেন, ফলে আমাদের পথহারানোর ভয় থাকতো না।

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের রাহবার ছিলেন। ফাতিমা তোমার আর্তনাদ ও বিগলিত ক্রন্দন দোষের নয়; তবে ধৈর্য ধারণ যদি করতে পারো এটা অতি উত্তম পন্থা। আপনার পিতার রওযা পৃথিবীর সকল কবরের সর্দার কারণ সেখানে বসবাস করেন মানবজাতির মহান নেতা। সকলের যিনি শ্রেষ্ঠ।'[১]

(হযরত আবু বকর) সিদ্দীক رضي الله عنهও শোকগাথা আবৃত্তি করেছেন। কবিতা:

---

[১] (ক) আস-সুহায়লী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৫৯৮; (খ) আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩-৫৭৪

لَـــمَّا رَأَيْـــتُ نَبِيَّنَـــا مُنْجَـــدِلًا

ضَـاقَتْ عَـلَيَّ بِعَرْضِـهِنَّ الـدُّوْرُ

فَارْتَـاحَ قَلْبِـيْ عِنْـدَ ذَاكَ لِـهَلَكَةٍ

وَالْعَظْـمُ مِنِّـيْ مَـا حَيِـيْتُ كَسِيْرُ

أَعَتِيْقُ وَيْحَكَ إِنَّ حِبَّكَ قَدْ ثَوَىٰ

فَالـصَّبْرُ عَنْـكَ لِـمَا بَقِيْـتَ يَسِيْرُ

يَا لَيْتَنِيْ مِنْ قَبْلِ مَهْلِكِ صَاحِبِيْ

غُيِّبْـتُ فِيْ جَـدَثٍ عَـلَيَّ صُـخُوْرُ

فَلَتَحْـدُثَنَّ بَـدَائِعٌ مِّـنْ بَعْـدِهِ

يَعْنِـيْ بِهِـنَّ جَـوَانِحٌ وَصُـدُوْرُ

'আমি যখন আমাদের প্রিয়নবীকে নিথর-অসাড় দেখি তখন প্রশস্ততা সত্ত্বেও পুরো ঘরটি আমার কাছে অত্যন্ত সংকুচিত-সংকীর্ণ মনে হয়। সেসময় আমার মন যেন তখন মৃত্যু কামনা করছিল। আমার হাড়গুলো যেন গুড়িয়ে যাচ্ছিলো।

ওহে আতিক (হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه)! আমার খুবই দুঃখ হচ্ছে, তোমার বন্ধু চলে গেছেন। এখন সারা জীবন কি ধৈর্যধারণ তোমার পক্ষে সহজ হবে?

হায়! যদি আমার প্রিয়মানুষটি বিগত হওয়ার আগেই কবরস্থ হয়ে যেতাম এবং আমার ওপর ভারি পাথর রাখা হতো।

নবী করীম ﷺ-এর বিদায়ের পর পৃথিবী এমনসব বিপর্যয়ের মুখোমুখী হবে যার ফলে দেহের হাড়গুলো বিচূর্ণ আর অন্তরাত্মা বেদনা-দীর্ণ হয়ে যাবে।'[১]

(হযরত আবু বকর) সিদ্দীক رضي الله عنه আরও শোকগাথা আবৃত্তি করেছেন। কবিতা:

---

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ২৪৭৯, ইমাম আল-ওয়াকিদী কর্তৃক বর্ণিত; (খ) আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৪

وَدَّعَنَا الْوَحْيَ إِذْ وَلَّيْتَ عَنَّا	*	فَوَدَّعَنَا مِنَ اللهِ الْكَلَامُ
سِوَىٰ مَا قَدْ تَرَكْتَ لَنَا رَهِينًا	*	تَضَمَّنَهُ الْقَرَاطِيسُ الْكِرَامُ

'যখন থেকে আপনি আমাদের ছেড়ে গেলেন, আল্লাহর প্রত্যাদেশও আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আল্লাহর কালাম থেকেও আমরা বঞ্চিত হলাম।
তবে আল্লাহর সেই বাণী লিপিবদ্ধ আকারে আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে যা আপনি রেখে গেছেন।'[১]

হযরত হাসসান (রাদি.) বলেন, কবিতা:

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيْ	*	فَعَمَىٰ عَلَيْكَ النَّاظِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ	*	فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

'ওহে প্রিয়তম তুমি আমার চোখের জ্যোতি ছিলে। তোমার সৌন্দর্য দর্শন থেকে বঞ্চিত আমি অন্ধ হয়ে গেলাম।
তোমার পর পৃথিবীর যে কেউ মৃত্যুবরণ করুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো কেবল তোমার মৃত্যুর উৎকণ্ঠায় ভীত বিহ্বল ছিলাম।'[২]

নবী করীম (সা.)-এর উত্তরাধিকার ও এর বিধান বিষয়ে আলোচনা

নবী করীম (সা.) দিনার-দিরহাম (অর্থ-কড়ি), দাস-ধন কিছুই উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। তবে নিজের একটি সাদা খচ্চর, কিছু যুদ্ধাস্ত্র এবং কিছু জমিজমা ছিল যা তাঁর জীবদ্দশায় তিনি সাদকা করে দিয়েছিলেন।[৩]

খুলাসাতুস সিয়ার গ্রন্থে আছে,

تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ ثَوْبَيْ حِبَرَةٍ، وَإِزَارًا عُمَانِيًّا، وَثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ؛ وَقَمِيْصًا صَحَارِيًّا، وَآخَرَ سَحُوْلِيًّا، وَجُبَّةً يَمَانِيَّةً، وَخَمِيْصًا

---

[১] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৪
[২] (ক) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ৩৭৯; (খ) আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৪
[৩] আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৩

وَكِسَاءً أَبْيَضَ، وَقَلَانِسَ صِغَارًا لَّاطِئَةً ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا. وَإِزَارًا: طُوْلُهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ وَمِلْحَفَةً مُوَرَّسَةً.

'ওয়াফাতের দিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটো ইয়েমেনি চাদর, একটি উম্মানি লুঙ্গি, দুটো সাহারি কাপড়; এর একটি সাহারি জামা অন্যটি সাহুলী, একটি ইয়েমেনি জুব্বা; যার চৌকোণ ছিলো কারুকাজ-বিশিষ্ট এবং কাপড় ছিলো সাদা চাদর এবং তিন-চারটি ছোট ছোট টুপি ইত্যাদি উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া লুঙ্গি ছিলো আড়াই হাত লম্বা এবং চাদরগুলো ছিলো পুরোনো।'[১]

আর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

«نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ؛ لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ».

'আমরা নবীর পরিবার; আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী নেই, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সবই সাদকা।'[২]

নবী করীম ﷺ আরও ইরশাদ করেন,

«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمُؤْنَةِ عَيَالِيْ، فَهُوَ صَدَقَةٌ».

'আমার উত্তরাধিকারে ভাগ-বণ্টন হবে না। আমরা যা ছেড়ে যাই তা থেকে আমার সহধর্মিনী ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের পর অবশিষ্ট সম্পদ সাদকা।'[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: وَلَدِيْ وَأَهْلِيْ، فَقَالَتْ: فَمَا لِيْ لَا أَرِثُ أَبِيْ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا نُوْرَثُ»، وَلَكِنِّيْ

---

[১] (ক) মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, *খুলাসাতু সিয়ারি সাইয়্যিদিল বশর*, পৃ. ১৭৬; (খ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৩

[২] আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৯৮, হাদীস: ৬৩৭৫; হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৩] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪; পৃ. ১২, হাদীস: ২৭৭৬, পৃ. ৮১, হাদীস: ৩০৯৬ ও খ. ৮, পৃ. ১৫০, হাদীস: ৬৭২৯; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ* খ. ৩, পৃ. ১৩৮২, হাদীস: ৫৫ (১৭৬০); হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

أَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْلُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ.

'হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেয়ে হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সমীপে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ওয়ারিস কারা? হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জবাব দিলেন, আমার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার। অতঃপর তিনি (হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)) বললেন, তাহলে আমি কেন আমার পিতার উত্তরাধিকার পাবো না? হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, 'আমাদের কোনো উত্তরাধিকার নেই।' অবশ্য হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করেছেন আমিও তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করবো। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যাঁদের জন্য খরচ করতেন আমিও তাঁদের জন্য খরচ করবো।'[১]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا، سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِيْرَاثَهُ مِنْ تَرْكَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، فَأَبَىٰ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ ﷺ شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَلَىٰ أَبِيْ بَكْرٍ فِيْ ذَلِكَ، فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تَزَلْ حَتَّىٰ تُوُفِّيَتْ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوْهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِيْ بَكْرٍ وَّمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ، فَبَايَعَهُ بَعْدَهَا.

'হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর খায়বার ও ফাদাক এবং মদীনার সাদকা থেকে হযরত

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ১৬০৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি উত্তরাধিকার স্বত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলেছেন, 'আমাদের (নবীদের) কোনো উত্তরাধীকারী হয় না, আমরা যা রেখে যাবো তা সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। একথা বলে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-কে এ-সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করতে অস্বীকার করলেন। এতে হযরত ফাতিমা (রা.) (মানবোচিত কারণে) হযরত আবু বকর (রা.)-এর ওপর নারাজ হয়ে গেলেন এবং তাঁর থেকে নিস্পৃহ হয়ে রইলেন। পরে তাঁর ওফাত পর্যন্ত (মানসিক সংকোচের দরুন) হযরত আবু বকর (রা.)-কে এড়িয়ে চলেন। এরপর তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর স্বামী হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) রাতের বেলা তাঁর দাফনকার্য শেষ করে নেন। হযরত আবু বকর (রা.)-কেও এ-সংবাদ দেননি এবং হযরত আলী (রা.) নিজেই জানাযার নামায আদায় করেন নেন। হযরত ফাতিমা (রা.) জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের মনে হযরত আলী (রা.)-এর বেশ সম্মান ও প্রভাব ছিলো। এরপর যখন ফাতিমা (রা.) ইন্তিকাল করলেন, তখন হযরত আলী (রা.) লোকজনের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। (হযরত ফাতিমা (রা.)-এর অসুস্থতা ও অন্যান্য) ব্যস্ততার দরুন এ-ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণের অবসর হয়নি। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে তিনি বায়আত নেন।'[১]

দু'বিশুদ্ধ গ্রন্থে (*সহীহ আল-বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম*) এভাবে বর্ণিত আছে। আর ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেন,

عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَادَ فَاطِمَةَ ﷺ فِي مَرَضِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: هَذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ، فَقَالَتْ: أَتُحِبُّ أَنْ آذَنَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَتْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَرَضَّاهَا حَتَّى رَضِيَتْ.

'ইমাম আশ-শা'বী থেকে বর্ণিত, অসুস্থতার সময় একবার হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর খোঁজ নিতে আসেন। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, ইনি হযরত আবু বকর, তিনি ভেতরে

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ১৩৯-১৪০, হাদীস: ৪২৪০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৩৮০, হাদীস: ৫২ (১৭৫৯)

আসতে অনুমতি চান। হযরত ফাতিমা বললেন, তাঁকে অনুমতি দেওয়া কি তুমি পছন্দ করবে? তিনি (হযরত আলী) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর হযরত ফাতিমা তাঁকে (ভেতরে আসার) অনুমতি দেন। তারপর হযরত আবু বকর ভেতরে প্রবেশ করে হযরত ফাতিমা-কে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হন এবং তাঁর বক্তব্যে হযরত ফাতিমা সত্যিসত্যি সন্তুষ্ট হয়ে যান।'[১]

কিতাবুল ওয়াফায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে।[২] ইমাম মুহিব্বুত তাবারী-এর *রিয়াযুন নায্‌রা* গ্রন্থে এসেছে,

دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَىٰ فَاطِمَةَ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْهَا، وَكَلَّمَهَا، فَرَضِيَتْ عَنْهُ.

'হযরত আবু বকর হযরত ফাতিমা-এর ঘরে প্রবেশ করে হযরত ফাতিমা-কে নিজের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন এবং আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত ফাতিমা বিষয়টি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেন।'[৩]

وَعَنِ الْأَوْزَاعِيْ، قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ فَاطِمَةَ غَضِبَتْ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ، فَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ بَابِهَا فِيْ يَوْمٍ حَارٍّ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ مَكَانِيْ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ عَلَيَّ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، فَأَقْسَمَ عَلَيْهَا لِتَرْضَىٰ، فَرَضِيَتْ عَلَيْهِ.

'ইমাম আওযায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত ফাতিমা যখন হযরত আবু বকর-এর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, একসময় প্রচ- গরমের মৌসুমে হযরত আবু বকর হযরত ফাতিমা-এর ঘরের বাইরে এসে বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় কন্যা যে পর্যন্ত আমার ওপর সন্তুষ্ট না হয়ে যাচ্ছেন সে-পর্যন্ত আমি এখান থেকে হটবো না। এ-পরিপ্রেক্ষিতে

---

[১] (ক) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৪৯১, হাদীস: ১২৭৩৫; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৭, পৃ. ২৮১, হাদীস: ৩২৭৭

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াউল ওয়াফা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৫; (খ) আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৪

[৩] (ক) মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, *আর-রিয়াযুন নায্‌রা*, খ. ১, পৃ. ১৭৬; (খ) আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৪

হযরত আলী হযরত ফাতিমা-এর ঘরে প্রবেশ করে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে দোহায় দিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর-এর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।'[১]

ইমাম ইবনে সাম্মান *আল-মুয়াকিফা* গ্রন্থে বর্ণনাটি এনেছেন।

وَقَدْ اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ فِيْ مِيْرَاثِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدٍ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَسَمِعْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «كُلُّ مَالِ نَبِيٍّ صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ، إِنَّا لَا نُوْرَثُ»، قَالُوْا: اَللّٰهُمَّ! نَعَمْ.

'হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব)-এর খিলাফতকালে একবার হযরত আলী ও হযরত আব্বাস-এর মাঝে নবী করীম-এর উত্তরাধিকার স্বত্ব নিয়ে মতদ্বন্দ্ব হয়। হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত সাআদ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আপনারা কি হযরত রাসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছেন যে, 'আমি যা ভোগ করে যাচ্ছি তা ব্যতীত সবই সম্পদই সাদকা। কেননা আমাদের (নবীগণ)-এর কোনো উত্তরাধিকারী হন না।' তারা বললেন, হে আল্লাহ! অবশ্যই।'[২]

নবী করীম-এর পবিত্র রওযা পরিদর্শন এবং সেখানে অবস্থানের সময় সম্মান ও সালাম জ্ঞাপন

মহানবী কুরাইশী হাশিমী মক্কী মাদানী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম, যিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূলের—তাঁর ওপর ও সকল (অনুসারীর) ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও সালাম রইল—সমাধি পরিদর্শন করা উৎসাজ্ঞাপিত কাজ ও মুস্তাহাব। এটি মুস্তাহাব কাজসমূহের অধিক গরুত্বপূর্ণ এবং উৎকৃষ্টত ইবাদতও বটে। তা ছাড়া যার

---

[১] (ক) মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, *আর-রিয়াযুন নাযরা*, খ. ১, পৃ. ১৭৬; (খ) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৪

[২] (ক) আত-তিরমিযী, *আশ-শামায়িল*, পৃ. ৩৪২, হাদীস: ৪০২; (খ) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*

সামর্থ ও সুযোগ আছে তার জন্য এটি ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে। যেহেতু ন
করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَـمْ يَفِدْ عَلَيَّ فَقَدْ جَفَانِيْ».

'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে-ব্যক্তি আমার কাছে এলা না সে আমার ওপর যুলম করলো।'[১]

আর অন্য বর্ণনায় আছে,

«مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّتِيْ لَهُ سَعَةٌ، وَلَـمْ يَزُرْنِيْ فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ عِنْدَ الله».

'আমার উম্মতের মধ্যে কোনো ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার যিয়ারত না করলে তার কোনো অপরাগতা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না।'[২]

নবী করীম ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে,

«مَنْ جَاءَنِيْ زَائِرًا لَّا يُهِمُّهُ إِلَّا زِيَارَتِيْ كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'যদি কোনো ব্যক্তি কেবল আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওযায় আগমন করে তবে কিয়ামত-দিবসে তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করা আমার কর্তব্য হয়ে যায়।'[৩]

এটি হাফিয আবু আলী ইবনুস সাকান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও ইরশাদ করেন,

«مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ».

'যে-ব্যক্তি আমার রওযা যিয়ারত করবে তার জন্য সুপারিশ করার আমার ওপর আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।'[৪]

---

[১] (ক) আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৫৮; (খ) আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৪

[২] (ক) ইবনুন নাজ্জার, *আদ-দিুররাতুস সমীনা*, পৃ. ১৫৫; আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; (খ) আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*

[৩] (ক) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১২, পৃ. ২৯১, হাদীস: ১৩১৪; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৫, পৃ. ১৬, হাদীস: ৪৫৪৬; (গ) আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৫৮; (ঘ) আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[৪] (ক) আদ-দারাকুত্‌নী, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ২৬৫৯, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; (খ) আদ-দিয়ার বক্‌রী, *প্রাগুক্ত*

এটিকে ইমাম ইবনে আবদুল হক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন।[1] নবী করীম ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে,

«مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَمَاتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ».

'যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার যিয়ারত করল সে যেন জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাত করল।'[2]

এ-প্রসঙ্গে আরও অনেক হাদীস আছে। আমরা যা উদ্ধৃত করেছি এ-বিষয়ে তাই যথেষ্ট।

যখন কেউ পবিত্র মদীনার উদ্দেশ্যে বের হবে সফরের পুরো সময় তার উচিৎ নবী করীম ﷺ-এর ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা। কেননা এই সফরের পথে ফরযসমূহের পর এরচেয়ে উত্তম কোনো ইবাদত নেই।

যিয়ারতকারী যখন মদীনার গাছপালা ও তার হারাম দৃষ্টিগোচর হয়; তখন নবী করীম ﷺ-এর বেশি বেশি সালাত ও সালাম পেশ করবে। আর মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যেন, তাঁর যিয়ারত কল্যাণকর হয় এবং এর মাধ্যমে ইহকাল ও পরকাল সৌভাগ্যময় হয়। আর মুখে এই দুআটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ، فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ، وَأَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ.

'হে আল্লাহ! এটি আপনার রাসুলের হারাম। অতএব এই জায়গাটাকে তুমি আমার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার এবং আযাব ও কঠিন হিসাব থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানাও।'[3]

পবিত্র মদীনায় প্রবেশের সময় গোসল করা, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা, সুগন্ধি লাগানো এবং সাধ্যমতো সাদকা করা মুস্তাহাব। এরপর এই দুআটি পড়তে পড়তে মদীনায় প্রবেশ করবে:

بِسْمِ اللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا.

'আল্লাহর নামে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিল্লাতভুক্ত হয়ে...। হে পালনকর্তা! আমাকে প্রবেশ করান সত্যরূপে এবং আমাকে বের

---

[1] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*

[2] (ক) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩–৩৩৪, হাদীস: ২৬৯৪, হযরত হাতিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; (খ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৪

[3] (ক) আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৫৮; (খ) আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*

করান সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।'[1]

অতঃপর মসজিদে (নববীর) গেইটে পৌঁছে প্রবেশকালে ডান পা আগে রেখে এই দুআটি পড়বে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ.

'হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করো এবং আমার জন্যে তোমার দয়া ও করুণার দরোজাগুলো উন্মুক্ত করে দাও।'[2]

পবিত্র রওযা শরীফের প্রতি অভিমুখী হবে। আর রওযা নবী করীম ﷺ-এর সমাধি ও মসজিদের মিম্বরের মধ্যখানে অবস্থিত। এটি জান্নাতের পুষ্পোদ্যানসমূহের মধ্যে একটি পুষ্পোদ্যান।[3] অতঃপর সম্ভব হলে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুসাল্লায় তাহাইয়াতুল মসজিদের সালাত আদায় করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে রওযা বা মসজিদে নববির অন্যত্র এ-নামাযটি পড়ে নেবে। তারপর এই পুণ্যময় স্থানে পৌঁছার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক সাজদা করবে।[4] অবশ্য ওলামায়ে কেরামের মাঝে এই সাজদা নামাযের বাইরে হবে, না তিলাওয়াতে হবে সে-বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

এরপর এখানে যিয়ারত কবুল হওয়ার মাধ্যমে নিয়ামত পুরো হওয়ার দুআ করবে। এরপর রওযার কাছে এমনভাবে গিয়ে দাঁড়াবে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার দিকে যেন মুখ হয় এবং কিবলার দিকে পিঠ হয়। রওযা মুবারকের জালি বা নেটগুলো স্পর্শ কিংবা এবং চুম্বন করবে না কারণ এটা জাহেল তথা মুর্খদের কাজ। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ-কাজ কখনো করেননি। যিয়ারতকারীর উচিৎ রওযার জালি ঘেঁষে দাঁড়াবে না, বরং চার-পাঁচ হাত তফাতে দাঁড়াবে।

অতঃপর হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ, হযরত আবু বকর رضي الله عنه ও হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) رضي الله عنه-এর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে ও নিম্নস্বরে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে এভাবে সালাম জানাবে,

---

[1] (ক) আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৫৮–২৫৯; (খ) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*

[2] (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৫৩, হাদীস: ৭৭১; হযরত ফাতিমা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত; (খ) আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩২৩; (খ) আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৪

[3] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ১১৯৫; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আল-মাযনী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত ও হাদীস: ১১৯৬; হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[4] আদ-দিয়ার বকরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৪–১৭৫

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتِمَ النَّبِيِّنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْعِزِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَأَصْحَابِكَ أَجْمَعِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَمِيْنُهُ وَخَيْرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ بُلَّغَتِ الرِّسَالَةُ وَأَدَّيْتِ الْأَمَانَةُ وَجَاهَدَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ عبدت رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِيْنَ. فَجَزَاكَ اللهُ مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفْضَلُ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ أَنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاوكَ، فَاسْتَغْفِرُو اللهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَ الرَّسُوْلَ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا.

'তোমাকে সালাম জানাই হে রাসূলগণের শিরোমণি। তোমাকে সালাম জানাই হে সর্বশেষ রাসূল। তোমাকে সালাম হে জ্যোতির্ময়–সুন্দরতম মানুষের নেতা। তোমাকে সালাম জানাই হে সৃষ্টিজগতের করুণার আধার। তোমার পরিবার-পরিজন, সহধর্মিণী ও সাহাবা-সহচদেরও সালাম জানাই। তোমার ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই। তুমি প্রেরিত বান্দা, রাসূল, বিশ্বস্ত-আমানতদার ও শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রিসালাতের বার্তা সম্পূর্ণভাবে আপনি পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আপনি স্বীয়

প্রভুরই ইবাদত করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ আপনাকে সেই উত্তম প্রতিদানটি প্রদান করুন যা উম্মতের পক্ষ থেকে একজন নবীর প্রাপ্য।

হে আল্লাহ আমাদের মহান নেতা মুহাম্মদর ওপর আপনি শান্তি বর্ষণ করুন। তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপরও শান্তি বর্ষণ করুন। যেমনটি শান্তি নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। হে আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে তুমিই সম্মানিত, সর্বোচ্চ প্রশংসার উপযুক্ত। হে আল্লাহ আমাদের সর্দার মুহাম্মদের ওপর আপনি বরকত নাযিল করুন যেমনটি নাযিল করেছেন ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের ওপর।

হে আল্লাহ আপনি ঘোষণা দিয়েছেন, আর এ ঘোষণা সর্বাংশে সত্য– তারা যদি নিজের ওপর যুলুম করার পর আপনার কাছে হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চান; তখন আল্লাহকে তারা সর্বাধিক তওবা কবুলকারী হিসেবে পাবে।

এরপর এ-দুআটি করবে যে,

اَللّٰهُمَّ قَدْ سَمِعْنَا قَوْلَكَ، وَأَطَعْنَا أَمْرَكَ، وَصَدْنَا نَبِيَّكَ مُسْتَشْفِعِيْنَ بِهِ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوْبِنَا. اَللّٰهُمَّ فَتُبْ عَلَيْنَا، وَأَسْعَدْنَا بِزِيَارَتِهِ، وَادْخِلْنَا فِيْ شِفَاعَتِهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ظَالِمِيْنِ أَنْفُسَنَا مُسْتَغْفِرِيْنَ لِذُنُوْبِنَا، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ تَعَالَى بِالرَّؤُفِ الرَّحِيْمِ. فَاشْفِعْ لِمَنْ جَاءَكَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِ مُعْتَرِفًا بِذَنْبِهِ تَائِبًا إِلَىٰ رَبِّهِ.

'হে আল্লাহ আমরা আপনার ফরমান শুনেছি। আপনার হুকুম বাস্তবায়ন করেছি। আপনার নবীর দরবারে হাযির হয়েছি যিনি আপনার দরবারে আমাদের পাপগুলো ক্ষমার জন্য সুপারিশ করবেন। হে আল্লাহ আমাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করুন। রহমতে আলমের যিয়ারতের উসিলায় আমাদের ভাগ্যবানদের তালিকাভূক্ত করুন। আমাদেরকে তাঁর সুপারিশ নসীব করুন।

হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! নিজেদের ওপর অপরিসীম যুলুম করার পর আমরা আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহকারী ও দয়ালু আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাপাচার ও

অপরাধজনিত কারণে নিজেদের ওপর যুলুম করে আপনার কোনো যদি আপনার দরবারে হাযির হয়, আপনি তার জন্য সুপারিশ করে থাকেন। আমার জন্য আপনি দয়া করে গুনাহ মার্জনার সুপারিশ করুন। আমি আপনার মুবারক চরণপাশে হাযির হলাম। প্রত্যেক যিয়ারতকারীর উচিত নিজের পাশাপাশি স্বীয় মাতা-পিতা, আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য দোয়া করা। কেননা তাঁর দরবার থেকে আল্লাহর কাছে সব দোয়া কবুল হয়।'

হজ্জ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে কবিদের বহু কবিতা সংকলিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। তা থেকে নিম্নের কবিতাসমূহ পড়বে। কবিতা:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي التُّرْبِ أَعْظُمُهُ

فَطَابَ مِنْ طِيبِهِ الْقَاعُ، وَالْأَكَمُ

نَفْسِ الْفِدَاءُ بِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ

فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

أَنْتَ الشَّفِيْعُ الَّذِيْ تُرْجَىٰ شَفَاعَتُهُ

عِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَمُ

'সমতলভূমিতে যত মানবসন্তানকে দাফন করা হয়েছে তুমি তাদের শ্রেষ্ঠতম। সমগ্র ভূগর্ভ তোমার কারণে সুরভিত হয়েছে।
তোমার রওযার তরে আমার জীবন উৎসর্গিত হোক, ওহে প্রিয়তম! যেখানে পবিত্রতা, মহানুভবতা ও অনুগ্রহ পাশাপাশি বাস করে।
তুমি সেই মহান রাসূল, যার সুপারিশই সেদিন পুলসিরাতের কঠিন সেতু পারাপারে কম্পনরত বিপন্ন মানুষের একমাত্র ভরসা।'[1]

অতঃপর নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য এবং প্রিয়বন্ধু-বান্ধবের জন্য দুআ কামনা করবে। নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দুআ কামনা মুস্তাহাব। মদীনা থেকে ফেরা, সেখানে অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলি, আচরণবিধি, শিষ্টাচার, কর্মকাণ্ড, মদীনায় প্রবেশের নিয়ম-করণীয়, যিয়ারতের আদাব-কায়দা ইত্যাদি বিষয়ে আমি আমার রচিত মদীনা শরীফের ইতিহাস

---

[1] আদ-দিয়ার বক্রী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭৫

জাযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব গ্রন্থে সবিস্তারে আলোকপাত করেছি। কারো ইচ্ছে হলে অধ্যয়ন করে নিতে পারেন।

পরিশিষ্ট: স্বপ্নযোগে নবী করীম ﷺ-এর দর্শন লাভের আলোচনা

স্বপ্নে নবী করীম ﷺ-এর দর্শনলাভ সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে চলমান প্রসঙ্গের ইতি টানব ইনশাআল্লাহ। কোনো কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার তাওফীকদাতা মহান আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর হাতে গন্তব্যে পৌঁছার চাবিকাঠি সংরক্ষিত।

আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া গ্রন্থে একমাত্র নবী করীম ﷺ-এর স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

مَنْ رَآهُ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآهُ حَقًّا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ.

'কেউ স্বপ্নযোগে তাঁকে দেখলে সে নিশ্চিতরূপে তাঁকেই দেখল কেননা শয়তান কখনো তাঁর রূপ ধারণ করতে পারে না।'[১]

ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-বর্ণিত হযরত (আবু) কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে আছে,

«مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ».

'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে নিশ্চিতভাবে আমার দর্শনই লাভ করল।'[২]

ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কর্তৃক হযরত জাবির (ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরও বর্ণিত আছে,

«مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي».

'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে নিশ্চিতভাবে আমার দর্শনই লাভ করল। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।'[৩]

ইমাম আল-বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-বর্ণিত হযরত আবু সাঈদ (আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এসেছে যে,

«فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي».

---

[১] আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৩৬৫

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ,* খ. ৪, পৃ. ১৭৭৬, হাদীস: ১১ (২২৬৭)

[৩] মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ১৭৭৬, হাদীস: ১৩ (২২৬৮)

'কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করার ক্ষমতা তার নেই।'[1]

«لَا يَتَكَوَّنُنِيْ» মূলত «لَا يَتَكَوَّنُ كَوْنِيْ» ছিল। এখানে সম্বন্ধিত পদকে বিলুপ্ত করে সম্বন্ধপদকে ক্রিয়াপদের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আল-বুখারী (রহ.)-বর্ণিত হযরত আবু কাতাদা (রা.)-এর হাদীসে আছে,

«لَا يَتَرَاءَى بِيْ».

'সে আমার রূপ ধারণ করতে সক্ষম নয়।'[2]

এর অর্থ হচ্ছে, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে সামর্থ নয়। অর্থাৎ যদিও আল্লাহ তাআলা শয়তানকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করার শক্তি দান করেছেন, তা সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ-এর রূপ ধারণ করার ক্ষমতা শয়তানের নেই।

কারো কারো বক্তব্য হলো, স্বপ্নে যদি কেউ নবী করীম ﷺ-এর দর্শন লাভ করে তাহলে নবী করীম ﷺ-কে সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় দেখাটা বাঞ্ছনীয়। কোনো কোনো সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন লোকের কথা হল নবী করীম ﷺ ইন্তিকালের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় যেরূপে ছিলেন দেখতে তেমনই দেখা যাবে। এমনকি ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর যে-কুড়িটির মতো চুল পেকেছিল তাও দেখা যাবে।

وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ مُحَمَّدٌ يَعْنِيْ ابْنَ سِيْرِيْنَ إِذَا قَصَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ صِفْ لِيَ الَّذِيْ رَأَيْتَهُ، فَإِنْ وَصَفَ لَهُ صِفَةً لَا يَعْرِفُهَا قَالَ: لَمْ تَرَهُ.

'হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খ্যাতিমান স্বপ্নব্যাখ্যাতা) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীনের কাছে যখন কেউ হযরত নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখার দাবি নিয়ে আসত, তখন তাকে তিনি বলতেন, কেমন দেখছ তার বিবরণ দাও। যদি সে এরূপ বিবরণ যেরূপের সাথে তিনি পরিচিত নন, তখন তিনি জোর দিয়ে বলতেন, তুমি কখনো নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখনি।'

বর্ণনাটির সূত্র বিশুদ্ধ।[3]

---

[1] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৯, পৃ. ৯, হাদীস: ৬৯৯৭

[2] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৯, পৃ. ৩৩, হাদীস: ৬৯৯৫

[3] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী*, খ. ১২, পৃ. ৩৮৩–৩৮৪

ইমাম আল-হাকিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আসিম ইবনে কুলাইব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন,

حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْـمَنَامِ، قَالَ صِفْهُ لِيْ، قَالَ ذَكَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَشَبَّهْتُهُ بِهِ، قَالَ قَدْ رَأَيْتَهُ.

'আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বললাম, আমি স্বপ্নে নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি। তিনি বললেন, কেমন দেখছ আমাকে বর্ণনা কর। আমি হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তাহলে সত্যিই তো তুমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছ।'[১]

এর সনদ শক্তিশালী। তবে ইমাম ইবনে আবু আসিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অন্য আরেকটি বর্ণনার সাথে এর সাংঘর্ষিকতা রয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِيْ فِي الْـمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ، فَإِنِّيْ أُرَى فِيْ كُلِّ صُوْرَةٍ»..

'হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে নিশ্চিতভাবে আমাকেই দেখেছে। কারণ আমি যেকোনো রূপেই দৃশ্যমান হতে পারি।''[২]

এর সনদে একজন ইবনুত তাওআমা রয়েছেন। তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। কারণ তখনকার সময়ে লোকটির জ্ঞান-বুদ্ধি পুরোপুরি ঠিক ছিল না। তার মানসিক অসুস্থতার সময়েই বর্ণনাটি তার কাছ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সর্বপরিচিত রূপ-বৈশিষ্ট্যসহ দর্শন লাভ হচ্ছে প্রকৃতরূপে জানা আর অপরিচিত কোনোরূপে তাঁর দর্শন লাভ হলো প্রতীকিভাবে জানা। বস্তুত যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ-অবয়ব কবরে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে,

---

[১] আল-হাকিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫, হাদীস: ৮১৮৬

[২] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *ফতহুল বারী*, খ. ১২, পৃ. ৩৮৪

উম্মতের যেকোনো লোক স্বপ্নে তাঁকে হুবহু প্রকৃত অবয়বেই দেখে থাকেন। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসহ দেখলে সেটা প্রতীকী দর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১]

কাযী আয়ায ﵀ বলেন, «فَقَدْ رَآنِي» (...সে অবশ্যই আমাকে দেখতে পেল) অথবা «فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» (...সে প্রকৃতপক্ষেই আমার দর্শন লাভ করল) নবী করীম ﷺ-এর এসব ইরশাদের সম্ভাব্য মর্মার্থ হচ্ছে, জীবদ্দশায় নবী করীম ﷺ যে-অবয়ববিশিষ্ট ছিলেন এমনরূপে দেখলে তবে তাঁকে হুবহু দেখা হল, অন্যরূপে দেখতে পেলে স্বপ্নের ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।[২] সমাপ্ত।

ইমাম নাওয়াওয়ী ﵀ বলেন, কোনো ব্যক্তি পরিচিতরূপে হোক কিংবা অপরিচিতরূপে হোক নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে সে নবী করীম ﷺ-কেই দেখেছে।[৩] সমাপ্ত।

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী ﵀ বলেন, কাযী আয়ায ﵀-এর কথাতেও স্বপ্নে নবী করীম ﷺ-এর দর্শন সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু নেই। বরং তিনিও বলতে চেয়েছেন যে, উভয় অবস্থাতেই নবী করীম ﷺ-কে সত্যি সত্যি দেখা যায়। তবে প্রথম অবস্থায় স্বপ্নের ব্যাখ্যার দরকার নেই, দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।[৪]

যারা বলে, 'নবী করীম ﷺ-কে তাঁর পরিচিত অবয়ব ছাড়া স্বপ্নে দেখা যেতে পারে না।' তাদের এ-বক্তব্য দ্বারা যারা তাঁকে অন্যরূপে স্বপ্নে দেখেন তা অপরিহার্যরূপে দুঃস্বপ্ন হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। বাস্তবতা হচ্ছে, নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে এমন অবস্থায়ও দেখা যেতে পারে যা তাঁর ইহকালীন অবয়বের সাথে মিল নয়। বস্তুত শয়তান কোনোক্রমেই নবী করীম ﷺ-এর রূপ ধারণ করতে পারে না; এমনকি তাঁর কোনো অবস্থা বা কোনো বৈশিষ্ট্যেও সে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করতে সক্ষম নয়। তা না হলে «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي» (শয়তান কোনো অবস্থায় আমার রূপ ধারণ করতে পারে না) নবী করীম ﷺ-এর এ-ঘোষণার কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অতএব সঠিক বক্তব্য হচ্ছে, নবী করীম ﷺ-এর কোনো অবস্থা বা তাঁর দিকে সম্পর্কিত কোনো বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত হওয়া শয়তানের জন্য অসম্ভব। এ-ধরনের দুঃস্বপ্ন থেকে তিনি পবিত্র। কেননা এটি নবী করীম ﷺ-এর উচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর নিষ্পাপ বৈশিষ্ট্যের জন্য অতিগুরুত্ব বিষয়। অতএব নবী

---

[১] ইবনুল আরাবী, *আল-মাসালিক*, খ. ৭, পৃ. ৫০৩
[২] কাযী আয়ায, *ইকমালুল মু'লিম*, খ. ৭, পৃ. ২১৯
[৩] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ*, খ. ১৫, পৃ. ২৫
[৪] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী*, খ. ১২, পৃ. ৩৮৪

ইমাম আরিফ ইবনে আবু জামরা (রহ.) বলেন, যে-ব্যক্তি নবীজীকে সুন্দর অবয়বে স্বপ্নে দেখেন তাহলে দর্শনপ্রাপ্ত লোকটি একজন দীনদারি ও ভালো মানুষ। আর তাঁকে কোনো অঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত বা কোনো অঙ্গহীন দেখে তাহলে লোকটার দীনদারিতে ঘাটতি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে। এটিই সঠিক। এর সত্যতা বহুবার প্রমাণিত।

তবুও স্বপ্নযোগে নবী করীম ﷺ-কে দেখার বড় ফায়দা হল, সে দীনের ওপর বিশ্বাসে অটল না দুর্বল? তা অনুধাবন হবে। যেহেতু নবীজী ﷺ নুরানী, যার উদাহরণ স্বচ্ছ-নির্মল আয়না। আয়নায় যেমন নিজের বাস্তব প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে, তদ্রূপ স্বপ্নেও যে-ব্যক্তি তাঁকে দেখেন তার নিজের অবস্থার ভালো-মন্দ রূপ-প্রকৃতিও নবী করীম ﷺ-এর আকৃতিতে ভেসে ওঠে।

স্বপ্নে নবীজী আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের কথা বলা সম্পর্কে সুন্নাহর সাথে কিছু সাংঘর্ষিকতা রয়েছে। যদি তা সুন্নাহ মুতাবিক হয় তাহলে অবশ্যই সঠিক। যদি হ্যাঁ সুন্নাতের বরখেলাপ হয় তবে তা লোকটির শোনার দুর্বলতা। অর্থাৎ স্বপ্নে দেখা লোকটির শোনায় ভুল ছিল। বস্তুত স্বপ্নযোগে নবীজর দর্শন লাভ সত্য। যতো সমস্যা তা শুধু দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তির শোনা ও দেখার সমস্যা। তিনি বলেন, এ-ব্যাপারে যা শুনেছি তার মধ্যে উপর্যুক্ত বক্তব্যই সর্বোত্তম। সমাপ্ত।[১]

অধম বান্দা—আল্লাহ তাঁর আত্মসংশোধিত করুন বলেন, আমার মুরশিদ আরিফ বিল্লাহ শায়খ আবদুল ওয়াহহাব ইবনে ওয়ালী উল্লাহ আল-মুত্তাকী (রহ.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমার মুরশিদ আরিফ বিল্লাহ শায়খ আলী ইবনে হুসাম উদ্দীন আল-মুত্তাকী (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, মিসর থেকে এ-মর্মে একটি পত্র আসে যে, যদি কোনো লোক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেন, তিনি নির্দেশ দিয়ে বলছেন, اِشْرَبِ الْخَمْرَ (মদ পান করো)। শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের কাছে প্রশ্ন, এর ব্যাখ্যা কী হবে? পত্রটি যাদের কাছেই পৌঁছেছে তারা অনেকই কিছু না কিছু লিখেছেন এবং যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও ইঙ্গিতবার্তা দিতে চেষ্টা করেছেন।

অতঃপর পত্রটি যখন আল্লাহর একান্ত প্রিয় বান্দা আরিফ বিল্লাহ শায়খ আল-মুকতাদী মুহাম্মদ ইবনে ইরাক (রহ.) তিনি একজন কামেল বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, সুন্নতের পুরোপুরি পাবন্দ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর কাছে পৌঁছালে তিনি এর জবাবে লিখেন, লোকটির শোনার ভুল হয়েছে। নিশ্চয়ই নবী করীম

---

[১] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী*, খ. ১২, পৃ. ৩৮৭; (খ) আল-কাসৃতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৭০

করীম ﷺ পৃথিবীতে জীবিত থাকা অবস্থায় যেমন শয়তান থেকে মুক্ত ও নিরাপদ ছিলেন কবরেও তাই আছেন।

আর হাদীসটির বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হচ্ছে, হাদীসের মূল উদ্দেশ্য এখানে নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখা পর বিষয়টি কোনো অবস্থায়ই বাতিলযোগ্য নয় এবং তা কখনো কারো দুঃস্বপ্ন হতে পারে না। বরং সেটি সন্দেহাতীতভাবে নবী করীম ﷺ-এর দর্শন লাভ হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি কেউ নবী করীম ﷺ-কে তাঁর নিজস্ব সত্তায় নাও দেখেন তবুও তা কোনোভাবেই শয়তানের ছবি বা হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার অবকাশ নেই, বরং এটা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে। কাযী আবু বকর ইবনে তাইয়িব (আল-বাকিল্লানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রমুখ এ-মতামত দিয়েছেন। তাঁরা «فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» (...সে প্রকৃতপক্ষেই আমার দর্শন লাভ করল) নবী করীম ﷺ-এর এ-হাদীসটি ঠিক এভাবেই সমর্থন করেছেন। ইমাম আল-কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।[1]

হাদীসে আমাদের শায়খুল মাশায়িখ হাফিয ইবনে হাজর আল-হায়সামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য থেকে নবী করীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে স্বপ্নযোগে দর্শনের ওপর উল্লিখিত আমাদের বক্তব্যগুলো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।[2] দর্শনপ্রাপ্ত লোক নবী করীম ﷺ-কে যে-অবস্থায়ই দেখুন না কেন। তবে শর্ত হচ্ছে, নিজস্ব সত্তায় তাঁকে দেখতে হবে; তবে যৌবন, বার্ধক্য ও অন্তিম যেকোনো অবস্থায়ই দেখা হোক না কেন সবই সমান। তবে কেউ নবী করীম ﷺ-কে ভিন্নরূপে ও বিশেষ অবস্থায় স্বপ্নে দেখলে দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থার সাথেই এর ব্যাখ্যার সম্পর্ক। যেমন– স্বপ্নব্যাখ্যাতা অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, যে-ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে বৃদ্ধাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন তাহলে তার অন্তিম শান্তিতে অতিবাহিত হওয়ার ব্যাখ্যা হবে। যদি কেউ নবী করীম ﷺ-কে যৌবনাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যুদ্ধ।

ইমাম আবু সাঈদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নাসার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে-ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে তাঁর নিজস্ব সত্তায় ও স্বাভাবিক অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন তা দর্শনপ্রাপ্ত লোকটির সততা, মর্যাদা ও শত্রুদের ওপর বিজয়ী হওয়ার প্রমাণ। আর যে-ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে পরিবর্তিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন তা লোকটির অবস্থা সঙ্গীন হওয়ার প্রমাণ।

---

[1] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী*, খ. ১২, পৃ. ৩৮৩–৩৮৪; (খ) আল-কাস্‌তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৬৫–৩৬৮

[2] ইবনে হাজর আল-হায়সামী, *আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া*, পৃ. ২০৬

ﷺ আসলে বলেছেন, لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ (মদ পান করো না)। কিন্তু লোকটি ভুল শুনেছেন। তার মনে হয়েছে, হয়তো নবী করীম ﷺ বলেছেন, اشْرَبِ الْخَمْرَ (মদ পান করো না)। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইমাম মুসলিম ؒ-এর এক বর্ণনায় এসেছে,

«مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، أَوْ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي».

'যে-ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল সে শিগগিরই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে বা সে বাস্তবেই আমাকে দেখল। কেননা অভিশপ্ত শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।'[১]

ইমাম আল-ইসমাঈলী ؒ-এর বর্ণনায় «فَسَيَرَانِي...»-এর স্থলে «فَقَدْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ» এসেছে। ইমাম ইবনে মাজাহ ؒ[২]ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি ইমাম আত-তিরমিযী ؒ-এর মতে বিশুদ্ধ[৩], হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ ؓ বর্ণিত হাদীস।[৪]

«فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ» নবী করীম ﷺ-এর একথার ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেন, «فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ» থেকে উদ্দেশ্য হলো জাগ্রত অবস্থায় এ-স্বপ্নের সত্যতা, বিশুদ্ধতা এবং এর যথার্থতা দেখতে পাওয়া যাবে। এর অর্থ কখনো এই নয় যে, এ-স্বপ্নে তিনি আখিরাতেই নবী করীম ﷺ-এর দিদার লাভ করবেন। করণ কিয়ামত দিবসে সাধারণভাবে নবী করীম ﷺ-এর সকল উম্মত তাঁকে দেখতে পাবেন। স্বপ্নযোগে দেখেছেন বা দেখেননি তার কোনো তফাৎ থাকবে না।[৫]

আল্লামা আল-মাযিরী ؒ বলেন, যদি সংরক্ষিত বর্ণনাটি «فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ» হয় তবে এর স্পষ্ট। হ্যাঁ, যদি সংরক্ষিত বর্ণনাটি হয় «فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ»। তাহলে খুব সম্ভব এর অর্থ হবে, সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ আশা

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৭৫, হাদীস: ১১ (২২৬৬), হযরত আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত
[২] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১২৮৪, হাদীস: ৩৯০০
[৩] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৫৩৫, হাদীস: ২২৭৬
[৪] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ১২, পৃ. ৩৮৩; (খ) আল-কাসৃতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৬৫
[৫] ইবনে বাত্তাল, *শরহ সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৯, পৃ. ৫২৭

করছেন, যারা এখনো মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে পারেননি তাঁরা অতিশিশগিরই তাঁদের সাথে এসে সম্মিলিত হবেন। যখন তাঁরা নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন এতে তাঁরা পরবর্তীতে নবী করীম ﷺ-কে জাগ্রত অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য লাভের প্রতি ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। আর এ-ব্যাপারটি স্পষ্ট করতেই আল্লাহ নবী করীম ﷺ-কে অহী প্রেরণ করেন।[১]

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে শিগগিরই তিনি তার এ-স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও সত্যতা জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব হতে দেখবেন।

জবাবে কাজী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদি কেউ নবী করীম ﷺ-কে স্ববৈশিষ্ট্য ও সসত্ত্বায় স্বপ্নে দেখেন, তবে এতে সম্ভবত পরকালে লোকটি মর্যাদাবান হবেন এবং তাঁর সাথে নবী করীম ﷺ-এর বিশেষ কোনো অবস্থায় যেমন– তাঁর নৈকট্য ও উঁচু মর্যাদা সুপারিরশ ইত্যাদি অবস্থায় সাক্ষাৎ হবে।

তিনি আরও বলেন, কিয়ামত-দিবসে কিছু গোনাহগারদেরকে আল্লাহ নবী করীম ﷺ-এর দিদার থেকে ক্ষণিকের জন্য বঞ্চিত করে ওই সময়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর তাদের উদ্দেশ্যই হাদীসে শিগগিরই জাগ্রত অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর সাক্ষাতের কথা বলা হয়েছে।[২]

ইবনে আবু জামরা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন যে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ، فَبَقِيَ بَعْدَ أَنِ اسْتَيْقَظَ مُتَفَكِّرًا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ، فَدَخَلَ عَلَىٰ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَعَلَّهَا خَالَتُهُ مَيْمُوْنَةُ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمِرْآةَ الَّتِيْ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ فِيْهَا صُوْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَرَ صُوْرَةَ نَفْسِهِ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে নবী করীম ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। অতঃপর জাগ্রত হয়ে উপর্যুক্ত হাদীসের ওপর চিন্তা-ফিকর করছিলেন। ওই অবস্থায় উম্মুল মুমিনীনদের কারো ঘরে হয়তো তাঁর খালা হযরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে যান। তিনি তাঁকে নবী করীম ﷺ-এর ব্যবহৃত একটি আয়না এনে দেন। তখন তিনি তাতে নবী করীম ﷺ-এর ছবি দেখতে পান, নিজের ছবি দেখতে পেলেন না।'[৩]

---

[১] আল-মাযিরী, *আল-মু'লিম*, খ. ৩, পৃ. ২০৭

[২] কাযী আয়ায, *ইকমালুল মু'লিম*, খ. ৭, পৃ. ২২১

[৩] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী*, খ. ১২, পৃ. ৩৮৫; (খ) আল-কাস্তাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৬৮–৩৬৯

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা থেকে পাঁচটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে,

১. এটি প্রতিচ্ছবি ও প্রতিপ্রকৃতি-স্বরূপ। নবী করীম ﷺ-এর ইরশাদ: فَكَأَنَّمَا رَآنِيْ فِي الْيَقَظَةِ (...সে শিগগিরই জাগ্রত অবস্থায় আমার সাক্ষাৎ লাভ করবে) থেকে তাই প্রমাণিত।

২. এর অর্থ: سَيَرَىٰ فِي الْيَقَظَةِ (শিগগিরই জাগ্রত অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করবে), অর্থাৎ বাস্তবিকই সে নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতে ধন্য হবে।

৩. সেসব সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গই হাদীসের উদ্দেশ্য যারা নবী করীম ﷺ-এর ওপর ঈমান এনেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি।

৪. যারা নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছেন তারা তাঁকে তাঁর ব্যবহৃত আয়না মুবারকে দেখতে পাবেন, যদি সম্ভব হয়। শায়খ হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তাঁর আয়না মুবারক পাওয়া যাওয়া এখন অসম্ভবই।

৫. এমন স্বপ্ন যারা দেখেছেন অতিরিক্ত বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য-সহকারে কিয়ামত-দিবসে তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবেন।

বাস্তবতা আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। আর তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং তিনিই আমাদের গন্তব্য।

পরিশিষ্ট : মাহে রবিউল আখির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই পবিত্র মাস তথা রবিউল আউওয়াল সম্পর্কে বিস্তারিত বৃত্তান্তের সংযুক্তি ও পরিশিষ্ট হিসেবে রবিউল আখিরের সামান্য আলোকপাত করা সমীচিন মনে করি। আল্লাহ আমাদেরকে এ-মাসে বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত ফয়েয দ্বারা বিশেষিত করেছেন।

এই মাসে সাইয়িদুনা, মাওলানা, মহান কুতুব ও গাওস, শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন, মানব ও দানব জগতের গাওস, শায়খ মুহ্উদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদির আল-হাসানী আল-হুসায়নী আল-জিলানী আল-হাম্বলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরদাহু আন্না ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। এখানে মহান প্রভুর নিকট তাঁর শুভগমনের দিন সম্পর্কে মতভেদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। তবে এসব বক্তব্যের মধ্যে কোন অভিমতটি সঠিক সেদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে।

এই মহান মাননীয় শায়খের জীবন-বৃত্তান্তের ওপর প্রসিদ্ধ কিতাব *বাহজা আল-আসরারে* নির্ভরযোগ্য বড় বড় মাশায়িখের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে,—এ-গ্রন্থের রচয়িতা ও শায়খের মধ্যে এমন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো যে,—

> এক রামাযানে শায়খ ক'দিন থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর পাশে মশায়িখের মাঝে শায়খ আলী ইবনুল হায়তী, শায়খ আবু আহমদ আন-নজীব আবদুল কাহির আস-সুহরাওয়ারদী ও শায়খ আবুল হাসান আল-জাওসাকী প্রমুখ মাশায়িখ উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে সেখানে একজন সুদর্শন ভদ্রলোক আগমন করলো। অতঃপর সে বললো, আস-সালামু আলায়কা ইয়া ওয়ালিয়াল্লাহ! আমি রামাযান মাস। আমি আপনার কাছে এসেছি একথা নিবেদন করতে যে,—যা আপনার জন্য আমার ওপর নির্ধারিত হয়ে গেছে—আমি আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি, অতএব আপনার সাথে আমার এই শেষ সাক্ষাৎ। তারপর লোকটি চলে যায়।

পরে হিজরী দ্বিতীয় সালের নয়ই রবিউল আখির শনিবার রাতে শায়খ ইন্তিকাল করেন এবং পরবর্তী রামাযান তিনি পাননি।[১]

তাঁর জীবন-চরিতে বুযর্গানে দীন উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক চান্দ্রমাস নতুন চাঁদ উদয় হওয়ার পূর্বে তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দিতো। আস মাসটিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো দুর্যোগ-বিপদাপদ থাকে চাঁদটিকে তিনি বিশ্রী দেখতে পেতেন আর ওই মাসে যদি আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে কোনো নি'মাত ও কল্যাণ থাকে তবে চাঁদটি তিনি সুন্দর দেখতে পেতেন।

বাহজাতুল আসরার ও শায়খ, আলিম, আরিফ বিল্লাহ ইমা আবদুল্লাহ আল-ইয়াফিয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-বিরচিত *রাওযাতুর রায়াহীন* গ্রন্থের পরিশি *খুলাসাতুল মাখাফির ফী মানাকিবিশ শায়খ আবদিল কাদিরে* উল্লেখ রয়েছে যে,

> তাঁকে কতিপয় বুযুর্গ ব্যক্তি—যাঁদের মধ্যে শায়খের বংশধর সাইয়িদুস সাদাত সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন—তাঁরা বলেছেন, হিজরী পাঁচশত ষাট সালের জুমাদাল আখিরের শেষ জুমুআবার, দিনের শেষ বেলায় আমরা কয়েকজন শায়খুনা শায়খ মুহ্উদ্দীন আবদুল কাদির আল-জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি আলাপ করছিলেন। ওইসময় একজন সুদর্শন যুবক আগমন করে শায়খের কাছে গিয়ে বসলেন আর বললেন, আস-সালামু আলায়কা ইয়া ওয়ালিয়াল্লাহ! আমি হচ্ছি মাহে রজব। আমি এসেছি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিতে যে, এ-মুহূর্তে আমার মাঝে মানুষের জন্য সাধারণ কোনো দুঃসংবাদ নির্ধারিত নেই। বর্ণনাকারী বলেন, বাস্তবেই ওই রজব মাসে মানুষ কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু দেখেনি।

তবে যখন এ-মাসের পর রোববার এলো দেখতে বিশ্রী একটা লোক আসলো—আমরাও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম—আর বললো সে, আস-সালামু আলায়কা ইয়া ওয়ালিয়াল্লাহ! আমি শাবান মাস। আমার মাঝে বাগদাদে বলা-মসিবত আসবে, হিযাজে প্রচ- দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এবং খুরাসানে ভূমিকম্প হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। পরবর্তীতে লোকটা যা বলেছিল তাই ঘটেছিল।[২]

---

[১] আশ-শাত্তানুফী, *বাহজাতুল আসরার*, পৃ. ৫০–৫১

[২] আল-ইয়াফিয়ী, *খুলাসাতুল মাখাফির*, পৃ. ২২৬

আমি বলবো, অতএব এ-বর্ণনা মতে তাঁর ওরস হবে নয়ই রবিউল আখির। এ-তারিখ; যার ওপর আমি সাইয়িদুনা শায়খ, আলিম, মহান আরিফ, শায়খ আবদুল ওয়াহহাব আল-কাদিরী আল-মুত্তাকী আল-মক্কী -কে পেয়েছি। শায়খ কুদ্দিসা সিররুহু এ-তারিখকে তাঁর ওরস-দিবস হিসেবে স্মরণ রাখতেন। এখানে হয়তো উপর্যুক্ত বর্ণনা অথবা তাঁর পীর, মহান শায়খ আলী আল-মুত্তাকী ও অন্যান্য মাশায়িখের বর্ণনার ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

অবশ্য আমাদের দেশে এই এগারোই রবিউল আখিরের দিনটি সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারত উপমহাদেশে আমাদের মাশায়িখ ও বংশধরের কাছে এ-তারিখটিরই প্রচলন রয়েছে।

মহান শায়খ, সম্মানিত-শ্রদ্ধেয় আরিফ, আবুল ফাত্তাহ, শায়খ, হামিদ আল-হাসানী আল-জিলানী -এর সাহেবযাদা শায়খুনা, সাইয়িদুনা, মূর্তিমান-মাননীয়-মহান সাইয়িদ, আবুল মুহাসিন, মহান শায়খ, সাইয়িদ, শায়খ মুসা আল-হুসায়নী আল-জিলানী *আল-আওরাদুল কাদিরিয়া* গ্রন্থ-যার রচয়িতা হলেন বরেণ্য মহান, সম্মানিত, শ্রদ্ধেয়, সার্বজনীন, মাননীয় ব্যক্তি ওয়ালি উল্লাহ; তাঁকে দ্বিতীয় মাখদুম ও দ্বিতীয় আবদুল কাদির কুদ্দিসাল্লাহু রুহাহু বলা হয়ে থাকে - থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তাঁর সম্মানিত বুযুর্গবর্গ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম আজমায়িন থেকে এ-রকমই বর্ণনা করেছেন।

শায়খ ইমাম আবদুল্লাহ আল-ইয়াফিয়ী তাঁর কিতাব *খুলাসাতুল মুখাফির* ও তাঁর *মিরআতুল জিনান* নামের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর ওফাত হয়েছে রবিউল আখিরের ছয়শত ষাট বা একষট্টি সালে।[1] তবে তিনি এতে দিন নির্ধারণ করেননি; হয়তো অবগতি না থাকার জন্য বা এ-ক্ষেত্রে মতভেদ থাকায় তিনি এমনটা করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর ওফাত হয়েছে সতেরই রবিউল আখির। এর কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহ অধিক জানেন।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমাদের দেশে প্রচলিত পীর-মাশায়িখে ওফাত-দিবসে যেসব ওরস-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, এর কি কোনো ভিত্তি আছে? আপনার কাছে এ-বিষয়ে জানা থাকলে আমাদেরকে সে-প্রসঙ্গে অবহিত করুন।

আমি বলবো, এ-প্রসঙ্গে আমি আমার শায়খ ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব আল-মুত্তাকী আল-মক্কী -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এর জবাবে তিনি বলেছেন যে, এটি আমাদের পীর-মাশায়িখের তরিকা ও প্রথা আর এতে তাঁদের জন্যে মান্নত করা হয়।

---

[1] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, *মিরআতুল জিনান*, খ. ৪, পৃ. ৯৬; (খ) আল-ইয়াফিয়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, অন্যান্য দিনগুলো ব্যতিরেকে বিশে দিনকে কেন নির্দিষ্ট করা হয়? জবাবে তিনি বললেন, সাধারণভাবে মেহমানদারি সুন্নাত। তো দিন নির্ধারণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেখো। এর অসংখ্য নযির রয়েছে। যেমন– সালাতের পর অনেক মাশায়িক মুসাফিহা করেন আরও যেমন– আশুরা-দিবসে মাথা মু-ানো। এসব সাধারণত সুন্নাত আর তবে বিশেষত্বের দিক থেকে বিদাআত।

এরপর তিনি আরও বলেছেন, কিছু পরবর্তী মাশায়িখ প্রাচ্য মাশায়িখ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে-দিন শায়খ মহাসম্মানিত প্রভুর কাছে পৌঁছন এবং জান্নাত লাভ করেন ওইদিন মানুষ অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি খায়র-বরকত ও নুরানিয়াত লাভের আশা পোষণ করে। তারপর অনেক দেরি পর্যন্ত মাথাবনত থাকে তারপর মাথা উঠায়।

তিনি বলেন, এসবের কোনো কিছুই সলফে সালিহীনের যুগে ছিলো না। এসব পরবর্তীরা কেউ কেউ পছন্দ করেছেন। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী।

মাহে রজব

আল-কামূসে রয়েছে, رَجِبَ ... فُلَانًا অর্থ هَابَهُ وَعَظَّمَهُ (সে অমুককে ভয় প্রদর্শন করল এবং সম্মান করল)। رَجْبًا ও رُجُوْبًا এবং رَجْبَةً ও أَرْجَبَهُ থেকে رَجَبٌ শব্দটি নির্গত। কারণ আরবরা এ-মাসকে বিশেষভাবে সম্মান করতো। أَرْجَابٌ, رُجُوْبٌ ও رَجَبَاتٌ এর বহুবচন। اَلتَّرْجِيْبُ অর্থ ذَبْحُ النَّسَائِكِ فِيْهِ (রজবে মাসে পশু যবেহ করা)।[১]

ইমাম আল-জাযারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *আন-নিহায়ায়* আছে, اَلتَّرْجِيْبُ অর্থ اَلتَّعْظِيْمُ (সম্মান করা)। যেমন- رَجِبَ فُلَانٌ مَوْلَاهُ অর্থ عَظَّمَهُ (সে তার মনিবকে সম্মান করেছে)। আর এ থেকেই রজব মাস এসেছে। কারণ এ-মাসকে সম্মান করা হতো। এ থেকেই মুযার গোত্রের রজব হিসেবে পরিচিত যা জুমাদা ও শাবানের মাঝামাঝি একটি মাস।[২] মুযার গোত্রের দিকে তারা সম্বন্ধ করেছে, কারণ তারা এই মাসকে বিশেষভাবে সম্মান করতো।

নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য: «بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» (মাসের ধারাবাহিকতার বজায় রাখার প্রতি) গুরুত্বারোপ। কেননা লোকেরা কোনো কোনো মাসকে আগ-পর করে ফেলতো এবং অন্য মাসের পেছনে নিয়ে যেতো। এতে এ-মাসটি স্বীয় অবস্থান থেকে সরে যায়। اَلْعَتِيْرَةُ الرَّجَبِيَّةُ হলো পশুবলির নাম; জাহিলি যুগে লোকেরা রজব মাসে দেবতার নামে এ বলি দিতো।[৩]

রজবকে اَلْأَصَمُّ (বধির)ও বলা হয়।

---

[১] আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, পৃ. ৮৮

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১০৭, হাদীস: ৩১৯৭, খ. ৫, পৃ. ১৭৭, হাদীস: ৪৪০৬, খ. ৬, পৃ. ৬৬, হাদীস: ৪৬৬২, খ. ৭, পৃ. ১০০, হাদীস: ৫৫৫০, খ. ৯, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ৭৪৪৭, হযরত আবু বাকারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন,

وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

.'আর মুযার গোত্রের রজব, যা জুমাদা ও শাবানের মাঝামাঝি একটি মাস'।

[৩] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ১৯৭

আল-কামূসে রয়েছে, রজব হলো বধির। কারণ এ মাসে কেউ কাউকে يَا فُلَانُ (হে অমুক!) এবং يَا صَاحِبَاهُ (হে বন্ধু!) বলে ডাকতো না।[১]

আন-নিহায়ায় আছে, 'আল্লাহর বধির মাস হলো রজব।'[২] যেহেতু এ-মাসে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যেতো না। এ-মাসটি একটি মর্যাদাপূর্ণ মাস হওয়ায় রূপক অর্থে যেসব মানুষ শুনতে পায় না তাদের সাথে বিশেষায়িত করা হয়েছে।[৩]

বান্দা লেখক -আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন- বলেন, অবশ্য জনসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ আছে, এই মাসকে বধির বলা হয় তার কারণ হচ্ছে, এ-মাসটি কিয়ামত দিবসে নিজে বধির হয়ে যাবে; মানুষের অন্যায় ও অপরাধের ব্যাপারে কোনো সাক্ষ্য দেবে না সে এবং বলবে, আমি বধির, আমি কোনো কিছু শুনি না।

অনুরূপভাবে এই মাসকে আল্লাহর মাস বলা হয় তার কারণ হচ্ছে, এ-মাসটি মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত। তা হলো বান্দার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা। বস্তুত এসবে কোনো ভিত্তি নেই। সেই সাথে এসব ধারণা অগ্রহণযোগ্যও বটে। কারণ اَلسَّتَّارِيَّةُ (দোষ-ত্রুটি গোপন করা)-গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাৎপর্য এই নয় যে, বধিরতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। তার কারণ হলো বধিরের কাছে কেবল মানুষের কথা গোপন থাকে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞাত।

আমি *জামিউল উসূলে* বিশুদ্ধ ছয় হাদীসের কোনো গ্রন্থে রজবের ফযীলতের ওপর বর্ণিত কোনো হাদীস পাইনি। তবে *আল-জামিউল কবীরে* রজবের ফযীলত ও এ-মাসের আমলের ফযীলতের ওপর কতিপয় হাদীস রয়েছে। সেসব হলো:

«رَجَبٌ شَهْرُ اللهِ، وشَعْبَانُ شَهْرِيْ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِيْ».

'রজব হলো আল্লাহর মাস এবং শাবান আমার মাস এবং রামাযান আমার উম্মার মাস।'[৪]

---

[১] আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, পৃ. ১১৩০

[২] আবদুর রায্‌যাক আস-সানআনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৯, পৃ. ৩০২, হাদীস: ১৭৩০১, ইমাম আয-যুহরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شَهْرُ اللهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ

'আল্লাহর বধির মাস হলো রজব।'

[৩] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ১৯৭

[৪] আস-সুয়ূতী, *জামউল জাওয়ামি'*, হাদীস: ১২৬৮২, হাদীসটি হযরত আবুল ফাওয়ারিস নয়, হযরত ইবনে আবুল ফাওয়ারিস ﷺ-ই বর্ণনা করেছেন

ইমাম আবুল ফাতহ ইবনুল ফাওয়ারিস তাঁর *আমালী*তে হযরত আল-হাসান থেকে মুরসাল-সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

«إِنَّ رَجَبَ شَهْرٌ عَظِيْمٌ، تُضَاعِفُ فِيْهِ الْحَسَنَاتِ، مَنْ صَامَ يَوْمًا مِّنْهُ كَانَ كَصِيَامِ سَنَةٍ».

'নিশ্চয় রজব একটি মহিমান্বিত মাস, ভালো আমলের কয়েকগুণ সওয়াব দেওয়া হয়। যে-ব্যক্তি এই মাসে একদিন সিয়াম-সাধনা করে তা পূর্ণ একবছর সিয়াম-সাধনার মতো।'

হাদীসটি ইমাম আর-রাফিয়ী হযরত সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

«إِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللهِ، وَيُدْعَى الْأَصَمَّ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ يُعَطِّلُوْنَ أَسْلِحَتَهُمْ وَيَضَعُوْنَهَا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْمَنُوْنَ، وَيَأْمَنُ السُّبُلُ، وَلَا يَخَافُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ».

'নিশ্চয় রজব আল্লাহর মাস। এটিকে বধির বলা হয়। জাহিলিয়া যুগে লোকেরা এই মাসে এলে তাদের অস্ত্র-সস্ত্র বন্ধ রাখতো এবং সেসব খুলে রাখতো। এতে মানুষ এই মাসে নিরাপদে থাকতো, সকল রাস্তা-ঘাট নিরাপদ থাকতো, কেউ কারো জন্য আতঙ্কিত হতো না—মাস শেষ অবধি।'

ইমাম আল-বায়হাকী *শুআবুল ঈমানে* হযরত আয়িশা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে তিনি বলেছেন যে, এই রিওয়ায়াতটি (মুনকার) অগ্রহণযোগ্য।[২]

«رَجَبٌ شَهْرٌ عَظِيْمٌ، يُضَاعِفُ اللهُ فِيْهِ الْحَسَنَاتِ، فَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِّنْ رَجَبٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ سَنَةً، وَمَنْ صَامَ فِيْهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ غُلِّقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَمَنْ صَامَ

---

[১] আর-রাফিয়ী, *আত-তাদওয়ীন*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯, হাদীসটি সাঈদ নয়, হযরত আবদুল আযিয ইবনে সাইদ-ই বর্ণনা করেছেন

[২] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: ৩৫২৩

مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَادَىٰ مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَىٰ فَاسْتَئْنِفِ الْعَمَلَ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ، وَفِيْ رَجَبٍ حَمَلَ اللهُ نُوْحًا فِي السَّفِيْنَةِ فَصَامَ رَجَبًا، وَأَمَرَ مَنْ مَّعَهُ أَنْ يَّصُوْمُوْا، فَجَرَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، آخِرُ ذٰلِكَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ أُهْبِطَ عَلَى الْجُوْدِيِّ فَصَامَ نُوْحٌ وَّمَنْ مَعَهُ وَالْوَحْشُ شُكْرًا لله عَزَّوَجَلَّ، وَفِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَلَقَ اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، وَفِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ تَابَ اللهُ عَلَىٰ آدَمَ وَعَلَىٰ مَدِيْنَةِ يُوْنُسَ، وَفِيْهِ وُلِدَ إِبْرَاهِيْمُ».

'রজব একটি মহিমান্বিত মাস। এতে আল্লাহ ভালো কাজের সওয়াব কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব যে-ব্যক্তি রজম মাসে একটি দিন সিয়াম পালন করবে সে যেন পূর্ণ একবছর সিয়াম পালন করলো। যে-ব্যক্তি এই মাসে সাতটি দিন সিয়াম পালন করবে তার জন্য জাহান্নামের সাতটা দরজা বন্ধ থাকবে। যে-ব্যক্তি এই মাসে আটটি দিন সিয়াম পালন করবে তার জন্য জান্নাতের অটিটি দরজা খোলা থাকবে। যে-ব্যক্তি এই মাসে দশটি দিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহর কাছে সে যাই চায় তাকে তিনি দান করবেন। যে-ব্যক্তি এই মাসে পনেরটি দিন সিয়াম পালন করবে আকাশ থেকে তাকে এক আহ্বানকারী ডেকে বলে, তোমার অতীতের সবকিছু ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই ভালো কাজ শুরু করে দাও। যারা আরও বেশি আমল করে তাদের জন্য প্রতিদানও বেশি। আর রজবে আল্লাহ হযরত নুহ আলাইহিস সালাম-কে নৌকোয় আরোহন করিয়ে ছিলেন। তাই তিনি রজবে সিয়াম পালন করতেন এবং তাঁর সাথীদেরকেও সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত তাঁদের নৌসফর চলে। অবশেষে আশুরা-দিবসে জুদি পর্বতে গিয়ে সে-সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে। এজন্য হযরত নুহ আলাইহিস সালাম, তাঁর সাথীবর্গ ও প্রাণীকুল আল্লাহ ﷻ-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সিয়াম পালন করেছিলেন। আশুরা-দিবসে আল্লাহ ইসরাইল সম্প্রদায়ের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করে দিয়ে ছিলেন, আশুরা-দিবসে আল্লাহ হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর শহরের তওবা কবুল করেছিলেন আর এ-দিবসেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জন্মলাভ করেন।'

হাদীসটি ইমাম আত-তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত সাঈদ ইবনে আবু রাশিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

«فِيْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ مَّنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ مِائَةَ سَنَةٍ، وَقَامَ مِائَةَ سَنَةٍ وَّهُوَ لِثَلَاثٍ بَقَيْنَ مِنْ رَجَبٍ، وَفِيْهِ بَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ مُحَمَّدًا».

'রজব মাসে একটি দিন ও একটি রাত এমন রয়েছে, যে-ব্যক্তি সেই দিন সিয়াম পালন করবে এবং সেই রাতে ইবাদত যাপন করবে সে যেন একশত বছরকালের একযুগ সিয়াম পালন করলো এবং একশত বছর ইবাদত যাপন করলো। সেটি ২৭ রজব। এই মাসে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন।'

ইমাম আল-বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি *শুআবুল ঈমানে* হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন যে, হাদীসটি মুনকার (অগ্রহণযোগ্য)। এটি সালমান আল-ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।[২]

وَعَنْ خُرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ أَكُفَّ الرِّجَالِ فِيْ صَوْمِ رَجَبَ حَتَّىٰ يَضَعُوْهَا فِي الطَّعَامِ، وَيَقُوْلُ: رَجَبُ وَمَا رَجَبُ؟ إِنَّمَا رَجَبُ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَرَكَ.

'হযরত খুরাশা ইবনুল হুর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছি যে, তিনি রজব মাসে সিয়াম পালনের কারণে লোকদেরকে হাতে পেটাতেন। এমনকি তাদেরকে খাওয়ায় বসিয়ে দিতেন এবং বলতেন, রজব! রজব কী? রজব মাস যাকে জাহিলিয়া যুগে লোকেরা সম্মান করতো কিন্তু ইসলাম এসে বিষয়টা প্রত্যাখ্যান করেছে।'

হাদীসটি ইমাম ইবনে আবু শায়বা রহমাতুল্লাহি আলাইহি[৩] ও ইমাম আত-তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর *আল-আওসাতে*[৪] বর্ণনা করেছেন।

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ৬৯, হাদীস: ৫৫৩৮

[২] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ৩৫৩০

[৩] ইবনে আবু শায়বা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ৯৭৫৮

[৪] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৭, পৃ. ৩২৭, হাদীস: ৭৬৩৬

وَعَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، يَقُوْلُ: فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِّصُوَّامِ رَجَبٍ.

'হযরত আবু কালাবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে যা রজব মাসে সিয়াম পালনকারীদের জন্য।

হাদীসটি ইমাম ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ شِبْلٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُوْلُ: فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لَّا يَدْخُلُهُ إِلَّا صُوَّامُ رَجَبَ.

'হযরত আমির ইবনে শিব্‌ল আল-জারমী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তি থেকে শুনেছি, যিনি বলতেন যে, তিনি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছেন, জান্নাতে একটি ঘর আছে, যাতে রজব মাসে সিয়াম পালনকারীরা ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।'

হাদীসটি ইমাম ইবনে শাহীন তাঁর *আত-তারগীবে* বর্ণনা করেছেন।[২]

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ رَجَبُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ. مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبَ سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ».

'নিশ্চয় জান্নাতে রজব নামে একটি হ্রদ আছে। যার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও সুমিষ্ট। যে-ব্যক্তি রজব মাসে একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তাকে সেই হ্রদের পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করবেন।'

ইমাম আশ-শীরাযী তাঁর *আলকাবে* এবং ইমাম আল-বায়হাকী তাঁর *শুআবুল ঈমানে*[৩] হাদীসটি হযরত আনাস (ইবনে মালিক) থেকে বর্ণনা করেছেন।

«صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمِ رَجَبَ كَفَّارَةُ ثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَالثَّانِيْ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، وَالثَّالِثِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، ثُمَّ كُلَّ يَوْمٍ شَهْرٌ».

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ২৫, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ৩০৪৬

[২] ইবনে আসাকির, *প্রাগুক্ত*, খ. ২৫, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ৩০৪৬; বস্তুত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আসাকির, ইমাম ইবনে শাহীন নয়

[৩] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭, হাদীস: ৩৮০০

'রজব মাসের প্রথম দিনের সিয়াম পালন তিন বছরের কাফফারা হয়ে যাবে, দ্বিতীয় দিনের সিয়াম পালন দুই বছরের কাফফারা হয়ে যাবে, তৃতীয় দিনের সিয়াম পালন একবছরের কাফফারা হয়ে যাবে এবং এরপরের সিয়ামগুলো এক মাসের কাফফারা হয়ে যাবে।'

ইমাম আবু মুহাম্মদ আল-খালাল রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *ফাযায়িলু শাহরি রজবে* হাদীসটি হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।[1]

«فِيْ رَجَبٍ لَيْلَةٌ يُكْتَبُ لِلْعَامِلِ فِيْهَا حَسَنَاتُ مِائَةِ سَنَةٍ، وَذَلِكَ لِثَلَاثٍ بَقَيْنَ مِنْ رَجَبٍ، فَمَنْ صَلَّى فِيْهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَدْعُوْ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَيُصْبِحُ صَائِمًا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىْ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوْ فِيْ مَعْصِيَةٍ».

'রজবে একটি রাত; যে-রাতে ইবাদতকারীর জন্য একশত বছরের সাওয়াব লেখা হবে। রাতটি হলে ২৭ রজব। যে-ব্যক্তি এ-রাতে বার রাকাআত সালাত আদায় করবে যার প্রত্যেক রাকাআতে একবার ফাতিহা আল-কিতাব, «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» একশত বার, ইস্তিগফার একশত বার, নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরুদ একশত বার এবং ইহ-পরকালীন যেকোনো বিষয়ে ইচ্ছানুযায়ী নিজের জন্য দুআ করবে আর দিনে সিয়াম পালন করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা এ-ধরনের প্রত্যেকের দুআ কবুল করেন। তবে যদি তারা বিপদ কামনা করে দুআ করে তা কবুল হবে না।'

ইমাম আল-বায়হাকী রাহিমাহুল্লাহ *শুআবুল ঈমানে* হযরত আবান থেকে, তিনি হযরত আনাস (ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, এটি অত্যন্ত দুর্বল, পূর্ববর্তী বর্ণনা থেকেও।[2]

---

[1] আল-হাসান আল-খালাল, *ফাযায়িলু শাহরি রজব*, পৃ. ৬২, হাদীস: ১০

[2] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭, হাদীস: ৩৮০০

হাফিয ইবনে হাজর (আল-আসকালানী রহ.)-এর *তাবয়ীনুল আজাবে* কিছু শব্দের অতিরিক্তিসহ এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে:

«فَضْلُ رَجَبَ عَلَىٰ سَائِرِ الشُّهُوْرِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَذْكَارِ، وَفَضْلُ شَعْبَانَ عَلَىٰ سَائِرِ الشُّهُوْرِ كَفَضْلِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَفَضْلُ رَمْضَانَ عَلَىٰ سَائِرِ الشُّهُوْرِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَىٰ سَائِرِ عِبَادِهِ».

'সমগ্র যিকরের ওপর কুরআনের মর্যাদা যেমন অন্যান্য মাসের ওপর রজবের মর্যাদ ঠিক সে-রকম। অন্যান্য নবীদের ওপর হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মর্যাদা যেমন অন্যান্য মাসের ওপর শাবানের মর্যাদা ঠিক সে-রকম। আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাঁর মর্যাদা যেমন অন্যান্য মাসের ওপর রামাযানের মর্যাদা ঠিক সে-রকম।'[১]

হাফিয ইবনে হাজর (আল-আসকালানী রহ.) বলেন, এটি হযরত আস-সালাফী বর্ণনা করেছেন। এর সনদ নির্ভরযোগ্য। তবে হিবাতুলাহ্ আস-সাকাতী ছাড়া। এই ব্যক্তিটি বিপদজনক।[২] বাকি আল্লাহই ভালো জানেন।

॥ হাদীস ॥

«فِيْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، مَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ كَمَنْ صَامَ مِائَةَ سَنَةٍ، وَهُوَ لِثَلَاثٍ بَقِيْنَ، وَفِيْهِ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا».

'রজবে একটি দিন ও একটি রাত আছে, সে-দিন যে-ব্যক্তি সিয়াম পালন করে আর সে-রাতে ইবাদাত পালন করবে এর জন্য পুরস্কার হলো তিনি যেন ১০০ বছর ইবাদত করেছেন। আর ওই তারিখটি হলো ২৭ রজব। এ-দিনেই হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আর্বিভাব হয়েছিলো।'[৩]

ইমাম আদ-দায়লামী রহ. হাদীসটি হযরত সালমান (আল-ফারসী রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪] সনদের মধ্যে একজন খালিদ ইবনে হাইয়াজ রয়েছেন। আর ইবনে হাইয়াজ একজন অবাঞ্চিত ব্যক্তি। তার অগুণিত

---

[১] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবয়ীনুল আজাব*, পৃ. ২৫, হাদীস: ৮; (খ) ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬১, হাদীস: ৪০

[২] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*

[৩] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩, হাদীস: ২৪; (খ) ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬১, হাদীস: ৪১

[৪] আদ-দায়লামী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৪২, হাদীস: ৪৩৮১

وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ، قَالَ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَّشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ রজব আসলে বলতেন,

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَّشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

'হে আল্লাহ! রজব ও শাবানে আমাদের জন্য বরকত নাযিল করুন এবং রমযান আমাদেরকে নসীব করুন।''

হাদীসটি ইমাম ইবনে আসাকির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর *তারিখে*[১] এবং ইবনুন নাজ্জার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[২] বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে আসাকির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে,

«وَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْـجُمُعَةِ قَالَ: «هَـٰذِهِ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ، وَيَوْمُ الْـجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ».

'জুমুআর রাতে নবী করীম ﷺ বলতেন, এটি হচ্ছে একটি উজ্জ্বল রজনী এবং জুমুআর দিন হলো একটি আলোকিত দিন।'[৩]

তানযীহুশ শরীয়া গ্রন্থে আলোচিত বানোয়াট হাদীসসমূহ:

॥ হাদীস ॥

«فَضْلُ رَجَبَ عَلَىٰ سَائِرِ الشُّهُوْرِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَلَامِ».

'সমগ্র সাহিত্যের ওপর কুরআনের মর্যাদা যেমন অন্যান্য মাসের ওপর রজবের মর্যাদা ঠিক সে-রকম।'[৪]

এটি ইমাম আদ-দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস (ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৫] তবে হাদীসটি বানোয়াট হবার কারণ তিনি বর্ণনা করেননি এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যে কে অজ্ঞাত পরিচিত তাও উল্লেখ করেননি।[৬]

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৪০, পৃ. ৫৭, হাদীস: ৪৬৫৭
[২] ইবনুন নাজ্জার, *যায়লু তারিখি বগদাদ*, খ. ১৬, পৃ. ৮৫, হাদীস: ৭৩
[৩] ইবনে আসাকির, *প্রাগুক্ত*
[৪] ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬০, হাদীস: ৪০
[৫] আদ-দায়লামী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৩০, হাদীস: ৪৩৪৯
[৬] ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬১

অগ্রহণযোগ্য (মুনকার) হাদীস রয়েছে। এখানে তার বেটা খালিদে
নির্ভর করা হয়েছে যিনি এই হাদীসে বিপদজনক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত

ইমাম হান্নাদ আন-নাফাসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *ফাওয়ায়িদ* গ্রন্থে হযরত
(ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) সনদে মা
এসেছে:

ـتُ نَبِيًّا فِي السَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبَ، مَنْ صَامَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَدَعَا
إِفْطَارِهِ كَانَتْ كَفَّارَةُ عَشَرَ سِنِيْنَ».

'সাতাশে রজব আমি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। যে-ব্যক্তি সে-
সিয়াম পালন করবে এবং ইফতারের সময় দুআ করবে তা তার
বছরের পাপের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।'[2]

ইমাম আবু মুআয শাহ আল-মারওয়াযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জুয এব
আবদুল আযীয আল-কিতানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *ফাযায়িল রাজাবে* যামিরা
তিনি ইবনে শাওযাব থেকে, তিনি মাতার আল-ওয়ার্রাক থেকে, তি
ইবনে হাওশাব থেকে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে
সনদে বর্ণনা করেন,

ـنْ صَامَ يَوْمَ سَبْعَ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّيْنَ
ـرٍ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ هَبَطَ فِيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالرِّسَالَةِ».

'যে-ব্যক্তি ২৭ রজব সিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার ৬০ মাসব্যা
সিয়াম পালনের সওয়াব লিখে দেবেন। এই দিনেই হযরত জিবরী
আলাইহিস সালাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর রিসালত নিয়ে আবির্
হন।'[3]

এ-প্রসঙ্গে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের মধ্যে এটি বেনযির একটি

॥ হাদীস ॥

ـنْ صَامَ يَوْمًا مِّنْ رَجَبَ وَقَامَ لَيْلَةً مِّنْ لَيَالِيْهِ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَىٰ آمِنًا يَوْمَ
ـيَامَةِ، وَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ وَهُوَ يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ».

---

[1] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবয়ীনুল আজাব*, পৃ. ৪৩

[2] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২৬; (খ) ইবনে আরাক, *প্রাগু*
পৃ. ১৬১, হাদীস: ৪১

[3] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪–৪৫, হাদীস: ২৮; (খ) ইবনে আরাক,
খ. ২, পৃ. ১৬১, হাদীস: ৪১

'যে-ব্যক্তি রজবে কোনো একটি দিন সিয়াম পালন করবে এবং কোনো একটি রাত ইবাদাত পালন করবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে কিয়ামত দিবসে নিরাপদ অবস্থায় উঠবেন এবং তিনি তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) ও তাকবীর (আল্লাহু আকবর) পড়তে পড়তে পুলসিরাত অতিক্রম করবে।'

আল-হাদীস। ইমাম আদ-দারিমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জাবির (ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইসমাইল ইবনে ইয়াহইয়া আত-তায়মীর বরাতে এটি বর্ণনা করেছেন।[১]

॥ হাদীস ॥

«مَنْ أَحْيَىٰ لَيْلَةً مِّنْ رَجَبٍ، وَصَامَ يَوْمًا مِّنْهُ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَكَسَاهُ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، وَسَقَاهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ».

'যে-ব্যক্তি রজব মাসে এক রাত জাগ্রত থাকবে এবং একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন এবং জান্নাতের মূল্যবান পোশাক পরাবেন এবং জান্নাতের লেবেলযুক্ত পানীয় পান করাবেন।'

ইমাম আদ-দারিমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসটিকে হযরত হুসায়ন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে আল-হুসায়ন ইবনুল মুখারিকও রয়েছেন।[২]

॥ হাদীস ॥

«رَجَبُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَرَمِ، وَأَيَّامُهُ مَكْتُوْبَةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا صَامَ الرَّجُلُ مِنْهُ يَوْمًا وَّجَوَّدَ صَوْمَهُ بِتَقْوَى اللهِ نَطَقَ الْبَابُ وَنَطَقَ الْيَوْمُ، فَقَالَا: يَا رَبِّ اغْفِرْ لَهُ، وَإِذَا لَمْ يُتِمَّ بِتَقْوَى اللهِ لَمْ يَسْتَغْفِرَا لَهُ، وَقَالَا: خَدَعَتْكَ نَفْسُكَ».

'রজব হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ মাস; এর দিনসমূহ ছষ্ঠ আসমানের দরজাসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। যখন কোনো ব্যক্তি রজব মাসে কোনো একদিন সিয়াম পালন করবে এবং সেই সিয়াম পালনকে তাকওয়া দ্বারা সজ্জিত করে তবে সেই দরজা আর সেই দিন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। যদি সে তাকওয়ার সাথে সিয়াম

[১] ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৪৪

[২] ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*

পালন না করে তখন তার জন্য তারা ক্ষমার দুআ করে না এবং বলে যে, তুমি নিজেকে ধোকা দিয়েছ।'[১]

ইমাম ইবনে শাহীন ও ইমাম আদ-দারিমী হাদীস হযরত আবু সাঈদ (আল-খুদরী) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে ইসমাই আত-তায়মীও রয়েছেন।[২]

॥ হাদীস ॥

«رَجَبُ شَهْرُ اللهِ الْأَصَمُّ الْمُتَّرُ الَّذِيْ أَفْرَدَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَفْسِهِ، فَمَنْ صَامَ يَوْمًا إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا اِسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللهِ الْأَكْبَرَ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِيْ تُرْمَضُ فِيْهِ ذُنُوْبُهُمْ، فَإِذَا صَامَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَّلَمْ يَكْذِبْ، وَلَمْ يَغْتَبْ، وَفِطْرُهُ طَيِّبٌ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سُلْخِهَا».

'আল্লাহর মাস রজব এক বধির ও রহস্যপূর্ণ মাস। যেমাসকে আল্লাহ তা'য়ালা নিজে বিশেষায়িত করেছেন। যে-ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করবে, এজন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অপরিহার্য হবে। আর রামাযান মাস আমার উম্মতের মাস। এতে তাদের পাপ মোচন করা হয়। যখন কোনো মুসলিম বান্দা সিয়াম পালন করে আর মিথ্যা পরিহার করে, পরনিন্দা থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র খাদ্য দিয়ে ইফতার করে তখন সে স্বীয় পাপ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে যায়। যেমন– সাপ তার খোলস পাল্টিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।'[৩]

ইমাম আল-হাকিম এই হাদীসটি তাঁর *তারিখে* হযরত আবু সাঈদ (আল-খুদরী) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আবু হারুন আল-আবদী ও ইসাম ইবনে তালীক কোনো কাজের লোক নন। আমি তো বলি, আবু হারুন হচ্ছেন বড্ড বিপজ্জনক ব্যক্তি, সকলে তাকে মিথ্যুক বলেছেন। এমনকি কেউ কেউ তাকে ফিরআওন থেকেও চরম মিথ্যাবাদী বলেছেন।[৪]

---

[১] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবয়ীনুল আজাব*, পৃ. ২৮, হাদীস: ১৩; (খ) ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৪৬

[২] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*

[৩] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬, হাদীস: ১০; (খ) ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৪–১৬৫, হাদীস: ৪৭

[৪] ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৫

॥ হাদীস ॥

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ شَهْرٍ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تُعَظِّمُهُ فِيْ جَاهِلِيَّتِهَا وَمَا زَادَهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا فَضْلًا وَّتَعْظِيْمًا.

فَمَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمًا تَطَوُّعًا مُّحْتَسِبًا بِهِ ثَوَابَ اللهِ عَنْهُ يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ مُخْلِصًا أَطْفَأَ صَوْمُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ غَضَبَ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، وَأَغْلَقَ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ وَلَوْ أُعْطِيَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا مَّا كَانَ ذَلِكَ جَزَاءً لَّهُ وَلَا يَسْتَكْمِلُ أَجْرَهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا دُوْنَ يَوْمِ الْحِسَابِ، وَلَهُ إِذَا أَمْسَىٰ عَشْرُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ فَإِنْ دَعَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ عَاجِلِ الدُّنْيَا أَعْطَاهُ لَهُ وَادَّخَرَ لَهُ الْخَيْرَ كَأَفْضَلِ مَا دَعَا دَاعٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ وَأَحْبَابِهِ وَأَصْفِيَائِهِ.

وَمَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ أَجْرُ عَشَرَةٍ مِّنَ الصِّدِّيْقِيْنَ فِيْ عُمْرِهِمْ بَالِغَةً مَّا بَلَغَتْ.

وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَقَالَ اللهُ ﷻ عِنْدَ إِفْطَارِهِ: لَقَدْ وَجَبَ حَقُّ عَبْدِيْ هَذَا، وَوَجَبَتْ لَهُ مَحَبَّتِيْ وَوِلَايَتِيْ، أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِيْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

وَمَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَيُكْتَبُ لَهُ عَدَدُ رَمْلِ عَالِجٍ حَسَنَاتٍ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَيُقَالُ: تَمَنَّ عَلَى اللهِ مَا شِئْتَ.

وَمَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَيُعْطَىٰ نُوْرًا يَّسْتَضِيْءُ بِهِ أَهْلُ الْجَمْعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُبْعَثُ فِي الْآمِنِيْنَ حَتَّىٰ يَمُرَّ عَلَى الصِّرَاطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَيُعَافَىٰ مِنْ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ، وَيُقْبِلُ اللهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ إِذَا لَقِيَهُ.

مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَتُغْلَقُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ.

مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَرُفِعَ كِتَابُهُ فِيْ أَعْلَىٰ عِلِّيِّيْنَ، يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْآمِنِيْنَ، وَيَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ وَوَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ يُشْرِقُ أَهْلِ الْجَمْعِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا: هٰذَا نَبِيٌّ مُصْطَفَىٰ، فَإِنَّ أَدْنَىٰ مَا يُعْطَىٰ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

وَمَنْ صَامَ عَشَرَةً فَبَخٍ بَخٍ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَعَشَرَةُ أَضْعَافِهِ؛ وَهُوَ مِمَّنْ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ، وَيَكُوْنُ فِي الْمُقَرَّبِيْنَ الْقَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ، وَكَمَنْ عَبَدَ اللهَ أَلْفَ عَامٍ صَائِمًا قَائِمًا صَابِرًا مُحْتَسِبًا.

وَمَنْ صَامَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَعِشْرُوْنَ ضِعْفًا؛ وَهُوَ مِمَّنْ يُزَاحِمُ إِبْرَاهِيْمَ ﷺ فِيْ قُبَّتِهِ وَيُشَفَّعُ فِيْ مِثْلِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبِ.

وَمَنْ صَامَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا كَمَلًا كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَثَلَاثُوْنَ ضِعْفًا، وَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ: أَبْشِرْ يَا وَلِيَّ اللهِ! بِالْكَرَامَةِ الْعُظْمَىٰ وَالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِ اللهِ الْجَلِيْلِ ﷻ فِيْ مُرَافَقَةِ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا، طُوبَىٰ لَكَ طُوبَىٰ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَدًا، إِذَا كُشِفَ الْغِطَاءُ فَأَفْضَيْتَ إِلَىٰ خَتْمِ ثَوَابِ رَبِّكَ الْكَرِيْمِ، فَإِذَا نَزَلَ بِهِ مَلِكُ الْمَوْتِ سَقَاهُ رَبُّهُ عِنْدَ خُرُوْجِ نَفْسِهِ مِنْ شَرْبَةٍ مِنْ حِيَاضِ الْفِرْدَوْسِ حَتّٰى لَا يَجِدَ لِلْمَوْتِ أَلَمًا، فَيَظَلُّ فِيْ قَبْرِهِ رَيَّانَ حَتّٰى يَرِدَ حَوْضَ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ أَتَاهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ مَعَهُمُ النَّجَائِبُ مِنَ

الدُّرُّ وَالْيَاقُوتِ، وَمَعَهُمْ طَرَائِفُ الْحُلِيِّ وَالْحُلَلِ، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا وَلِيَّ اللهِ! النَّجَا إِلَىٰ رَبِّكَ الَّذِيْ أَظْمَأْتَ لَهُ نَهَارَكَ وَأَنْحَلْتَ لَهُ جِسْمَكَ؛ فَهُوَ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُوْلًا جَنَّاتِ عَدْنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفَائِزِيْنَ الَّذِيْنَ ﴿ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾ [المائدة]، فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ يَوْمٍ يَصُوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَىٰ قَدْرِ قُوَّتِهِ فَتَصَدَّقَ بِهَا فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِيْعُ الْخَلَائِقِ عَلَىٰ أَنْ يَقْدِرُوْا قَدْرَ مَا أُعْطِيَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ الْعُشْرِ مِمَّا أُعْطِيَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مِنَ الثَّوَابِ

'হযরত আবুদ দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, এক লোক তাঁকে রজবের সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি যে-মাসটির কথা জিজ্ঞাসা করেছ জাহিলি যুগে লোকেরা একে সম্মান করতো, ইসলাম তার মর্যাদা ও সম্মানটুকু ছাড়া এতে আর কিছু বৃদ্ধি করেনি।

যে-ব্যক্তি রজব মাসে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে একদিন নফল সিয়াম পালন করবে তা তার আল্লাহর ঐকাগ্রিক সন্তুষ্টি বহন করবে, তার সিয়াম পালন মহান আল্লাহর ক্রোধকে শীতল করবে আর জাহান্নামের দরজাসমূহের একটা দরজা অর্গলিত করবে। যদি তাকে পৃথিবীভরেও স্বর্ণ-অলংকার দেওয়া হয় তবে এসব তার জন্য উপযুক্ত প্রতিদান নয়। বিচার-দিবস ছাড়া জাগতিক কোনো কিছুই তার পরিপূর্ণ প্রতিদান হতে পারে না। যখন সন্ধ্যা হয় তখন তার ১০টি দুআ কবুল হয়। অতএব সে যদি পার্থিব কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা দান করেন এবং তিনি তার জন্য কল্যাণের বিশাল ভা-ার যা আল্লাহর অলী, তাঁর প্রিয় বান্দা ও মনোনীত ব্যক্তিবর্গের মতো প্রার্থনাকারীগণ তাঁর নিকট প্রার্থনা করে থাকেন—প্রস্তুত রেখেছেন।

আর যে ব্যক্তি দুইদিন সিয়াম পালন করবে সে অনুরূপ লাভ করবে এবং সে এসবের সঙ্গে ১০জন সিদ্দীক ব্যক্তিবর্গের পুরো জীবনের অধিক পুরস্কার পাবে—তা যতো বেশিই হোক।

যে-ব্যক্তি তিনদিন সিয়াম পালন করবে সে অনুরূপ লাভ করবে। তার ইফতারের সময় আল্লাহ ﷻ বলেন, আমার এ-বান্দার হক ওয়াজিব হয়ে গেলো। আমার মুহাব্বত ও ভালোবাসা তার জন্য

জরুরি হয়ে পড়েছে। হে আমার ফেরেশতাগণ! আমি তোমা
সাক্ষী রাখছি, আমি তার জীবনের অতীত ও ভষ্যিতের সকল
ক্ষমা করে দিয়েছি।

যে-ব্যক্তি চারদিন সিয়াম পালন করবে সে অনুরূপ
করবে। সে কিয়ামত-দিবসে পুনরুত্থিত হবে তার মুখমণ্ডল
পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মতো, তার আমলনামায় লেখা হবে মরুভূ
বালুরাশির সমপরিমাণ সওয়াব। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে
তাকে বলা হবে, আল্লাহর নিকট যা খুশি চাইতে পারো।

যে-ব্যক্তি ছয়দিন সিয়াম পালন করবে সে অনুরূপ
করবে। তাকে দেওয়া হবে নূর; যা কিয়ামত-দিবসে সম
লোকেরা আলো গ্রহণ করবে। সে পুনরুত্থিত হবে নিরাপত্তাপ্র
লোকদের সাথে এমনকি অনাসায়াসে পুলসিরাত পার করবে। মা
পিতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তা ছিন্ন করার অপরাধও ক্ষমা করা হ
আর সাক্ষাতের সময় আল্লাহ তার ললাটে চুম্বন করবেন।

যে-ব্যক্তি সাতদিন সিয়াম পালন করবে সে অনুরূপ
করবে। তার জন্য জাহান্নামের সাতটা দরজা বন্ধ করে দেওয়া হ
আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন এবং জান্নাত
তিনি তার জন্য ওয়াজিব করে দেবেন। সেখানে তার যেখানে খু
বসবাস করবে।

আর যে-ব্যক্তি আটদিন সিয়াম পালন করবে সে অনুরূ
লাভ করবে। আল্লাহ তার আমলনামাকে ইল্লিয়িনের সর্বোচ্চ স্ত
রাখবেন। সে কিয়ামত-দিবসে পুনরুত্থিত হবে নিরাপত্তাপ্রা
লোকদের সাথে। তার কবর থেকে নূর বিচ্ছুরিত হবে। তার চেহা
হবে আলোকোজ্জ্বল; এতে সমবেত সকলে আলোকিত হয়ে উঠবে
এমনকি তারা বলবে, ইনি বোধহয় কোনো মনোনীত নবী। হ্যাঁ, তা
জন্য ন্যূনতম পুরস্কর হবে কোনো হিসাব-নিকাশ ছাড়াই আল্লা
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

যে-ব্যক্তি দশদিন সিয়াম পালন করবে, বাহ বাহ! সে
অনুরূপ লাভ করবে। সেই সঙ্গে আরও দশগুণ পাবে সে। সে হ
সেসব লোকদের একজন যাদের পাপগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত ক
হবে। সে আল্লাহর ঘনিষ্ট বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তার অবস্থা হ
সেই বান্দার মতো যারা হাজার বছর ধরে সিয়াম সাধনা, রাত জে
ইবাদত পালন, ধৈর্যধারণ এবং সবকিছুর জন্য সওয়াবের প্রত্যা
ছিলেন।

যে-ব্যক্তি বিশদিন সিয়াম পালন করেব সে অনুরূপ লাভ করবে। সেই সঙ্গে আরও বিশগুণ পাবে সে। সে সেসব লোকদের একজন যাদের সাথে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর গম্বুজের আনন্দ উদ্‌যাপন করবেন। সে রবিয়া ও মুযর যেমন পাপিষ্ট ও অপরাধীদের মতো অনেক লোকদের জন্য সুপারিশ করবে।

যে-ব্যক্তি পুরো ত্রিশদিন সিয়াম পালন করবে সে অনুরূপ লাভ করবে। সেই সঙ্গে আরও ত্রিশ গুণ পাবে সে। আসমান থেকে এক আহ্বানকারী ঘোষণা করবে, হে আল্লাহর ওলী! মহাসম্মান ও মহান আল্লাহ ﷻ-এর সাথে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুন্যাত্মাদের মর্যাদায় সাক্ষাৎ লাভের সুসংবাদ। তাঁরা বন্ধু হিসেবে শ্রেষ্ঠ। তোমার জন্য সুসংবাদ! তোমার জন্য সুসংবাদ! তোমার জন্য সুসংবাদ!—তিন তিনবার বলা হবে একথা। যখন পর্দা উঠবে, তখনই তোমার প্রিয় প্রতিপালকের প্রতিদান পরিসমাপ্তির দিকে পৌছুবে। অতঃপর যখন মালাকুল মওত তার নিকট আগমন করবেন তার প্রভু তাকে তার মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে জান্নাতুল ফিরদাওসের হাওযের পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করাবেন—এ ছাড়া মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে না। কবরে সে আনন্দ মুখর পরিবেশে থাকবে। ততক্ষণে সে নবী করীম ﷺ-এর হাওযে পৌছুবে। অতঃপর যখন সে তার কবর থেকে উঠবে, তখন তার কাছে সত্তর হাজার ফেরেশতা আসবেন, যারা মূল্যবান মুক্তা ও মর্মর পাথর সাথে নিয়ে আসবেন এবং তাদের সাথে অভিজাত অলংকার ও পোশাক থাকবে। তারপর তারা বলবেন, হে আল্লাহর ওলী! আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করো, যার জন্যে তুমি দিনে পিপাসিত ছিলে আর নিজ শরীরকে যার জন্যে দুর্বল করে ছিলে। সেই কিয়ামত-দিবসে আদন জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তি; সে হবে সফল মানুষদের সাথে 'যাদের ওপর আল্লাহ হবেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।'[১] আর এটিই হচ্ছে মহাসাফল্য।

যদি সিয়াম সাধনার সাথে প্রত্যেক দিন সাধ্যমতে সাদকাও করে, তাহলে এজন্য তাকে অপরিমেয় সাওয়াব দান করা হবে। সকল সৃষ্টিও যদি সম্মিলিতভাবে এই বান্দাকে কী পরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হয়েছে তা গণনা করে, এই বান্দাকে কী পরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হয়েছে তার দশদশমাংশেও তারা পৌছুতে পারবে না।'[২]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-মায়িদা*, ৫:১১৯

[২] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবয়ীনুল আজাব*, পৃ. ৪৫, হাদীস: ২৯; (খ) ইবনে আরাক, *রাওক*, খ. ২, পৃ. ১৬১–১৬৩, হাদীস: ৪২

ইমাম ইবনে শাহীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আত-তারগীব গ্রন্থে হযরত মাকহুল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে বেশ গোঁজামিল রয়েছে, সনদের নিম্নের লোক উপরে চলে এসেছে। এতে দাউদ ইবনুল মুহাব্বার নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি অত্যন্ত নিন্দিত। আর সুলায়মান ইবনুল হাকাম নামে আরেকজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তা ছাড়া এর অন্যতম বর্ণনাকারী আল-আলা ইবনে কসীর; তিনি তো সর্বসম্মতভাবে দুর্বল।[1]

হাফিয ইবনে হাজার (আল-আসকলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)) তাঁর তাবয়ীনুল আজব গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই হাদীসটি সম্পূর্ণ বানোয়াট আর এটি বানোয়াট হওয়ার কারণও সুস্পষ্ট। যে এটি উদ্ভাবন করেছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন। আল্লাহর শপথ! লেখার সময় এটি পড়ে আমার লোম খাড়া হয়ে গেছে। এজন্য দাউদ ইবনুল মুহাব্বার ও আল-আলা ইবনে খালিদই। এরা দু'ব্যক্তি বড়ই মিথ্যাবাদী। আর হযরত মাকহুল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তো হযরত আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কখনো পাননি। আমার ধরণা মতে আল্লাহর কসম! এটি কখনো হযরত মাকহুল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেননি।[2]

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلَ رَجَبٍ بِجُمُعَةٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، رَجَبٌ، شَهْرُ اللهِ، الْأَصَمُّ، تُضَاعَفُ فِيْهِ الْحَسَنَاتُ وَتُسْتَجَابُ فِيْهِ الدَّعَوَاتُ، وَتُفَرَّجُ فِيْهِ الْكُرُبَاتُ، لَا يُرَدُّ لِلْمُؤْمِنِ فِيْهِ دَعْوَةٌ، فَمَنِ اكْتَسَبَ فِيْهِ خَيْرًا ضُوْعِفَ لَهُ فِيْهِ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِـمَنْ يَشَاءُ.

فَعَلَيْكُمْ بِقِيَامِ لَيْلِهِ، وَصِيَامِ نَهَارِهِ، فَمَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ فِيْهِ خَمْسِيْنَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ، وَبِعَدَدِ الشَّعْرِ وَالْوَبَرِ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ صِيَامَ سَنَةٍ، وَمَنْ خَزَنَ فِيْهِ لِسَانَهُ لَقَّنَهُ اللهُ حُجَّةً عِنْدَ مُسَاءَلَةِ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ، وَمَنْ تَصَدَّقَ فِيْهِ بِصَدَقَةٍ كَانَ بِهَا فِكَاكُ رَقَبَةٍ مِنَ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمَنْ

---

[1] ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৩

[2] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবয়ীনুল আজাব*, পৃ. ৪৬–৪৭

وَصَلَ فِيْهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَنَصَرَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ، وَمَنْ عَادَ فِيْهِ مَرِيْضًا أَمَرَ اللهُ لَهُ كِرَامَ مَلَائِكَتِهِ بِزِيَارَتِهِ وَالتَّسْلِيْمِ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّى فِيْهِ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَأَنَّمَا أَحْيَى مَوْؤُدَةً، وَمَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا طَعَامًا أَجْلَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا إِبْرَاهِيْمُ وَمُحَمَّدٌ، وَمَنْ سَقَى شَرْبَةً مِّنْ مَاءٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ، وَمَنْ كَسَا مُؤْمِنًا كَسَاهُ اللهُ أَلْفَ حُلَّةٍ مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَكْرَمَ يَتِيْمًا وَرَفَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ مَسَّتْهَا يَدُهُ، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ﷻ فِيْهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ سَبَّحَ اللهَ تَسْبِيْحَةً أَوْ هَلَّلَهُ تَهْلِيْلَةً كُتِبَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ، وَمَنْ خَتَمَ فِيْهِ الْقُرْآنَ مَرَّةً أُلْبِسَ هُوَ وَوَالِدُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَاجًا مُّكَلَّلًا بِاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَأَمِنَ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ রজবপূর্ব এক জুমুআয় বলেছেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের ওপর ছায়া ঢেলেছে এক মহাত্ম্যপূর্ণ মাস রজব, এটি আল্লাহর মাস, এটি বধিরও। এতে দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যায়, দুআ কবুল হয়, বিপদাপদ দূর হয়। এতে কোনো মুমিনের দুআই অগ্রাহ্য হয় না। অতএব এ-মাসে যে-ব্যক্তি কোনো সৎকাজ করে তাকে কয়েক গুণ অধিক সওয়াব দেওয়া হয়—আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগণ সাওয়াব দান করেন।

অতএব তোমাদের উচিৎ এ-মাসে রাত জেগে ইবাদত করা এবং দিনের বেলা সিয়াম পালন করা। যে-ব্যক্তি এ-মাসের কোনো দিন পঞ্চাশ রাকাআত সালাত পড়ে আর প্রত্যেক রাকাআতে সাধ্যমতো কুরআন পাঠ করবে, তবে আল্লাহ তাকে জোড়-বেজোড় সংখ্যার সমপরিমান এবং (মানুষের) চুল ও (উট-ছাগলের) লোমের সমপরিমান সাওয়াব দান করেন। যে-ব্যক্তি এ-মাসে একদিন সিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তাকে একবছর সিয়াম পালনের সাওয়াব দান করবেন। যে-ব্যক্তি এ-মাসে তার জিহ্বাকে নিরাপদ রাখবে মুনকার-নকিরের প্রশ্নের সময় তাকে সেসবের উত্তর শিখিয়ে দেবেন। যে-

ব্যক্তি এ-মাসে দান-খয়রাত করবে, এতে জাহান্নামের আজাব থেকে সে মুক্তি পাবে। যে-ব্যক্তি এ-মাসে আত্মীয়তা রক্ষা করবে, আল্লাহ্ ইহ-পরকালে তার সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করবেন এবং আজীবন তার দুশমনদের ওপর তাকে বিজয়ী রাখবেন। যে-ব্যক্তি এ-মাসে কোনো রোগীর সেবা করে, আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতা মহোদয়দেরকে সেই লোকে সাথে সাক্ষাৎ ও তার নিরাপত্তার নির্দেশ দেন। যে-ব্যক্তি এ-মাসে জানাযার সালাত পড়ে, সে যেন এ-মৃতদেহে প্রাণ ঢেলে দিল। যে-ব্যক্তি এ-মাসে কোন মুমিনকে পানাহার করায় আল্লাহ কিয়ামত-দিবসে তাকে হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বৈঠকে তাকে বসাবেন। যে-ব্যক্তি এ-মাসে কাউকে পানির পানীয় পান করায়, আল্লাহ্ তাকে মূল্যবান ও অভিজাত শরবত পান করাবেন। যে-ব্যক্তি এ-মাসে কোনো মুমিনকে কাপড় পরিধান করায়, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের এক হাজার শ্রেষ্ঠ পোষাক পরাবেন। যে-ব্যক্তি কোনো এতিমকে দয়া করে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তবে যতগুলো লোমের ওপর হাত বুলিয়েছে সে আল্লাহ্ তার সমপরিমান সে ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে দেবেন। যে-ব্যক্তি এ-মাসে একবার আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু)-এর নিকট মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহ্ তার ক্ষমা করে দেন। যে-ব্যক্তি এ-মাসে সুবহানাল্লাহর তাসবীহ্ এবং লা-ইলাহা ইলাল্লাহর তাহ্লীল পড়ে আল্লাহ্ তার নাম বেশি বেশি যিকরকারী নর-নারীর তালিকাভূক্ত করে নেন। যে-ব্যক্তি এ-মাসে একবার কুরআন সমাপ্ত করে, আল্লাহ তাকে, পিতা-মাতাকে মণি-মুক্তার কারুকার্যমি-ত একটি তাজ পরাবেন। কিয়ামত-দিবসের অপমান থেকে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করবেন।"[১]

এটি ইমাম ইবনে আসাকির (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)।[২] *তাবয়ীনুল আজবে* এটি একটি বানোয়াট বর্ণনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

এসব হাদীস যেসব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে এর সবকটি আমার সামনে আছে এবং তাদের পর্যালোচনা অনুযায়ী এসব হাদীস একটিও বিশুদ্ধ নয়, বরং এসবের উদ্দেশ্য অত্যন্ত দুর্বল এবং সম্পূর্ণভাবে বানোয়াট। আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

---

[১] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবয়ীনুল আজাব*, পৃ. ৪১–৪২, হাদীসঃ ২৩; (খ) ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৩–১৬৪, হাদীসঃ ৪৩

[২] (ক) ইবনে আসাকির, *মুযউম কী ফযলি রজব*, পৃ. ৩১৭, হাদীসঃ ১৪; (খ) ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৪৩, পৃ. ২৯২, হাদীসঃ ৫১২১

[৩] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

এ-মাসে সাধারণ মানুষের কাছে অন্যতম প্রসিদ্ধ হলো লায়লাতুর রাগায়িব। রজবের প্রথম জুমুআর রাতকে লায়লাতুর রাগায়িব বলে। সুফিদের মাঝে এ-রাতে একপ্রকারের সালাত প্রসিদ্ধ রয়েছে। মুহাদ্দিসবর্গ বেশ জোরালোভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এমনকি ইমাম মুহ্‌উদ্দীন আন-নাওয়াওয়ী বলেছেন যে, তাঁর বক্তব্য এই: 'আর-রাগায়িব এবং পনের শাবানের রাতের সালাত সুন্নাত, বরং এ দু'ধরনের সালাতই জঘন্য ধরনের বিদআত। এ-ক্ষেত্রে আবু তালিব আল-মক্কী-এর *কুওয়াতুল কুলুব*[১] এবং হুজ্জাতুল ইসলাম আল-গাযালী-এর *ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীনে*[২] এই সালাতদ্বয়ের উল্লেখ থাকলেও তা বিবেচ্য নয়। আর গ্রন্থদুটোতে এ-প্রসঙ্গে আলোচিত হাদীসগুলো গ্রাহ্য নয়। কারণ এসব হাদীস বাতিল। ইমাম আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম[৩] এই দু'ধরনের সালাতের অবৈধতা সম্পর্কে চমৎকার একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিষয়টি সেখানে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা নাকচ করা হয়েছে।'[৪]

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী তাঁর ফাতাওয়ায়ও উল্লিখিত সালাতদুটোর নাকচ করে দিয়েছেন, এই প্রথার নিন্দাবাদ করেছেন, এসব বিষয়কে ভিত্তিহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, সালাতদুটো পরিত্যাগ করা, তা থেকে দূরে থাকা এবং এসব প্রথা পুজারিদেরকে প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ।[৫]

নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য হলো—আল্লাহ সুবহানাহু তাদের সহায় হোন—মানুষের এসব প্রথাপুজা নিষেধ করা। কেননা তারা দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেক দায়িত্বশীল তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদেহি করতে বাধ্য।[৬]

---

[১] আবু তালিব আল-মক্কী, *কুয়াতুল কুলূব*, খ. ১, পৃ. ১৩৩ দেখুন

[২] আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০২–২০৩ দেখুন

[৩] আবু শামা আল-মাকদিসী, *আল-বায়িস*, ইমাম আবদুল আযিয আবদুস সালাম ভ্রন, ইমাম আন-নাওয়াওয়ী তাঁর কিতাবে আবু শামা আল-মাকদিসী-এর কথাই লিখেছেন।

[৪] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মজমূ' শরহুল মুহাযযাব*, খ. ৪, পৃ. ৫৬

[৫] আন-নাওয়াওয়ী, *খুলাসাতুল আহকাম*, খ. ১, পৃ. ১১৫–১১৬

[৬] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১০৩, হাদীসঃ ২৯২৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসুল ইরশাদ করেন,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

'সাবধান তোমরা সকলে দায়িত্বশীল, আর তোমাদের সকলেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদেহি করতে বাধ্য'।

বহু আলেম এ-ধরনের সালাত নাকচ, নিন্দাবাদ ও প্রথাপুজারিদের প্রত্যাখ্যান করে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

শায়খ শিহাবউদ্দীন আহমদ ইবনে হাজর আল-মক্কী আল-হায়সামী রহ. বলেন, এই হলো আমাদের মাযহাব, মালিকী মাযহাব, অন্যান্য ইমামগণ ও হিজাযের অধিকাংশ ওলামার মাযহাব এবং মদীনার ফকীহগণের মাযহাব।

এ-শায়খ তো এ-বিষয়ের ওপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে একটি হাদীস এনেছেন তিনি।

«مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

'যে-ব্যক্তি ২৭ রজব রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে...।'

অতঃপর এর পদ্ধতি আলোচিত হয়।

«ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا»..

'অতঃপর সকালে সিয়াম পালন করবে।'

অতঃপর বলা হয়,

«إِنَّهَا اللَّيْلَةَ الَّتِيْ بُعِثَ فِيْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ».

'নিশ্চয় এটি সেই রাত যে-রাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাব হয়েছে।'[১]

হাদীসটি বানোয়াট। এই হাদীসটি কিছুটা অতিরিক্তিসহ আরও কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদের সকল বর্ণনাকারীই মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত।

এতে আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

«رَجَبُ شَهْرُ اللهِ، وَشَعْبَانُ شَهْرِيْ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِيْ، وَإِنَّ رَجَبَ شَهْرٌ مَخْصُوْصٌ بِالْمَغْفِرَةِ، وَحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَإِنَّ مَنْ صَامَهُ اسْتَوْجَبَ مَغْفِرَةَ جَمِيْعِ مَا سَلَفَ».

'রজব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস এবং রামাযান আমার উম্মতের মাস। নিশ্চয় রজব হলো মাগফিরাতের জন্য বিশিষ্ট একটি

---

[১] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবয়ীনুল আজাব*, পৃ. ৩২, হাদীস: ২৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত

মাস। এতে খুনোখুনি বন্ধ থাকে। যে-ব্যক্তি এ-মাসে সিয়াম পালন করে এতে তার বিগত জীবনের অপরিহার্যত মাফ হয়ে যায়।'[১]

এ ছাড়া আরও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এতে। হাদীসটি মিথ্যা, বানোয়াট এবং বির্তকিত।

অবশ্য শায়খ একই এ-ধরনের আরও অনেকগুলো সালাতের তথ্য সংকলন করেছেন, যা মোটেই সুন্নাহ-সমর্থিত নয়, বরং এসব সালাত অবাঞ্ছিত বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ লোক এসবকে সুন্নাত বলে ধারণা করে। এক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ থেকে যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত শুধু তাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য।

«لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».

'রাতসমূহে থেকে কোনো জুমুআর রাতকে ইবাদতের জন্য বিশিষ্ট করো না এবং দিনসমূহে কোনো জুমার দিনকে সিয়াম পালনের জন্য বিশিষ্ট করো না। তবে তোমাদের যেকেউ ওই দিন সিয়াম পালন করতে পারবে।'[২]

অর্থাৎ এই বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা গেল, এসব অবাঞ্ছিত বিদআতের অন্তর্ভুক্ত যা সুন্না-সুস্যাবস্ত সিদ্ধান্তের পরিপন্থীও বটে। আল্লাহ তাআলাইই ভালো জানেন।

অধম বান্দা—আল্লাহ তার জীবনকে শুধরে দিন এবং যা তার জন্য কল্যাণকর তার ওপর অটল রাখুন—বলেন, এই যে, মুহাদ্দিসগণ তাঁদের নিজস্ব নিয়মে সনদের সমালোচনা এবং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যা বলেছেন এতে আশ্চর্যের বিষয় হলো এ-জাতীয় বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা কিছুটা অতিরঞ্জিত আচরণ করেছেন। অথচ তাঁদের এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিলো যে, এটা আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক নয়।

সর্বাধিক বিস্ময় হচ্ছে শায়খ মুহ্উদ্দীন আন-নাওয়াওয়ী রহ. সম্পর্কে। তিনি ফিকহি মাসায়িলের ক্ষেত্রে ইনসাফের পথ অবলম্বন করেছেন, হানাফিদের সাথে তাঁর কোনো বৈরি মনোভাব ছিলো না। যেমন অনেক শাফিয়ীদের অভ্যাস এ-রকমই। অতএব এক্ষেত্রে আমরা তাঁর মতো একজন

---

[১] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবঈন*, পৃ. ৩৪–৩৫, হাদীস: ২৮, হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮০১, হাদীস: ১৫৮ (১১৪৪)

মর্যাদাবান ব্যক্তি থেকে অভিযোগ্য নই যিনি বড় বড় মাশায়িখে ইযাম ও ওলামায়ে কিরামের—আল্লাহ তাঁদের রহম করুন এবং অন্তরাত্মা পবিত্র রাখুন—সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখতেন।

জামিউল উসূল গ্রন্থকার তাঁর কিতাবে রযিনের গ্রন্থ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যদিও সিহাহ সিত্তা নামে প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের হাদীসসমূহ সংকলন করাই ছিলো ওই কিতাবের শিরোনাম। যখন এসব কিতাবে তিনি এ-বিষয়ে কোনো হাদীস না পান, তখন অন্য কিতাব থেকে এ-হাদীসটি সংগ্রহ করেন অধ্যায়টি পুরো ও পরিপূর্ণ করেন।

وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ صَلَاةَ الرَّغَائِبِ وَهِيَ:
أَوَّلُ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، فَصَلَّى فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
رَكْعَةً بِسِتِّ تَسْلِيْمَاتٍ، كُلُّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً، وَالْقَدْرِ ثَلَاثًا،
وَ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝﴾ [الاخلاص] ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ
قَالَ: «اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ»، بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ
سَبْعِيْنَ مَرَّةً، ثُمَّ يَسْجُدُ سِجْدَةً، وَيَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: «سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ
رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ» سَبْعِيْنَ مَرَّةً، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَقُوْلُ: «رَبِّ
اغْفِرْ، وَارْحَمْ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْظَمُ» وَفِيْ أُخْرَىٰ:
«اَلْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ» سَبْعِيْنَ مَرَّةً، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَيَقُوْلُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي السَّجْدَةِ
الْأُوْلَىٰ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ -وَهُوَ سَاجِدٌ- حَاجَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَرُدُّ سَائِلَهُ.

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক ؓ) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতুর রাগায়িবের আলোচনা করেছেন। আর তা হলো রজবের প্রথম জুমুআর রাত। নবী করীম ﷺ ওই রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ছয় সালামের সাথে বার রাকাআত সালাত পড়েন। প্রত্যেক রাকাআতে সূরা আল-ফাতিহা একবার, সূরা আল-কদর তিনবার এবং সূরা আল-ইখলাস বার বার পড়েন। যখন তিনি সালাত শেষ করেন তখন বললেন,

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ»

সালাম ফেরানোর পর সত্তর বার পড়লেন। অতঃপর তিনি একবার সাজদা করলেন আর সাজদায় তিনি পড়লেন,

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

সত্তরবার। অতঃপর মাথা উঠিয়ে পড়লেন,

«رَبِّ اغْفِرْ، وَارْحَمْ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْظَمُ»

অন্য এক বর্ণনা মতে,

«الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ»

সত্তরবার পড়েন। অতঃপর সাজদায় গিয়ে প্রথম সাজদার অনুরূপ বললেন এবং সাজদা অবস্থায় মনের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। কারণ আল্লাহ্ প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দেন না।'[১]

জামিউল উসূল বলেছেন, এই হাদীসটি আমি রযিনের কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছি, সিহাহ সিত্তার কোথাও এর খোঁজ পাইনি আমি। আর হাদীসটির বর্ণনাকারীরা বিতর্কিত।

বাহজাতুল আসরার গ্রন্থে রাগায়িব রজনীর আলোচনা সাইয়িদুনা, শায়খুনা, কুতুবে রাব্বানী, গাওসে সামদানী শায়খ মুহ্উদ্দীন আবদুল কাদির আল-হাসানী আল-জিলানী রহ.-এর বর্ণনায় আছে, 'তিনি বলেছেন, কিছু মাশায়িখ সমবেত হন, সেটি রাগায়িব রজনী ছিলো। ঘটনার পূর্ণ বিবরণী: তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি দু'জন মহান বুযুর্গ ব্যক্তি শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব ও শায়খ আবদুর রায্যাক থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা উভয়েই বলেছেন, শায়খ বকা ইবনে বতু ৫৪৩ হিজরীর ৫ রজব জুমুআর দিন সকালবেলা আমাদের পিতা মহোদয় শায়খ মুহ্উদ্দীন আবদুল কাদিরের মাদরাসায় আসেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ এতো ভোরে আমি এসেছি তোমরা তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে না কেন? গতরাত আমি এক নূর দেখেছি যা পৃথিবীকে আলোকিত করে দিয়েছে এবং তা পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত হয়েছে আর এর গূঢ়রহস্যও আমি দেখেছি। এর মধ্যে কিছু ছিলো প্রত্যক্ষ আর কিছু ছিলো যা প্রত্যক্ষ হতে কোনো অন্তরায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যক্ষ রহস্যগুলোর নূর বহুগুণে উজ্জ্বল ছিলো। অতঃপর আমি সে-নূরের উৎস সন্ধান করে জানতে পেরেছি, সেই নূর শায়খ আবদুল কাদির থেকেই

[১] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬. পৃ. ১৫৪, হাদীস: ৪২৬৮

বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তারপর আমি যখন এর হাকিকত সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করি তখন জানতে পারলাম, সেটি ছিলো তাঁর আত্মোপস্থিতির নুর যা তাঁর আত্মার নুরের মুখোমুখী ছিলো। আর এ-উভয় নুর পরস্পরকে বিচূর্ণ করছিলো এবং উভয় নুরের জ্যোতি তার জীবন আয়নায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছিলো। পরস্পরকে বিচূর্ণকারী জ্যোতি মিলনস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বৈশিষ্ট নিয়ে প্রত্যক্ষ হচ্ছিলো। অতঃপর সেখান থেকে পুরো সৃষ্টিজগত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিলো। এ-রাতে আসমান থেকে অবতরণকারী ফেরেশতাগণ তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করলেন আর তাঁদের নিকট এ-ঘটনাকে বলা হয় শাহিদ (প্রত্যক্ষকারী) ও মশহুদ (প্রত্যক্ষ)। তাঁরা (শায়খ আবদুল ওহহাব ও শায়খ আবদুর রয্যাক) বললেন, তো আমরাও তাঁর নিকট গেলাম। আমরা তাঁকে (শায়খ বকা ইবনে বাতু) জিজ্ঞাসা করলাম, গতরাতে আপনি কি রাগায়িব সালাত পড়েছিলেন? তখন তিনি এই কবিতাগুলো পাঠ করেছেন,

إِذَا نَظَــرَتْ عَيْنِــيْ وَجُــوْهِ حَبَائِــبِ
فَتِلْــكَ صَــلَاتِيْ فِيْ لَيَــالِي الرَّغَائِــبِ
وُجُوْهٌ إِذَا مَا اسْتَبْصَرَتْ عَنْ جَمَالِـهَا
أَضَاءَتْ بِهَا الْأَكْوَانَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ
وَمَنْ لَـمْ يُوْفِ الْـحُبَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ
فَذَلِكَ الَّـذِيْ لَـمْ يَأْتِ قَـطُّ بِوَاجِـبِ

'যখন নিজ চোখে প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ করেছি, রাগায়িবের রাতে আমার এ-সালাত সাঙ্গ করি। চেহারা থেকে যখন সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন সেই নুর পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে আলোকবিভাসিত করেছে। আর যে-ব্যক্তি ভালোবাসার দাবি পুরোপুরি আদায় করেনি সে কখনো ওয়াজিবই আদায় করেনি।'[১]

তানযীহুশ শরীয়া গ্রন্থে আলোচিত বানোয়াট হাদীসসমূহ:

॥ হাদীস ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে মারফু-সূত্রে এসেছে,

[১] আশ-শাত্তানুফী, *বাহজা* (পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১১৫-১১৬

«رَجَبُ شَهْرُ اللهِ، وَشَعْبَانُ شَهْرِيْ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِيْ». قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا مَعْنَىٰ قَوْلِكَ: «رَجَبُ شَهْرُ اللهِ»؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ مَخْصُوْصٌ بِالْمَغْفِرَةِ».

"'রজব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস এবং রামাযান আমার উম্মতের মাস।' সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'রজব আল্লাহর মাস'—আপনার একথার অর্থ কী? তিনি ইরশাদ করেন, 'কারণ রজব হলো মাগফিরাতের জন্য বিশিষ্ট।'"[১]

আল-হাদীস। এতে আরও এসেছে,

«لَا تَغْفِلُوْا عَنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ مِنْ رَجَبٍ، فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيْهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبَ».

'রজবের প্রথম জুমুআ রজনীর ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না। কেননা ফেরেশতাগণ এই রাতকে রাগায়িব নামকরণ করেছেন।'[২]

এতে আরও এসেছে,

«مَا مِنْ أَحَدٍ يَصُوْمُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِيْ رَجَبٍ، ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ يَعْنِيْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

'যে-ব্যক্তি রজব মাসে বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করে এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ জুমুআর রাত বার রাকাআত সালাত আদায় করবে।'[৩]

অতঃপর এ-ধরনের সালাতের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় হাদীসের ভাষ্য রয়েছে। এরপর তিনি বলেন, এর সূত্রে আলী ইবনে আবদুল্লাহ একজন রয়েছেন। তার ব্যাপারে ইমাম ইবনুল জাওযী رحمه الله বলেছেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে একজন বিতর্কিত এবং মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেছেন। আমি আমার শায়খ (হাফিয আবদুল ওহ্হাব رحمه الله) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ সবাই অজ্ঞাত-পরিচিতি। আমি তো এসব বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারে সমগ্র গ্রন্থসমূহে অনুসন্ধান করেছি, তাদের কোনো অস্তিত্ব সেখানে নেই।[৪]

---

[১] ইবনে আরাক, *তানযীহ*, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস: ৫০
[২] ইবনে আরাক, *তানযীহ*, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস: ৫০
[৩] ইবনে আরাক, *তানযীহ*, খ. ২, পৃ. ৯১, হাদীস: ৫০
[৪] ইবনুল জাওযী, *আল-মাওযূআত*, খ. ২, পৃ. ১২৫

তিনি একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, বরং এসব বর্ণনাকারী সে-সময় হয়তো জন্মই নেননি।[1]

হাফিয আল-ইরাকী রহ. তাঁর আমালী গ্রন্থে বলেছেন, হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে নাসির আস-সালামী রহ. অনুমান নির্ভর বর্ণনা করেন। ইমাম ইবনে হুসাইন রহ.-এর আমালী গ্রন্থের চতুর্দশ মজলিসে এটি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, এ-হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের।[2]

॥ হাদীস ॥ হযরত আনাস (ইবনে মালিক রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

«مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِّنْ رَجَبَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا عِشْرِيْنَ رَكْعَةً».

'যে-ব্যক্তি রজবের প্রথম রাত মাগরিবের সালাত আদায় করে তারপর বিশ রাকাআত সালাত আদায় করে।'

আল-হাদীস। এর শেষ দিকে এসেছে,

«وَجَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ».

'তাকে বিনা হিসাবে ও শাস্তি ছাড়াই বিদ্যুৎবেগে তাকে পুলসিরাত অতিক্রম করাবে।'[3]

ইমাম আল-যাওযিকানী রহ. এটি বর্ণনা করেছেন। এতে অজ্ঞাত-অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন।[4]

॥ হাদীস ॥

«مَنْ صَامَ يَوْمًا مِّنْ رَجَبَ، وَصَلَّى فِيْهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص] لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ».

'যে-ব্যক্তি রজব মাসে একদিন সিয়াম পালন করবে এবং চার রাকাআত সালাত আদায় করবে যার প্রথম রাকাআতে একশবার

---

[1] আদ-দাহাবী, *তালখীসু কিতাবিল মাওযূআত লি-ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৮৫; এ-বক্তব্য ইমাম আয-যাহাবী রহ.-এর

[2] ইবনে আররাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৯০

[3] ইবনে আররাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস: ৪৭

[4] আল-যাওযিকানী, *আল-মাওযূআত*, সূত্র: ইবনে আররাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৯

আয়াতুল কুরসী, দ্বিতীয় রাকাআতে একশবার সূরা আল-ইখলাস পড়বে, জান্নাতে তার আবাস না দেখে সে মারা যাবে না।'[১]

ইমাম ইবনুল জওযী রহ. বলেন, এতে অনেক অজ্ঞাত-পরিচিত ও অবাঞ্ছিত বর্ণনাকারী রয়েছেন।[২]

॥ হাদীস ॥

«مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا، حَطَّ اللهُ عَنْهُ ذُنُوْبَهُ سِتِّيْنَ سَنَةً. وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ بُعِثَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ ﷺ».

'যে-ব্যক্তি সাতাশে রজব রাতে বার রাকাআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাআতে সূরা আল-ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে, যখন সালাত শেষ করবে তখন বসে বসে সাতবার সূরা আল-ফাতিহা পড়বে, চারবার

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

পড়বে। অতঃপর সকলে সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার ষাট বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর এটি সেই মহিমান্বিত রাত যে রাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাব হয়েছে।'[৩]

হাফিয ইবনে হাজর (আল-আসকালানী রহ.) এই হাদীসটির ক্ষেত্রে ইমাম ইবনুল জওযী রহ. রচিত *আল-মওযূ'আত* গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন।[৪]

---

[১] ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৯-৯০, হাদীস: ৪৮
[২] ইবনুল জওযী, *আল-মওযূ'আত*, খ. ২, পৃ. ১২৪
[৩] ইবনে আরাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস: ৪৯
[৪] ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবয়ীনুল আজাব*, পৃ. ৩২

অবশ্য হাদীসটি সেখানে পাওয়া যায়নি। হয়তো কোনো সংস্করণে আছে, অন্য সংস্করণে নেই।[১]

হাফিয ইবনে হাজর (আল-আসকালানী রহ.) বলেন, আমি হযরত আনাস (ইবনে মালিক রা.) থেকে মরফূসূত্রে একটি হাদীস পেয়েছি,

«فِيْ رَجَبَ لَيْلَةً يُكْتَبُ لِلْعَامِلِ فِيْهَا حَسَنَاتُ مِائَةِ سَنَةٍ، وَذَلِكَ لِثَلَاثٍ بَقِيْنَ مِنْ رَجَبَ، فَمَنْ صَلَّى فِيْهَا اثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَسُوْرَةً مِّنَ الْقُرْآنِ يَتَشَهَّدُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُسَلِّمُ فِيْ آخِرِهِنَّ، ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَسْتَغْفِرُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَدْعُوْ بِمَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ، وَيُصْبِحُ صَائِمًا، فَإِنَّ اللهَ يَسْتَجِيْبُ دُعَائَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ فِيْ مَعْصِيَةٍ».

'রজব মাসে একটি রাত রয়েছে যে-রাতে ইবাদতকারীর জন্য একশ বছরের সাওয়াব লেখা হয়। রাতটি হলো সাতাশে রজব। যে-ব্যক্তি ওই রাতে বার রাকাআত সালাত পড়বে যার প্রতি রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহা ও কুরআন থেকে অন্য একটি সুরা পড়বে এবং প্রত্যেক দু'রাকআত শেষে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফেরাবে আর

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

পড়বে একশবার, তারপর একশবার ইসতিগফার করবে, নবী করীম ﷺ-এর ওপর একশবার সালাত পেশ করবে এবং নিজের পার্থিব জরুরত পূরণের জন্য প্রার্থনা করবে আর দিনে সিয়াম পালন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তার সকল প্রার্থনা কবুল করবেন, বালা-মসিবতের প্রার্থনা করলে তা কবুল হবে না।'[২]

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী রহ. বর্ণনা করেছেন।[৩] এতে দুজন বিতর্কিত বর্ণকারী রয়েছেন।

---

[১] ইবনে আররাক, *তানযীহ*, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস: ৪৯

[২] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাবয়ীনুল আজাব*, পৃ. ৪৩–৪৪, হাদীস: ২৫; (খ) ইবনে আররাক, *তানযীহ*, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস: ৪৯

[৩] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৪৬, হাদীস: ৩৫৩১

জেনে রাখুন! আরবদেশসমূহে জনসাধারণের প্রসিদ্ধ আছে যে, নবী করীম ﷺ-এর মিরাজ সংঘটিত হয়েছিলো সাতাশে রজব। আরব-জাহানে হজ-মৌসমের কাছাকাছি রজব-উৎসব প্রচলিত হয়েছিলো। সে-সময় মরুভূমি, দূর গ্রাম ও গহীন উপত্যকা থেকে লোকেরা দলে দলে নবী করীম ﷺ-এর যিয়ারতের জন্য আগমন করতো।

কেউ কেউ বলছেন, এ-ধারণা সঠিক নয়। বস্তুত নবী করীম ﷺ-এর ভূমিষ্ট হওয়ার দ্বাদশ বছর সতেরই রামাযান বা সতেরই রবিউল আউওয়াল মিরাজ সংঘটিত হয়েছে।

জেনে রাখুন! পনেরই রজবকে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন, সিয়াম পালন, সালাত আদায়, দুআ কবুল দিবস এবং দিনের সিয়াম পালনকে হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম-এর সাথে নামকরণ করা ইত্যাদি যা জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত রয়েছে—এসবের বৈধতার পক্ষে এবং নাকচ হবার বিষয়ে হাদীসের কিতাবসমূহে আমি কিছুই পাইনি। বাকি আল্লাহই ভালো জানেন।

সর্বসম্মত মতানুযায়ী প্রাক-ইসলামি যুগে যেসব বিধান রহিত হয় সেসবের মধ্য থেকে الْعَتِيْرَةُও অন্যতম। الْعَتِيْرَةُ বিন্দুবিহীন ع-এ ফাতাহ, ঊর্ধ্ববিন্দু বিশিষ্ট ت-এ কাসারা الْكَرِيْمَةُ-এর অনুরূপ। الْعَتِيْرَةُ হলো রজব মাসে উৎসর্গিত ছাগল, প্রাক-ইসলামি যুগে প্রচলিত ছিলো, পরে রহিত হয়ে যায়।[২]

তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম ইবনে সিরীন রহ. রজব মাসে الْعَتِيْرَةُ-এর কুরবানি করতেন।[৩]

এ থেকে বোঝা গেলো, এর আবশ্যকতা রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম আল-বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ». قَالَ الرَّاوِيُّ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ، وَالْعَتِيْرَةُ فِيْ رَجَبٍ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন, الْفَرَعُ ও الْعَتِيْرَةُ-এর কোনো

---

[১] মুহাম্মদ ইবনুল ফযল ইবনে আতিয়া ও আবান ইবনে আবু আইয়াশ
[২] আল-মুতাররিযী, *আল-মুগরিব*, পৃ. ১৬
[৩] আত-তীবী, *শারহ*, খ. ৪, পৃ. ১৩০৯

ভিত্তি নেই।' বর্ণনাকারী বলেন, 'اَلْفَرَعُ হলো উটের প্রথম বাচ্চা যা মুশরিকগণ তাদের দেবতার নামে যবেহ করতো আর اَلْعَتِيْرَةُ রজব মাসে উৎসর্গিত প্রাণী।'[১]

ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম আন-নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)-এর হাদীসে এসেছে,

أَتَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيْرَةٌ، هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ؟ هِيَ الَّتِيْ تُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ».

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আরফা আগমন করলেন, অতঃপর তাঁকে ইরশাদ করতে শুনলাম, 'হে লোকসকল! তোমরা প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের ওপর প্রতি বছর أُضْحِيَةٌ ও عَتِيْرَةٌ আবশ্যক। তোমরা কি জানো, عَتِيْرَةٌ কী? এটি যাকে তোমরা রজবের উৎসর্গ বলো।'[২]

ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) বলেছেন, হাদীসটি দুর্লভ ও দুর্বল সনদের।[৩]

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, اَلْعَتِيْرَةُ রহিত হয়ে গেছে।[৪]

اَلْعَتِيْرَةُ অর্থ اَلذَّبِيْحَةُ (উৎসর্গিত)ও এসেছে, যাকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হতো। এখানে প্রথম অর্থটি প্রযোজ্য।[৫]

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ৮৫, হাদীস: ৫৪৭৩ ও ৫৪৭৪; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৫৬৪, হাদীস: ৩৮ (১৯৭৬)

[২] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৯৯, হাদীস: ১৫১৮; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৯৩, হাদীস: ২৭৮৮; (গ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১০৪৫, হাদীস: ৩১২৫, হযরত মিখনাফ ইবনে সালিম (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[৩] আত-তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৯৯

[৪] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৯৩

[৫] মোল্লা আলী আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, খ. ৪, পৃ. ১০৭৯

মাহে শাবান

আল-কামূস অভিধানে আছে, شَعْبَانُ একটি বহুলপরিচিত ও প্রসিদ্ধ মাস। বহুবচন شَعْبَانَاتٌ ও شَعَابِينُ। শব্দটি تَشَعَّبَ অর্থ تَفَرَّقَ (বিচ্ছিন্নতা) থেকে নির্গত। যেমন– انْشَعَبَ।[1]

হাদীসে এসেছে,

«إِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ، لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِلصَّائِمِ فِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ».

'শাবান নামকরণ হয়েছে, কারণ এ-মাসে সিয়াম পালনকারীদের জন্য ভালো কাজ শাখা-প্রশাখায় বৃদ্ধি পায়, এতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।'

হাদীসটি ইমাম আর-রাফিয়ী (রহ.) তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে হযরত আনাস (ইবনে মালিক (রা.)) থেকে বর্ণনা করেছেন।[2]

এ-পুস্তকে তিনটি প্রবন্ধে আলোচনা বিন্যাস্ত হবে।

প্রথম প্রবন্ধ : শাবান মাস এবং পঞ্চদশ রাতকে বিশিষ্ট না করে সাধারণভাবে এ-মাসে সিয়াম পালনের ফযীলতের আলোচনা

বিশিষ্ট ছয় কিতাবের হাদীসসমূহ:

«شَعْبَانُ بَيْنَ رَجَبٍ وَشَهْرِ رَمَضَانَ، يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، يُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُرْفَعَ عَمَلِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ».

'রজব ও রামাযান মাসের মধ্যবর্তী মাস হলো শাবান। এ-মাসের ব্যাপারে মানুষ উদাসীন থাকে। অথচ এ-মাসে বান্দাদের আমলের

---

[1] আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, পৃ. ১০২

[2] আর-রাফিয়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৫৩; হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত

অধিক সাওয়াব দেওয়া হয়। সেজন্য আমি পছন্দ করি, আমি সিয়াম পালনকারী—এ-অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক।'

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.) *শুআবুল ঈমান* গ্রন্থে হযরত উসামা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন।[1]

«شَعْبَانُ شَهْرِيْ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللهِ».

'শাবান আমার মাস আর রামাযান আল্লাহর মাস।'

হাদীসটি ইমাম আদ-দায়লামী (রহ.) *ফিরদাউসুল আখবার* গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ، قَالَ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক (রাযি.)) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিলো, যখন রজব আগমন করতো তখন তিনি বলতেন,

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ»

'হে আল্লাহ! রজব ও শাবানে আমাদের জন্য বরকত অবতীর্ণ করুন এবং রামাযান পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিন।'

হাদীসটি ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.)[2] ও ইমাম ইবনুন নাজ্জার (রহ.)[3] বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ.

---

[1] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৫২, হাদীস: ৩৫৪০

[2] (ক) ইবনে আসাকির, *মুজামুশ শুয়ুখ*, খ. ১, পৃ. ২৬৪, হাদীস: ৩০; (খ) ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৪০, পৃ. ৫৭, হাদীস: ৪৬৫৭

[3] ইবনুন নাজ্জার, *যাইলু তারিখি বাগদাদ*, খ. ১৬, পৃ. ৮৫, হাদীস: ৭৩

'হযরত আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিয়াম পালন করতেন, আমাদের মনে হতো, তিনি বুঝি আর কখনো ইফতার করবেন না। আর যখন সিয়াম পালন থেকে অবসর নিতেন তখন মনে হতো, তিনি হয়তো আর কখনো সিয়াম পালন করবেন না। আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রামাযান ছাড়া পুরো মাসব্যাপী সিয়াম পালন করতে কখনো দেখিনি। তবে শাবানের তুলনায় অন্য কোনো মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেও দেখেনি।'[১]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيْلًا.

'আবু সালমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা ﵂-কে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেছেন, তিনি অল্প ক'দিন ছাড়া পূর্ণ শাবান সিয়াম পালন করতেন।'[২]

প্রথম হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﵀, ইমাম মুসলিম ﵀, (ইমাম মালিক ইবনে আনাস ﵀ তাঁর) আল-মুওয়াত্তায় ও ইমাম আবু দাউদ ﵀ বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম ﵀ ও ইমাম আন-নাসায়ী ﵀।

ইমাম আত-তিরমিযী ﵀-এর বর্ণনায় এসেছে,

قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُوْمُهُ إِلَّا قَلِيْلًا، بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ.

'তিনি বলেছেন, শাবানের তুলনায় অন্য কোনো মাসে নবী করীম ﷺ-কে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতে আমি দেখিনি। তিনি অল্প ক'দিন ছাড়া পুরো শাবান সিয়াম পালন করতেন।'[৩]

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৩৮, হাদীস: ১৯৬৯; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮০১, হাদীস: ১৭৫ (১১৫৬); (খ) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ৩, পৃ. ৪৪৪, হাদীস: ৩২২; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ২৪৩৪

[২] (ক) মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮০১, হাদীস: ১৭৫ (১১৫৬); (খ) আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২৪১, হাদীস: ৪১৩, খ. ১, পৃ. ২৫৬, হাদীস: ৪৫৪, খ. ৩, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ২৬৭৬; (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২০০, হাদীস: ২০৫৫

[৩] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৫, হাদীস: ৭৩৭

ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর অপর বর্ণনায় এসেছে,

قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُوْرِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُوْمَهُ شَعْبَانَ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

'তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অন্যান্য মাসের তুলনায় শাবান মাসে সিয়াম পালন অধিক পছন্দনীয় ছিল। তিনি রামাযান পর্যন্ত সিয়াম পালন করতেন।'[১]

হাদীসটি ইমাম আন-নাসায়ী (রহ.)ও বর্ণনা করেছেন।[২] ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.)[৩]ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আন-নাসায়ী (রহ.)-এর বর্ণনায়ও এসেছে,

قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ، وَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ.

'তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিয়াম পালন করতেন, আমাদের মনে হতো, তিনি বুঝি আর কখনো ইফতার করবেন না। আর যখন সিয়াম পালন থেকে অবসর নিতেন তখন মনে হতো, তিনি হয়তো আর কখনো সিয়াম পালন করবেন না। তিনি শাবানে বা পুরো শাবান সিয়াম পালন করতেন।'[৪]

ইমাম আন-নাসায়ী (রহ.)-এর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيْلًا.

'তিনি অল্প ক'দিন ছাড়া পূর্ণ শাবান সিয়াম পালন করতেন।'[৫]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.

'তিনি পুরো শাবান সিয়াম পালন করতেন।'[৬]

---

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ২৪৩১
[২] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ২৩৫০
[৩] আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদীস: ২৩৩৬
[৪] আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৫০, হাদীস: ২১৭৭
[৫] আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২০০, হাদীস: ২৩৫৫
[৬] আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১০৫, হাদীস: ২১৭৯

ইমাম আল-বুখারী ও ইমাম মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে,

قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُوْلُ: «خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا».

'তিনি বলেছেন, শাবানের তুলনায় অন্য কোনো মাসে নবী করীম ﷺ বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন না। তিনি পুরো শাবান সিয়াম পালন করতেন। তিনি বলতেন, 'তোমাদের সাধ্যমতো আমল করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্লান্ত হন না বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়ো।''[১]

আল-হাদীস। হযরত আবু হুরায়রা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন,

كَانَ يَصُوْمُهُ إِلَّا قَلِيْلًا بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ.

'তিনি অল্প ক'দিন ছাড়া পুরো শাবান সিয়াম পালন করতেন।'[২]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

'হযরত উম্ম সালমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শাবান-রামাযান ছাড়া লাগাতার দুইমাস সিয়াম পালন করতে দেখিনি।'[৩]

ইমাম আবু দাউদ-এর নিকট বর্ণিত হয়েছে,

وَلَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

'তিনি সারা বছরে পুরো একমাস সিয়াম পালন করতেন না, তবে শাবানে তিনি রামাযান পর্যন্ত সিয়াম পালন করতেন।'[৪]

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৩৮—৩৯, হাদীস: ১৯৭০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮১১–৮১২, হাদীস: ১৭৭ (৭৮২)

[২] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ২৪৩৫

[৩] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৪, হাদীস: ৭৩৬

[৪] আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদীস: ২৩৩১

ইমাম আন-নাসায়ী ﷺও হাদীসদুটো বর্ণনা করেছেন।[১] তাঁর আরও একটি বর্ণনা রয়েছে,

مَا رَأَيْتُهُ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ.

'আমি তাঁকে শাবান থেকে রামাযান ছাড়া দু'মাস লাগাতার সিয়াম পালন করতে দেখিনি।'[২]

وَعَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ مِّنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ. قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ، يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ».

'হযরত উসামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনি শাবান মাসে যে-পরিমান সিয়াম পালন করেন অন্যান্য মাসে সে-পরিমান সিয়াম পালন করতে দেখি না! তিনি ইরশাদ করেন, 'এটি এমন একটি মাস যে-মাস সম্পর্কে লোকেরা সাধারণত উদাসীন থাকে, এই মাস রজব ও রামাযানের মধ্যবর্তী একটি মাস এবং এটি এমন একটি যে-মাসে আমলসমূহ বিশ্বপ্রতিপালকের কাছে পেশ হয়। কাজেই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল পেশ হওয়ার সময় আমি সিয়াম পালনরত থাকি।''[৩]

অন্যান্য কিতাবের হাদীসসমূহ: *আল-জামিউল কবীর* এবং শায়খ ইমাম আরিফ বিল্লাহ আবুল হাসান আল-বাকরী ﷺ-বর্ণিত হাদীসসমূহ:

«شَعْبَانُ بَيْنَ رَجَبٍ وَّشَهْرِ رَمَضَانَ، يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، يَرْفَعُ فِيْهِ أَعْمَالَ الْعِبَادِ، فَأُحِبُّ أَنْ لَّا يُرْفَعَ عَمَلِيْ إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ».

'রজব ও রামাযান মাসের মধ্যবর্তী মাস হলো শাবান। এ-মাসের ব্যাপারে মানুষ উদাসীন থাকে। অথচ এ-মাসে বান্দাদের আমলের

[১] (১) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২০০, হাদীস: ২৩৫২; (২) আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২০০, হাদীস: ২৩৫৩

[২] আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৫০, হাদীস: ২১৭৫

[৩] আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২০১, হাদীস: ২৩৫৭

অধিক সাওয়াব দেওয়া হয়। সেজন্য আমি পছন্দ করি, আমি সিয়াম পালনকারী—এ-অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক।'

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী রহ. *শুআবুল ঈমান* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[1]

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تُنْسَخُ فِيْهِ آجَالُ مَنْ يَمُوْتُ فِي السَّنَةِ.

'হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ শাবানের তুলনায় অন্যান্য মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন না। তার কারণ হচ্ছে এই বছর যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের পরিণতির কথা এই মাসে লেখা হয়।'[2]

وَعَنْ أُسَامَةَ، «شَعْبَانُ شَهْرِيْ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللهِ».

'শাবান আমার মাস আর রামাযান আল্লাহর মাস।'[3]

হাদীসটি ইমাম আদ-দায়লামী রহ. *মুসনদুল ফিরদাউস* গ্রন্থে করেছেন।

وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً ذَكَرَتْ لَهَا أَنَّهَا تَصُوْمُ رَجَبَ، فَقَالَتْ: «إِنْ كُنْتِ صَائِمَةً شَهْرًا لَا مَحَالَةَ، فَعَلَيْكِ بِشَعْبَانَ، فَإِنَّ فِيْهِ الْفَضْلَ».

'হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক মহিলা তাঁকে বললো, সে রজবের সিয়াম পালন করছে, তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি যেকোনো মাসেই সিয়াম পালন করতে পারো—এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে শাবানে অবশ্যই রেখো, কেননা এর অনেক ফযীলত রয়েছে।'[4]

হাদীসটি ইমাম ইবনে যানজাওয়াইহ রহ. বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ. لِأَنَّهُ تُنْسَخُ فِيْهِ أَرْوَاحُ الْأَحْيَاءِ فِي الْأَمْوَاتِ، حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ

---

[1] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৫২, হাদীস: ৩৫৪০

[2] ইবনে আবু শায়বা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, হাদীস: ৯৭৬৪

[3] আল-আজলূনী, *কাশফুল খিফা*, খ. ২, পৃ. ৯, হাদীস: ১৫৫১

[4] আস-সুয়ূতী, *জামউল জাওয়ামি'*, হাদীস: ৪৩০২৮

يَتَزَوَّجُ وَقَدْ وَقَعَ اسْمُهُ فِيمَنْ يَمُوتُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحُجُّ وَقَدْ وَقَعَ اسْمُهُ فِيمَنْ يَمُوتُ.

'তাঁর কাছ থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ শাবানের তুলনায় অন্যান্য মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন না। তার কারণ হচ্ছে, মৃত্যুপথযাত্রী জীবের রূহের তালিকা এ মাসেই প্রস্তুত করা হয় এমনকি কোনো কোনো লোক বিয়ে করছে অথচ তার নাম মৃতপথযাত্রীদের তালিকায় আর কোনো কোনো লোক হজ করবে অথচ তার নামও মৃতপথযাত্রীদের তালিকায়।'[১]

وَعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، فَسَأَلْتُهُ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَكْتُبُ فِيهِ كُلَّ نَفْسٍ مَيِّتَةٍ تِلْكَ السَّنَةِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

'তাঁর কাছ থেকে আরও বর্ণিত, নবী করীম ﷺ পুরো শাবান সিয়াম পালন করতেন। আমি এ-ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ এ-বছরের সকল মৃত্যু লোকদের এ-মাসেই তালিকাভুক্ত করেন। এজন্যে আমি পছন্দ করি, আমার জীবনের পরিসমাপ্তি হোক আমার সিয়াম পালনরত অবস্থায়।''[২]

'আমার জীবনের পরিসমাপ্তি লেখা হোক'—এ-বক্তব্যের উদ্দেশ্য:

এ-থেকে বোঝা গেলো নবী করীম ﷺ-এর জীবনের পরিসমাপ্তি লেখা হয়েছে তাঁর ইবাদত-অবস্থায়। আর মৃত্যু নির্ধারিত ব্যক্তি চায় তার শেষবিদায়টা ইবাদত-সহকারে অতিবাহিত হোক। আর সে-সময়ের ইবাদত হিসেবে সিয়াম পালনই উত্তম। এমনটিই বলেছেন শায়খ, ইমাম আবুল হাসান আল-বাকারী رحمه الله। হযরত আয়িশা رضي الله عنها-এর বর্ণনা থেকে এমনটি বোঝা যায়। তিনি বলেছেন,

كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصُومَ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّىٰ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَعْبَانَ لَمِنْ أَحَبُّ الشُّهُوْرِ إِلَيْكَ أَنْ تَصُوْمَهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، يَا عَائِشَةُ! إِنَّهُ لَيْسَ نَفْسٌ

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৫১, পৃ. ২৫০, হাদীস: ৮৮৩৮

[২] আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনাদ*, খ. ৮, পৃ. ৩১১, হাদীস: ৪৯১১

تَمُوتُ فِي سَنَةٍ إِلَّا كُتِبَ أَجَلُهَا فِي شَعْبَانَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُكْتَبَ أَجَلِي وَأَنَا فِي عِبَادَةِ رَبِّي وَعَمَلٍ صَالِحٍ».

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরো শাবান সিয়াম পালন করতেন এমনকি রামাযান চলে আসতো। তিনি শাবান ছাড়া পূর্ণ একমাস সিয়াম পালন করতেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সিয়াম পালনের জন্য শাবান আপনার কাছে এতো প্রিয় তার কারণ কী? তিনি ইরশাদ করেন, 'হে আয়িশা! এক বছরে যেসব প্রাণী মারা যাবে শেষপরিণতি শাবানে লিপিবদ্ধ হয়। অতএব আমি পছন্দ করি, আমার শেষ সময়টার লেখা হোক যখন আমি আমার প্রভুর ইবাদত ও ভালো কাজে মশগুল থাকি।'[১]

তাঁর কাছ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّهُ يُكْتَبُ فِيهِ -يَعْنِي شَعْبَانَ- لِمَلَكِ الْمَوْتِ مَنْ يَقْبِضُ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُنْسَخَ اسْمِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ».

'নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, 'হে আয়িশা! যাদের প্রাণ কবজা করা হবে এ-(শাবান) মাসে মালাকুল মওতের কাছে সে-তালিকা প্রস্তুত থাকে। আমি পছন্দ করি, আমার নাম এ-তালিকাভুক্ত করা হোক যখন আমি সিয়াম পালন করবো।''[২]

হযরত আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'মৃত্যুপথযাত্রীদের নামের তালিকা পনের শাবান রাতে তৈরি করা হয়।'[৩]

রাত সিয়াম পালনের সময় নয়। কাজেই অর্থ হবে রাতে তালিকা প্রস্তুত করার সময় আল্লাহ সিয়ামের বরকত বহাল রাখেন। আর এও হতে পারে যে, তালিকা তৈরি হয়েছে দিনের বেলায়, পুস্তকাকারে মালাক আল-মওতের কাছে হস্তান্তর করা হয় রাতে। যেমন- বিভিন্ন হাদীস থেকে এসেছে। ইবনে আবুদ দুনয়া ؓ করেছেন এমনটি,

---

[১] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারিখু বগদাদ*, খ. ৬, পৃ. ১২৫, হাদীস: ২৬০৮/১৬৬১

[২] আল-খতীবুল বগদাদী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৩, পৃ. ২০১, হাদীস: ৬০৭০/৩৫৩৮

[৩] আদ-দায়লামী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৮১৬৫। আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন,

• وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ تُنْسَخُ فِيهَا الْآجَالُ.

'আর পনেরই শাবানের রাতে জীবনের শেষ পরিণতি লেখা হয়'।

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ دَفَعَ إِلَىٰ مَلَكِ الْمَوْتِ صَحِيفَةً، فَيُقَالُ: اَقْبِضْ مَنْ فِيْ هَٰذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَغْرِسُ الْغِرَاسَ، وَيَنْكِحُ الْأَزْوَاجَ، وَيَبْنِي الْبُنْيَانَ، وَإِنَّ اسْمَهُ نُسِخَ فِيْ تِلْكَ الْمَوْتَىٰ.

'হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেন, পনেরই শাবান রাতে মালক আল-মওতকে একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, এ-তালিকায় যেসব লোকের নাম রয়েছে তাদের প্রাণ কবজ করো। বান্দারা বাগানে ঘুরছে ফিরছে, কেউ কেউ বিয়ে-শাদি করছে আর কেউ কেউ তো অট্টালিকা নির্মাণে ব্যস্ত। পক্ষান্তরে তাদের মৃত্যুদের তালিকায় চলে এসেছে।'[১]

আর ইমাম আদ-দায়লামী বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، «تُقْطَعُ الْآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَىٰ شَعْبَانَ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُوْلَدُ لَهُ، وَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَىٰ».

'হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, এক শাবান থেকে অন্য শাবান আগেই মানুষের পরিণতি ধার্য হয়। এমনকি মানুষ বিয়ে করে এবং সন্তাম জন্ম দেয়। অথচ তার নাম মৃত্যুব্য মানুষের তালিকায় চলে এসেছে।'[২]

হযরত ওসমান ইবনুল মুগীরা ইবনুল আখনাস-এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩]

দ্বিতীয় প্রবন্ধঃ পনেরই শাবনের রাতে বিশেষ ফযীলতের আলোচনা

عَنْ عِكْرِمَةَ، فِيْ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ ﴾ [الدخان] قَالَ: فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، يُبْرَمُ فِيْهِ أَمْرُ السَّنَةِ، وَتُنْسَخُ الْأَحْيَاءُ، وَيُكْتَبُ الْحَاجُّ، فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ أَحَدٌ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

---

[১] আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮

[২] আস-সুয়ূতী, *জামউল জাওয়ামি'*, হাদীস: ১০৯১৭, হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা থেকে ইমাম আদ-দায়লামী নয়, ইমাম ইবনে যানজাওয়াইহ বর্ণনা করেছেন

[৩] আদ-দায়লামী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৩, হাদীস: ২৪১০

'হযরত ইকরামা থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ সুবহানাহুর বাণী 'এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা দেওয়া হয়।'[১]-প্রসঙ্গে বলেন, পনেরই শাবানের রাতে বছরের যাবতীয় কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, জীবিতদের তালিকা তৈরি করা হয় এবং হজিদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। পরে এতে কোনো প্রকারের বাড়াবাড়ি হয় না এবং কোনো প্রকারের হেরফেরও করা হয় না।'

এটি ইমাম ইবনে জরীর আত-তাবারী[২], ইমাম ইবনুল মুনযির ও ইমাম ইবনে আবু হাতিম[৩] বর্ণনা করেছেন।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এসব লায়লাতুল কদরে হয়ে থাকে। তবে তার সূচনা হয় পনেরই শাবন রাত থেকে।

وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ، عَنْ أَبِيْهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا رَجُلٍ مُشْرِكٍ أَوْ فِيْ قَلْبِهِ شَحْنَاءُ».

'আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আস-সিদ্দীক থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা বা কাকা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি নবী করীম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা পনেরই শাবানের রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি সকলকে ক্ষমা করেন কিন্তু মুশরিক এবং অন্তরে হিংসুক লোকদের তিনি ক্ষমা করেন না।'

ইমাম আল-বায়হাকী এটি বর্ণনা করেছেন।[৪]

وَعَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا، وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আদ-দুখান*, ৪৪:৪
[২] ইবনে জরির আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান*, খ. ২১, পৃ. ৯-১০
[৩] ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১০, পৃ. ৩২৮৭, হাদীস: ১৮৫৩১
[৪] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ৩৫৪৬

الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ! أَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ!

أَلَا مِنْ مُبْتَلٍ فَأُعَافِيَهُ! أَلَا كَذَا! أَلَا كَذَا! حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

'হযরত আলী থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম থেকে বর্ণনা করেন, 'যখন পনেরই শাবানের রাত আসে, তাহলে সে-রাতে তোমরা ইবাদত উদ্‌যাপন করো এবং দিনে সিয়াম পালন করো। কেননা এ-রাত সূর্যাস্ত যাওয়ার পর আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন আর বলেন, 'কেউ কি আছে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দিতাম! কেউ কি আছে রিযকপ্রার্থী, আমি তাকে রিযক দান করতাম! কেউ আছে কি বিপদগ্রস্থ, আমি তাকে উদ্ধার করতাম! কেউ কি আছে! কেউ কি আছে! এভাবে ফজর উদয় হয়ে যায়।

এটি ইমাম ইবনে মাজাহ[১] ও ইমাম আল-বায়হাকী[২] বর্ণনা করেছেন।

অধম বান্দা বলেন, প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে আগমন করেন। তবে তা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে হয়ে থাকে। আর পনেরই শাবান রাতে হয় সূর্যাস্ত থেকে ফজর পর্যন্ত সময়ে, এ-ক্ষেত্রে শেষ তৃতীয়াংশের সময়টা নির্দিষ্ট নয় আর এটি এই রাতের বিশেষত্ব।

হাদীসের ভাষ্য মতে এ-রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিশাল পুরস্কার প্রস্তুত রাখেন, যে-ব্যাপারে তিনি আমাদের কোনো জ্ঞান দেননি। নবী করীম -এর বক্তব্য: 'কেউ কি আছে! কেউ কি আছে! এমনকি ফজর উদয় হয়'—এভাবে তিনি দানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে থাকেন।

عَنْ نَوْفَلٍ الْبِكَالِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَكْثَرَ الْخُرُوْجَ فِيْهَا يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: إِنَّ دَاوُدَ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فِيْ مِثْلِ هٰذِهِ السَّاعَةِ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ السَّاعَةَ مَا دَعَى اللهَ فِيْهَا أَحَدٌ إِلَّا أَجَابَهُ، وَلَا اسْتَغْفَرَهُ أَحَدٌ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا لَمْ

---

[১] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস: ১৩৮৮
[২] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৪, হাদীস: ৩৫৪২

يَكُنْ عُشَارًا، أَوْ سَاحِرًا، أَوْ كَاهِنًا، أَوْ عَرِيفًا، أَوْ شُرْطِيًّا، أَوْ جَابِيًا، أَوْصَاحِبَ كُوبَةٍ، أَوْ غَرْطَبَةٍ. قَالَ نَوْفَلٌ: اَلْكُوبَةُ الطَّبْلُ وَالْغَرْطَبَةُ الطُّنْبُوْرُ. اَللّٰهُمَّ رَبَّ دَاوُدَ! اِغْفِرْ لِمَنْ دَعَاكَ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، أَوْ اسْتَغْفَرَكَ فِيْهَا.

'হযরত নাওফাল আল-বাকালী ﵀ থেকে বর্ণিত, হযরত আলী ﵁ পনেরই শাবানের রাতে বের হন। তিনি বাইরে এলে অধিকাংশ সময় দুনিয়ার আসমানের দিকে থাকিয়ে বলতেন, একবার হযরত দাউদ ﵇ এ-রকম একটি সময়ে রাতে বের হয়েছিলেন। তারপর আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেছিলেন, এই সময় যদি কোনো ব্যক্তি দুআ করে আল্লাহ সেটি কবুল করেন। আর যে-ব্যক্তি এই রাতে মাগফিরাতের দুআ করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে তাকে দশমাংশের মধ্যসত্ত্বভোগী, জাদুকর, জ্যোতিষী, স্বৈরাচার, ভাগ্যগণক, মওজুদদার ও তবলা বা বাজনা বাদক না হতে হবে। নাওফাল বলেন, اَلْكُوبَةُ হলো الطَّبْلُ (ঢোল-তবলা) এবং الْغَرْطَبَةُ হলো الطُّنْبُوْرُ (গিটার সদৃশ তারের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, ড্রাম)। হে আল্লাহ! হে দাউদ ﵇-এর প্রভু! এই রাতে যে-ব্যক্তি দুআ করে কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে ক্ষমা করুন।'[১]

পনেরই শাবনের রাত ফযীলতের দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ হলেও অন্য রাতেও দুআ কবুল হয়।

॥ হাদীস ॥

«إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَيَطَّلِعُ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، أَوْ قَاطِعِ رَحِمٍ».

'আল্লাহ তাআলা পনেরই শাবন রাতের বেলা অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁর সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করে দেন। তবে মুশরিক, হিংসুক ও আত্মীয়তাছিন্নকারী ছাড়া।'

[১] ইবনে রজব আল-হাম্বলী, *লাতায়িফুল মাআরিফ*, পৃ. ১৩৭

হাদীসটি হযরত আবু মুসা (আল-আশআরী ﵁) থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ ﵀ বর্ণনা করেছেন।[১]

«مَا مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛ يَنْزِلُ اللهُ فِيهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ كُلِّهِمْ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ قَاطِعِ رَحِمٍ».

'লায়লাতুল কদরের পর পনেরই শাবানের রাত থেকে উত্তম কোনো রাত নেই; এ-রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং তাঁর সকল বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। তবে মুশরিক, হিংসুক, আত্মীয়তাছিন্নকারী না হতে হবে।'[২]

হাদীসটি হযরত আতা ইবনে ইয়াসার ﵀ থেকে ইমাম সাঈদ ইবনে মানসুর ﵀ বর্ণনা করেছেন।

«يَطْلُعُ اللهُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

'পনেরই শাবানের রাতে আল্লাহ অবতরণ করেন। তাঁর সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করে দেন। তবে মুশরিক ও হিংসুক লোককে তিনি ক্ষমা করেন না।'

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী ﵀ হযরত মুআয ইবনে জাবাল ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩]

«فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُوحِي اللهُ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ يَقْبِضُ كُلَّ نَفْسٍ يُرِيْدُ قَبْضَهَا فِيْ تِلْكَ السَّنَةِ».

'পনেরই শাবানের রাতে আল্লাহ মালাকুল মওতের প্রতি এ-বছরে যাদের প্রাণ কবজা করতে তিনি ইচ্ছুক তাদের প্রাণ সংহারের প্রত্যাদেশ জারি করেন।'

---

[১] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৪৫, হাদীস: ১৩৯০; তবে তাঁর বর্ণনায় أَوْ قَاطِعِ رَحِمٍ শব্দগুচ্ছ নেই।

[২] ইবনে রজব আল-হাম্বলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

[৩] (ক) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬০, হাদীস: ৩৫৫২ ও খ. ৯, পৃ. ২৪, হাদীস: ৬২০৪; (খ) আল-বায়হাকী, *ফাযায়িলুল আওকাত*, পৃ. ১২০, হাদীস: ২২

ইমাম আদ-দায়নাওরী রহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত *আল-মাজালিসা* গ্রন্থে হযরত রাশিদ ইবনে সা'দ রহিমাহুল্লাহ থেকে মুরসাল-সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।[১]

«يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِيْ أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَىٰ، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛ يُنْسَخُ فِيْهَا الْآجَالُ وَالْأَرْزَاقُ وَيُكْتَبُ فِيْهَا الْحَاجُّ، وَفِيْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ إِلَى الْأَذَانِ».

'আল্লাহ চারটি রাতে কল্যাণ দ্বার খুলে দেন: আল-আযহার রাত, আল-ফিতরের রাত, পনেরই শাবানের রাত; এ-রাতে মানব-জীবনের পরিণতি ও রিযক নির্ধারিত হয় এবং হজ্জব্রত পালনকারীদের তালিকা তৈরি করা হয় এবং আরাফার রাত—আযান (সকাল থেকে সন্ধ্যা) পর্যন্ত।'[২]

«أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلِلّٰهِ فِيْهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ».

'আমার নিকট হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে বলেছেন, এটি পনেরই শাবানের রাত; এতে আল্লাহ কলব গোত্রের ছাগলের লোমের সমপরিমাণ জাহান্নামীদের মুক্তি দেন।'

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।[৩]

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ»؟ قُلْتُ: وَمَا لِيْ ذَلِكَ، وَلَكِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ ﷻ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ».

---

[১] আদ-দায়নাওরী, *আল-মাজালিস ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, খ. ৩, পৃ. ৩১৫, হাদীস: ৯৪৪

[২] আদ-দায়লামী; *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৮১৬৫

[৩] (ক) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৩, হাদীস: ৩৫৫৬; (খ) আল-বায়হাকী, *আদ-দা'ওয়াতুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৫৩১

'হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাত নবী করীম ﷺ-কে আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই খুঁজতে আমি বের হই। অতঃপর আল-বকিতে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে অবস্থান করছিলেন তিনি। তিনি বললেন, 'হে আয়িশা! তোমার কি আশঙ্কা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার ওপর যুলম করবেন'? আমি বললাম, তেমন কিছু নয়, তবে আমার ধারণা ছিলো আপনি হয়তো আপনার অন্য স্ত্রীর কাছে অবস্থান করছিলেন! তিনি ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ ﷻ পনেরই শাবানের রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অতঃপর কলব গোত্রের ছাগলের লোমের সমপরিমাণ তো বটে তার চেয়ে অধিকসংখ্যক মানুষকে তিনি ক্ষমা করে দেন।'

হাদীসটি ইমাম ইবনে আবু শায়বা رحمه الله[১], ইমাম আত-তিরমিযী رحمه الله[২], ইমাম ইবনে মাজাহ رحمه الله[৩] ও ইমাম আল-বায়হাকী رحمه الله[৪] বর্ণনা করেছেন।

জামিউল উসূলে গ্রন্থকার বলেন, হযরত রাযীন رحمه الله এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন,

«مِمَّنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ».

'যারা জাহান্নামের উপযুক্ত (তাদেরও তিনি ক্ষমা করে দেন)।'[৫]

এ-হাদীসটি ছাড়া *জামিউল উসূলে* সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আর কোনো হাদীস নেই। অবশ্য বিভিন্ন সূত্রে এ-ধরনের আরও কিছু হাদীস এসেছে।

«إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِيْنَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّىٰ يَدَعُوْهُ».

'যখন পনেরই শাবানের রাত আসে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি মুমিন নর-নারীদের ক্ষমা করে দেন। কাফিরদের ক্ষেত্রে ধীরগতি অবলম্বন করেন।

---

[১] ইবনে আবু শায়বা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ১০৮, হাদীস: ২৯৮৫৮
[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১০৭, হাদীস: ৭৩৯
[৩] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস: ১৩৮৯
[৪] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫–৩৫৬, হাদীস: ৩৫৪৪ ও ৩৫৪৫
[৫] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৯, পৃ. ২৬৪, হাদীস: ৬৮৬৮

হিংসুকদেরকে তাদের হিংসাচর্চার কারণে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। যাতে সে-পথ থেকে ফিরে আসে।'

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী ﵀[১] ও ইমাম ইবনে কানি' ﵀[২] হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন।

«وَلَا يَنْظُرُ اللهُ فِيْهَا -يَعْنِيْ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- إِلَىٰ مُشْرِكٍ، وَّلَا إِلَىٰ مُشَاحِنٍ، وَّلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحِمٍ، وَّلَا إِلَىٰ مُسْبِلٍ، وَّلَا إِلَىٰ عَاقٍّ لِّوَالِدَيْهِ، وَّلَا إِلَىٰ مُدْمِنِ خَمْرٍ».

'আল্লাহ এ-রাতে (অর্থাৎ পনেরই শাবেনর রাতে) মুশরিক, হিংসুক, আত্মীয়তাছিন্নকারী, অহঙ্কারবশত মাটি পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে চলাফেরাকারী, মাতা-পিতার প্রতি বিদ্রোহী ও মদ্যপায়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।'[৩]

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী ﵀ *শুআবুল ঈমানে* হযরত আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

«إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَىٰ مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ إِلَّا لِزَانِيَةٍ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٍ».

'যখন পনেরই শাবানের রাত আসে তখন এক আহ্বনাকারী আহ্বান করেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থী কি আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিতাম! আছে কি কোনো প্রার্থনাকারী? আমি তাকে দান করতাম! তখন কেউ খালি হাতে ফেরেন না, সকলকে দান করা হয় কিন্তু ব্যভিচারিনী মহিলা ও মুশরিককে কিছুই দেওয়া হয় না।'

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী ﵀ হযরত আমর ইবনুল আস ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪] আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

---

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৯, হাদীস: ৩৫৫১
[২] ইবনে কানি', *মু'জামুস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৬০, হাদীস: ২৬৪
[৩] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৩, হাদীস: ৩৫৫৬
[৪] আল-বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৬২, হাদীস: ৩৫৫৫

عَنْ كَعْبٍ، إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَبْعَثُ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، لِيَأْمُرَهَا أَنْ تَزَيَّنَ وَيَقُوْلَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَعْتَقَ فِيْ لَيْلَتِكَ هٰذِهِ عَدَدَ نُجُوْمِ السَّمَاءِ، وَعَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَلَيَالِيْهَا، وَعَدَدَ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَزِنَةِ الْجِبَالِ، وَعَدَدَ الرِّمَالِ.

'হযরত কা'বুল আহবার ﷺ থেকে বর্ণিত, পনেরই শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা জিবরায়িলকে জান্নাতে পাঠান, যেন জান্নাতকে তিনি স্বেচ্ছাসজ্জিত হওয়ার নির্দেশনা দেন এবং এ-কথা বলে দেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আজকের এ-রাতে আকাশের তারকারাজি, পৃথিবীর দিবা-রাত্র, বৃক্ষের পাতাসমূহ-পর্বতের ওজন এবং বালিরাশির সমপরিমাণ বান্দাদের মুক্তি দেবেন।'[১]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَيُنْسَخُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ كُلُّ مَنْ يُقْبَضُ رُوْحُهُ فِيْ تِلْكَ السَّنَةِ إِلَىٰ مِثْلِهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ النِّسَاءَ وَيُوْلَدُ لَهُ، وَيَبْنِيْ، وَيَغْرِسُ، وَيَظْلِمُ، وَيَفْجِرُ، وَمَا لَهُ اسْمٌ فِي الْأَحْيَاءِ.

'হযরত আতা ইবনে ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, যখন পহেলা শাবানের রাত আসে এ-বছর আগামী বছরের মধ্যে যারা মারা যাবে তাদের সকলের তালিকা হস্তান্তর করা হয়। লোকেরা বিয়ে-শাদি করে, তাদের সন্তান হয়, ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে, চাষ-বাস করে, অত্যাচার করে, পাপাচারে লিপ্ত হয়। অথচ তাদের নাম আর জীবিতদের মধ্যে নেই।'[২]

শব্দার্থ

আল-কামূসে আছে যে, الشَّحْنَاءُ ও الشِّحْنَةُ কাসরা-সহকারে অর্থ اَلْعَدَاوَةُ (শত্রুতা)। شَاحَنَهُ = بَاغَضَهُ (সে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো)। হাদীসে

---

[১] ইবনুল জওযী, *আত-তাবসারা*, পৃ. ৬৩
[২] আস-সুয়ূতী, *জামউল জাওয়ামি'*, হাদীস: ৪৪৩১৩

ব্যবহৃত اَلْمُشَاحِنُ-এর অর্থ বিদআতি; যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবাধ্য।[১]

আন-নিহায়া গ্রন্থে আছে,

«يَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مَا خَلا مُشْرِكًا أَوْ مُشَاحِنًا» أَيْ مُعَادِيًا، وَالشَّحْنَاءُ: الْعَدَاوَةُ.

'আল্লাহ প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেবেন তবে মুশরিক ও শত্রুতা মনোভাব পোষণকারীদের ব্যতীত; অর্থাৎ বৈরিভাব পোষণকারীদের আর اَلشَّحْنَاءُ অর্থ اَلْعَدَاوَةُ (শত্রুতা)।'[২]

ইমাম আল-আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

أَرَادَ بِالْمُشَاحِنِ هَاهُنَا صَاحِبَ بِدْعَةٍ مُفَارِقٍ جَمَاعَةٍ.

'এখানে اَلْمُشَاحِنُ থেকে উদ্দেশ্য বিদআতপন্থি লোক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষত্যাগী।'[৩]

ইমাম আত-তীবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, اَلشَّحْنَاءُ অর্থ اَلْعَدَاوَةُ (শত্রুতা), اَلْغِلُّ (বিদ্বেষ) ও اَلْحِقْدُ (প্রতিশোধ-স্পৃহা)। সম্ভবত এখানে প্ররোচক প্রবৃত্তির ধোঁকায় যা মুসলিম সমাজে সংঘটিত হয় যেখানে দীনের কোনো সমর্থন নেই সেসব উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি তার অন্তরকে অন্যের প্রতি শত্রুতার মনোভাব গ্রহণে প্ররোচনা দেয়—এমনটা আর কি।[৪]

নাযিরু আয়নিল গারিবীয়্যীন গ্রন্থে আছে, شَحَنْتُ السَّفِينَةَ অর্থ مَلَأْتُهَا (নৌকো ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে)।

আল-কামূস গ্রন্থে আছে, عَشَرَ অর্থ أَخَذَ وَاحِدًا مِنْ عَشَرَةٍ (একদশমাংশ গ্রহণ করা)। আর عَشَرَهُمْ অর্থ أَخَذَ عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ (একদশমাংশ সম্পদ গ্রহণ করা)। اَلْعَشَّارُ অর্থ قَابِضُهُ (ওই একদশমাংশ সংগ্রহকারী)।[৫]

---

১ আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, পৃ. ১২০৮
২ ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ৪৪৯
৩ ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ২, পৃ. ৪৪৯
৪ আত-তীবী, *আল-কাশিফ*, খ. ৪, পৃ. ১২৩৮–১২৩৯
৫ আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, পৃ. ৪৪০

আর *আন-নিহায়া* গ্রন্থে আছে, عَشَرْتُ مَالَهُ অর্থ أَعْشُرُهُ عُشْرًا (এর একদশমাংশ সংগ্রহ করেছি)। وَعَشَّرْتُهُ তাঁর অর্থ فَأَنَا عَاشِرٌ (এর একদশমাংশ করেছি আমি)। إِذَا أَخَذْتُ عُشْرَهُ তাঁর অর্থ فَأَنَا مُعَشِّرٌ وَعَشَّارٌ (যখন এর একদশমাংশ সংগ্রহ করি)।[১]

আর হাদীসে এসেছে,

«إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ».

'যদি তুমি একদশমাংশ সংগ্রহকারীকে পাও তাহলে তাকে হত্যা করো।'[২]

অর্থাৎ জাহিলি যুগের নীতি অনুসারে নিজের ধর্মের প্রতি গোড়া কোনো লোক যদি তার কুফরিবশত বা বৈধ মনে করে একদশমাংশ (চল্লিশ ভাগের একভাগ নীতি-ভিত্তিক যাকাত-বিধানের বিপরীতে) সংগ্রহ করতে পাও তাহলে তাকে তোমরা হত্যা করো। যদিও সে মুসলিম হয় আর সে একচল্লিশাংশের আল্লাহ-প্রদত্ত ফরয বিধানকে পরিত্যাগ করে একদশমাংশ সংগ্রহকে বৈধ মনে করে। তবে যারা আল্লাহ-প্রদত্ত ফরয বিধান মতে সংগ্রহ করে তাদের কিভাবে হত্যা করা যেতে পারে; অথচ নবী করীম ﷺ-এর নামে এবং তাঁর পরবর্তিতে খলীফাদের নামে একদল একদশমাংশ সংগ্রহ করতো। যারা তার একদশমাংশ সংগ্রহ করতো তাদেরকে الْعُشْرُ-এর প্রতি সম্বন্ধ করে عَاشِرٌ বলা হতো। যেমন– বলা হয় رُبْعُ الْعُشْرِ ও نِصْفُ الْعُشْرِ। আর যারা ক্ষেতের জমিতে পানি প্রবাহ করে এবং যিম্মিদের বাণিজ্যিক দ্রব্যাদির ওপর যে-একদশমাংশ ট্যেক্স সংগ্রহ করে তাদেরকে কিভাবে হত্যা করা যেতে পারে![৩]

ইমাম আত-তীবী رحمه الله বলেছেন, «إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ» (জাদুকর ও এক দশমাংশ গ্রহণকারী ছাড়া)[৪] এটা তাদের ওপর কঠিন বঞ্চনা, নিশ্চয় এসব লোক আল্লাহর রহমত থেকেও বঞ্চিত।[৫]

---

[১] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৩৯

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ. ২৯, পৃ. ৫৯৭, হাদীস: ১৮০৫৭

[৩] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া*, খ. ৩, পৃ. ২৩৮–২৩৯

[৪] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ. ২৬, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৬২৮১, হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসুল ﷺ ইরশাদ করেন,

আর اَلْعَرِيْفُ অর্থ اَلْعَرَّافُ। এখানে উদ্দেশ্য اَلْمُنَجِّمُ (জ্যোতিষী) অথবা যে-লোক অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখে বলে দাবি করে।[২]

যেমন– হাদীস এসেছে,

مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا.

'যে-ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষী বা গণকের কাছে যায়।'[৩]

হাদীসটি *আন-নিহায়ায়* উদ্ধৃত হয়েছে।[৪]

ইমাম আত-তীবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, اَلْعَرَّافُ হলো একশ্রেণির জ্যোতিষী মন্ত্র, প্রক্রিয়া ও ভোজবাজির মাধ্যমে চুরি হয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া মাল ফিরে পাওয়ার প্রমাণ পেশ করে।[৫]

اَلْكَاهِنُ হলো যে-লোক ভবিষ্যতে কী হবে সে-সম্পর্কে সংবাদ দেয়।[৬]

اَلشُّرْطَةُ যাম্মা-সহকারে اَلشُّرَطُ-এর একবচন صُرَدٌ-এর অনুরূপ। هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَعْوَانِ الْوُلَاةِ (রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা)। এদের বলা হয় شُرَطِيٌّ (প্রতীকী) تُرْكِيٌّ ও جُهَنِيٌّ-এর অনুরূপ। তাদের এ-নামকরণ হয়েছে, তার কারণ হলো তারা নিজেদের মধ্যে পরিচিত হয় তাদের জন্য নির্ধারিত প্রতীকে।

আল-কামূসে এমনটি এসেছে।[৭]

كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ -ﷺ- مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ، يَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا، فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللهُ فِيهَا الدُّعَاءَ، إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ.

'আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম এর একটি সময় প্রিয় ছিলো, সে সময় তিনি তাঁর পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন আর বলতেন, হে দাউদের পরিবার! ওঠ, সালাত আদায় করো, এই সময়ে আল্লাহ প্রার্থনা কবুল করেন, জাদুকর ও এক-দশমাংশ গ্রহণকারীদের ছাড়া।'

[১] আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১২১০

[২] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২১৮

[৩] হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, খ. ১, পৃ. ৫৯, হাদীস: ১৫. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসুল ﷺ ইরশাদ করেন,

مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ -ﷺ-.

'যে লোক কোনো জ্যোতিষী বা গণকের কাছে যায়। অতঃপর সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ জীবন-বিধানের সাথে কুফরি করেছে।'

[৪] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২১৮

[৫] আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ২৯৮৭ ও ২৯৮৯

[৬] আত-তীবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ২৯৮৭

[৭] আল-ফীরযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, পৃ. ৬৭৩

আন-নিহায়ায় এসেছে, نُخْبَةُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ جُنْدِهِ সেনাবাহিনীর মধ্যে অন্যদের থেকে অগ্রবর্তী একটি ক্ষুদ্র দল।[১]

বলা হয়, এরা হলো اَلشُّرَطُ (পুলিশবাহিনী)। বিশেষণ হলো شُرَطِيٌّ (পুলিশ সদস্য, পুলিশের লোক, পুলিশ)।

আন-নিহায়ায় এমনটি এসেছে।[২]

আল-কারমানি বলেন, صَاحِبُ الشُّرَطِ এ-ش এ যাম্মা এবং ر-এ ফাতাহ-সহকারে اَلشُّرَطُ-এর বহুবচন। هُمْ أَوَّلُ الْجَيْشِ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيِ الْأَمِيرِ لِتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ (জাতীয় নেতৃত্বের অধীনে তার নির্দেশ বাস্তবায়নে প্রস্তুত যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাগ্রে অবতীর্ণ এমন সামরিক ইউনিট।)[৩]

এখানে اَلشُّرَطِيُّ দ্বারা স্বৈরশাসক ও দোসরদের বোঝানো হয়েছে।

اَلْجَابِيْ কাসরা-বিশিষ্ট اَلْجِبَايَةُ থেকে নির্গত। هُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَالِ مِنْ مَظَانِّهِ (অনুমানের ভিত্তিতে হৃত সম্পদ উদ্ধার করা)।[৪]

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ এমনটিই বলেছেন।

আর আল-কামূসে এসেছে, جَبَى الْخَرَاجَ (খাজনা আদায়), رَمَى ও سَعَى-এর অনুরূপ। جِبَايَةٌ ও جِبَاوَةٌ (কর সংগ্রহ, কর, খাজনা, শুল্ক)।[৫]

اَلْجَابِيْ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শুল্ককর্মকর্তা যারা অবৈধভাবে খাজনা সংগ্রহ করে।

اَلْكُوبَةُ যাম্মা-সহকারে, অর্থ হলো اَلنَّرْدُ (পাশা খেলা), اَلطَّبْلُ (ডাক, ঢোল, তবলা) ও اَلْبَرْبَطُ (বাদ্যযন্ত্র)।

আন-নিহায়া গ্রন্থে ইমাম আল-জাযারী রাহিমাহুল্লাহ এসব বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।[৬]

হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْكُوبَةَ».

'নিশ্চয় আল্লাহ মদ ও বাদ্য-বাজনা নিষিদ্ধ করেছেন।'[১]

---

[১] ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া, খ. ২, পৃ. ৪৬০
[২] ইবনুল আসীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬০
[৩] আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ১০, পৃ. ২৩৬
[৪] ইবনুল আসীর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৮
[৫] আল-ফীরযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, পৃ. ১২৬৮
[৬] ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া, খ. ৪, পৃ. ২০৭

হাদীসে আরও এসেছে,

«أُمِرْنَا بِكَسْرِ الْكُوْبَةِ».

'আমাদেরকে বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'[২]

জামিউল উসূলের টীকায় আছে, اَلْكُوْبَةُ হলো اَلطَّبْلُ الصَّغِيْرُ الْمُخْتَصَرُ ذُو الرَّأْسَيْنِ (দু'তারার ছোট তবলাবিশেষ)।[৩]

اَلْعَرْطَبَةُ অর্থ اَلْعُوْدُ (ঢোল) বা اَلطُّنْبُوْرُ (ড্রাম) বা اَلطَّبْلُ (তবলা) বা طَبْلُ الْحَبَشَةِ (খাটের তবলা)।

আল-কামূসে এমনটিই আছে।[৪]

আর *আন-নিহায়ায়* এক হাদীস এসেছে,

«يَغْفِرُ لِكُلِّ مُذْنِبٍ إِلَّا لِصَاحِبِ عَرْطَبَةٍ، وَكُوْبَةٍ».

'প্রত্যেক গোনাহগারকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। তবে তবলা ও বাদ্য-বাদকদের তিনি ক্ষমা করবেন না।'[৫]

এটি (اَلْعَرْطَبَةُ) ফাতাহ ও যাম্মা-সহকারে অর্থ اَلْعُوْدُ (ঢোল)। আর কেউ কেউ বলেছেন, اَلطُّنْبُوْرُ (ড্রাম)।[৬]

اَلْمُسْبِلُ হলো مَنْ يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ وَيُرْسِلُهُ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا مَشَى كِبْرًا (যে-লোক হাঁটার সময় অহংকার প্রকাশের জন্য কাপড়ের কিছু অংশ মাটিতে গড়ায় মতো করে পরে)।[৭]

কাযী আয়ায রহ. *মাশারিকুল আনওয়ার* গ্রন্থে ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ('তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না') মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ। আর এ-লোক হলো اَلَّذِي يَجُرُّهُ خُيَلَاءَ (লুঙ্গি, পায়জামা কিংবা প্যান্ট জাতীয় পোষাক ঝুলিয়ে

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪, পৃ. ৩৮১, হাদীস: ২৬২৫ ও খ. ৫, পৃ. ৩১৫, হাদীস: ৩২৭৪: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত

[২] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২০৭: হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত

[৩] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৫, পৃ. ৯৭

[৪] আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, পৃ. ১১৪

[৫] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২১৬

[৬] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*

[৭] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৩৯

চলাফেরা করে)। তাকে বলা হয় أَسْبَلَ ثَوْبَهُ وَشَعَرَهُ (মাটিতে কাপড় মাড়িয়ে এবং চুল নাচিয়ে চলাফেরা করে) অর্থ أَرْخَاهُ (সে তা ঝুলিয়ে দিলো)।[১]

সহীহ মুসলিমে ইরশাদ হয়েছে,

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارًا. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».

'হযরত আবু যর (আল-গিফারী ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামত-দিবসে আল্লাহ তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তিনি তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।' এ-কথা তিনি তিন তিনবার পুনর্ব্যক্ত করেন। হযরত আবু যর (আল-গিফারী ﷺ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এসব দুর্ভাগা ও হতভাগ্য লোক কারা? তিনি ইরশাদ করেন, 'যারা কাপড় মাটির সাথে মাড়িয়ে পরে, কিছু দান করে খোঁটা দেয় আর মিথ্যা শপথ করে ব্যবসায়িক দ্রব্যাদি চালান করে।'"[২]

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী ﷺ তাঁর মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ-এর অর্থ হলো اَلْمُرْخِيْ لَهُ الْجَارُّ طَرَفَهُ خُيَلَاءَ (যে-লোক তার কাপড়ের একাংশকে গর্বভরে জমির সাথে হেঁচড়ে চলে)।

অন্য এক হাদীসে আরও বিস্তারিত এসেছে,

«لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ».

'যে-লোক অহংকারভরে জমিতে কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিতে তাকাবেন না।'"[৩]

---

[১] কাযী আয়ায, *মাশারিকুল আনওয়ার*, খ. ২, পৃ. ২০৪
[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১২০, হাদীস: ১৭১ (১০৬)
[৩] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ৫, পৃ. ১৩৪১, হাদীস: ৩৩৮৯/৭০২

আর الْخُيَلَاءُ অর্থ الْكِبْرُ (অহংকার)। خُيَلَاءُ (অহংকার)-কে الْجَرُّ (পায়চারীর)-এর এ-সংযুক্তি সাধারণ পায়চারীদের মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণিকে বিশেষিত করেছে এবং যেসব লোক অহংকারভরে পথ চলে তাদের এ-অভ্যাসের প্রতি ধমক প্রকাশ করছে। অবশ্য নবী করীম ﷺ হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক রضي الله عنه-কে এ-ধরনের অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, «لَسْتَ مِنْهُمْ» ('আপনি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন')[1]। কারণ পথচলার সময় তাঁর কোনো অহংকার ছিলো না।[2]

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির আত-তাবারী رحمه الله ও অন্যরা বলেছেন, বিশেষভাবে লুঙ্গি পরার কথা এসেছে এজন্যই যে, সে-সময় মানুষ সাধারণভাবে লুঙ্গিই পরিধান করতো। অতএব লুঙ্গি ছাড়া জামা ইত্যাদি পোশাকের বিধানও একই।

আমি বলি, এ-বিষয়টি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়:

مِنْ رِوَايَةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ رحمه الله-এর বর্ণনা, তিনি তাঁর পিতা (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنهما) থেকে (বর্ণনা করেন), নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, 'লুঙ্গি, জামা ও পাগড়িতে অতিরিক্ত কাপড় ঝুলিয়ে যেসব লোক অহংকার করে হেঁটে চলে, আল্লাহ কিয়ামত-দিবসে তার দিকে তাকাবেন না।''

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ رحمه الله[3], ইমাম আন-নাসায়ী رحمه الله[4] ও ইমাম ইবনে মাজাহ رحمه الله[5] হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। এখানে ইমাম আন-নাওয়াওয়ী رحمه الله-এর কথা সমাপ্ত।[6]

---

[1] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ১৮, হাদীস: ৬০৬২
[2] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ*, খ. ২, পৃ. ১১৬
[3] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ৬০, হাদীস: ৪০৯৪
[4] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৮, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৫৩৩৪
[5] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১১৮৩, হাদীস: ৩৫৭৬
[6] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ*, খ. ২, পৃ. ১১৬

আমি বলি, অধিকাংশ হাদীসের ভাষ্যে যে-বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি এতে সাধারণভাবে কাপড় ঝুলিয়ে চলার কথা এসেছে আর কতিপয় হাদীসে লুঙ্গি হেঁচড়ে চলার কথা রয়েছে। সম্ভবত কোনো কোনো বর্ণনাকারী লুঙ্গি ব্যবহারের ও লুঙ্গির প্রচলনের বিভিন্নতার দিক থেকে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী লুঙ্গিকে হেঁচড়ে চলার সাথে সংযুক্ত করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

তৃতীয় প্রবন্ধ: পনেরই শাবানের রাতে ইবাদত পালন, দিনে সিয়াম পালন ও এ-দিবসের সুসাব্যস্ত দুআ ও যিকরের আলোচনা

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا، وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا».

'হযরত আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'পনেরই শাবানের রাত আসলে তোমরা রাতের বেলা ইবাদত উদ্‌যাপন করো এবং দিনের বেলা সিয়াম পালন করো।'"[১] আল-হাদীস।

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَيْلَتِيْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدِيْ، فَلَمَّا كَانَ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَدْتُهُ، فَأَخَذَنِيْ مَا يَأْخُذُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ، فَتَلَفَّفْتُ بِمِرْطِيْ، فَطَلَبْتُهُ فِيْ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَلَمْ أَجِدْهُ فَانْصَرَفْتُ إِلَىٰ حُجْرَتِيْ، فَإِذَا أَنَا بِهِ كَالثَّوْبِ السَّاقِطِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: «سَجَدَ لَكَ خَيَالِيْ وَسَوَادِيْ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، فَهَذِهِ يَدِيْ وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلَىٰ نَفْسِيْ يَا عَظِيْمُ! يُرْجَىٰ لِكُلِّ عَظِيْمٍ، يَا عَظِيْمُ! اغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ»، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ عَادَ سَاجِدًا، فَقَالَ: «أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً

---

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৪, হাদীস: ৩৫৪২

عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، أَقُوْلُ كَمَا قَالَ أَخِيْ دَاوُدُ، أَعْفُرُ وَجْهِيْ فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِيْ، وَحَقٌّ لَهُ أَنْ يُسْجَدَ»، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ قَلْبًا تَقِيًّا مِّنَ الشِّرْكِ نَقِيًّا لَّا جَافِيًا، وَلَا شَقِيًّا»، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَدَخَلَ مَعِيْ فِي الْخَمِيْلَةِ وَلِيْ نَفَسٌ عَالٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا النَّفَسُ يَا حُمَيْرَاءُ»؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَطَفِقَ يَمْسَحُ بِيَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيَّ، وَهُوَ يَقُوْلُ: «وَيْسَ هَاتَيْنِ الرُّكْبَتَيْنِ مَا لَقِيَتَا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ فِيْهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا الْمُشْرِكَ وَالْمُشَاحِنَ».

'হযরত আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পনেরই শাবানের রাত ছিলো আমার। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে অবস্থান করছিলেন। মধ্যরাতের সময় আমি তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই অন্যান্য মহিলাদের মতো আমারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। আমি চাদর পরে অন্যান্য স্ত্রীদের ঘরে খুঁজি কিন্তু সেখানে তাঁকে পাইনি। তখন আমি ঘরে ফিরে আসি। কাপড়ের স্তূপের মতো অবস্থায় আমি তাঁকে খুঁজে পাই। তিনি সাজদায় গিয়ে বলছিলেন,

«سَجَدَ لَكَ خَيَالِيْ وَسَوَادِيْ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، فَهَذِهِ يَدِيْ وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلَىٰ نَفْسِيْ يَا عَظِيْمُ! يُرْجَىٰ لِكُلِّ عَظِيْمٍ! يَا عَظِيْمُ! اغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ».

'আমার হৃদয়প্রাণ, তোমার সাজদায় অবনত। আমার হৃদয়মন তোমার ওপর বিশ্বাস করেছে। এই আমার হাত যা দিয়ে আমি আমার প্রবৃত্তির ওপর অপরাধ করেছি। হে মহান! আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাণকেন্দ্র! হে মহান! মহাপাপ ক্ষমা করে দাও। আমার কপালও সেই সত্তাকে সাজদা করছি তার অবয়ব ও রূপ সৃষ্টি করেছেন এবং চোখ ও কান দান করেছেন।'

অতঃপর তিনি মাথা উঠান। তারপর পুনরায় সাজদায় গমন করেন এবং বলেন,

«أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، أَقُوْلُ كَمَا قَالَ أَخِيْ دَاوُدُ، أَعْفِرُ وَجْهِيْ فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِيْ، وَحَقٌّ لَهُ أَنْ يُسْجَدَ».

'তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই, তোমার সাজা থেকে তোমার ক্ষমাপ্রাপ্তির আশ্রয় চাই এবং তোমার কাছ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমার পক্ষে তোমার এমন প্রশংসা অসম্ভব যে-ধরনের প্রশংসা তুমি নিজেই নিজের করেছ। তাই বলছি যা বলেছিলেন আমার ভাই দাউদ, আমি আমার কপাল আমার প্রভুর সমীপে মাটিতে ঠেকিয়েছি। তাকে সাজদা করা তাঁর অধিকারও বটে।'

অতঃপর মাথা উঠান এবং বললেন,

«اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ قَلْبًا تَقِيًّا مِّنَ الشِّرْكِ نَقِيًّا لَّا جَافِيًا، وَلَا شَقِيًّا».

'হে আল্লাহ! আমাকে সেই পবিত্রাত্মা দান করো; শিরক-বিমুক্ত, পাপাচারী নয়, গোঁড়াও নয়।'

অতঃপর তিনি ফিরে এলেন এবং তিনি আমার চাদরে প্রবেশ করেন। তখন আমার শ্বাসপ্রশ্বাস বেড়েগিয়েছিলো। এতে তিনি বললেন, 'হে হুমায়রা! তোমার শ্বাসপ্রশ্বাসের এ-অবস্থা কেন'? তখন আমি সব ঘটনা খুলে বললাম। অতঃপর আমার হাঁটুর ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'আহ! এই হাঁটুগুলি আজ রাতে একত্রিত হয়নি। আজ পনেরই শাবানের রাত। এতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করেন।'"[১]

শায়খ, ইমাম ও আরিফ বিল্লাহ আবুল হাসান আল-বাকারী রহ. বলেছেন, এ-রাতের দুআসমূহে উত্তম দুআ হলো:

«اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ».

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৪, হাদীস: ৩৫৫৭

'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি করুণাময়, দয়াময়। ক্ষমা তুমি ভালোবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও।'[1]

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْـمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা, সুস্থতা এবং ইহ ওপরকালীন নিরাপত্তা কামনা করছি।'[2]

যদিও এসব দুআ বর্ণিত হয়েছে লায়লাতুল কদরের জন্য। তবে লায়লাতুল কদরের পর এটি সর্বোত্তম রজনী—ইতঃপূর্বে এ-ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

এ-রাতের উত্তম দুআসমূহ: যা একদল লোক নিষেধ নয় এমন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَـمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إِلَى الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوْعًا وَّصَلّٰى خَلْفَ الْـمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ، وَتَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَأَعْطِنِيْ سُؤَالِيْ، وَتَعْلَمُ مَا نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ، أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِيْ، وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَنِيْ إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَرَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: يَا آدَمُ! إِنَّكَ دَعَوْتَنِيْ بِدُعَاءٍ فَاسْتَجَبْتُ لَكَ، وَلَنْ يَدْعُوَنِيْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَهُ، وَغَفَرْتُ لَهُ ذَنْبَهُ، وَفَرَّجْتُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ، وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ كُلِّ تَاجِرٍ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَّإِنْ كَانَ لَا يُرِيْدُهَا».

'হযরত আবু বারযা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যখন হযরত আদম -কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তখন তিনি বায়তুল্লাহ সাতবার

---

[1] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৩৫১৩; হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত, তবে মূল বর্ণনায় كَرِيمٌ শব্দটি নেই।

[2] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৮, পৃ. ২০১, হাদীস: ৮৪০০; হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত

প্রদক্ষিণ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের বিপরীতে দু'রাকাআত সালাত আদায় করেন। অতঃপর বলেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ، وَتَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَأَعْطِنِيْ سُؤَالِيْ، وَتَعْلَمُ مَا نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ، أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِيْ، وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَنِيْ إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَرَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ».

'হে আল্লাহ! তুমি আমার বাইরে ও ভেতরের সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। অতএব তুমি আমার আরযি কবুল করো। তুমি আমার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করো। তুমি আমার প্রবৃত্তির খবর রাখো। অতএব আমার পাপসমূহ মার্জনা করো। আমি তোমার কাছে এমন ঈমান কামনা করি, যা আমার অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং সত্যিকারের আস্থা কামনা করি। যাতে আমার বুঝে আসে যে, তুমি আমার জন্য যা লিখে রেখেছো তা ছাড়া অন্যকিছু আমাকে গ্রাস করতে পারবে না। আর আমাকে তোমার সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট রেখো।'
অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহি পৌঁছান, 'হে আদম! নিশ্চয় তুমি যে দুআ-দরবারে আমাকে আহ্বান করেছ আমি তা তোমার জন্য কবুল করে নিয়েছি। তোমার পর তোমার বংশধরের মধ্যে কেউ এই দুআ করবে তার দুআও কবুল করবো, তার পাপ ক্ষমা করে দেবো এবং তার দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করে দেব। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসার চেয়ে বেশি দেব; তাকে দুনিয়া দেব; দুনিয়া তার নিকট তুচ্ছ হয়ে পায়ের নীচে আসবে। যদিও সে এমন কল্পনাও করেনি।'"[১]

এই রাতে জেগে থাকা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য আছে। এর স্বপক্ষে তাবিয়ীদের মধ্যে হযরত খালিদ ইবনে মাদান (রহ.), হযরত মাকহুল (রহ.) ও হযরত লুকমান ইবনে আমের (রহ.) মত দিয়েছেন। আর এ-ব্যাপারে হযরত আতা (রহ.) ও হযরত ইবনে আবু মুলায়কা (রহ.) প্রমুখ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এর সাথে শাফিয়ী ও মালিকী আলিমরাও একমত।

---

[১] আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ১, পৃ. ৩৫২, হাদীস: ২৬২, হাদীসটি হযরত আবু বারদা (রা.) থেকে নয়, হযরত আবু বুরায়দা (রা.) থেকেই বর্ণিত হয়েছে

হযরত খালিদ ইবনে মাদান ও হযরত লুকমান ইবনে আমির, অনুরূপভাবে ইমাম ইসহাক ইবনে রাহাওয়ায়হ সম্মিলিতভাবে মসজিদে এ-রাত জেগে থাকতেন। আর খালিদ ও লুমান এ-রাতে তাঁরা উত্তম পোষাক পরিধান করতেন, সুরমা লাগাতেন এবং রাতব্যাপী মসজিদে ইবাদত পালন করতেন।

অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, যদি কোনো লোক ব্যক্তিগতভাবে এই রাত জেগে থাকে তাহলে তা উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের আলোকে মুস্তাহাব। আর ফযীলতের ক্ষেত্রে এই ধরনের হাদীস দ্বারা আমল করা যায়। ইমাম আল-আওযায়ী ও একই কথা বলেছেন।[১]

বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عُمَرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، أَنَّهُ كَتَبَ لِعَامِلِهِ بِالْبَصْرَةِ عَلَيْكَ بِأَرْبَعِ لَيَالٍ مِّنَ السَّنَةِ، فَإِنَّ اللهَ يُفْرِغُ فِيْهِنَّ الرَّحْمَةَ إِفْرَاغًا: أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى.

'হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর বসরার গভর্নরকে লিখেলেন যে, বছরে চারটি রাত তোমার ওপর বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চয় আল্লাহ এসব রাতে অনেক রহমত অবতীর্ণ করেন। যথা– রজবের প্রথম রাত, পনেরই শাবানের রাত, ঈদুল ফিতরের রাত ও ঈদুল আযহার রাত।'

অবশ্য তাঁর (হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয) থেকে বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে।[২]

ইমাম আশ-শাফিয়ী বলেন,

أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِيْ خَمْسِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيْدَيْنِ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَجَبٍ وَّنِصْفِ شَعْبَانَ.

'নিশ্চয় পাঁচটি বিশিষ্ট রাতে দুআ কবুল হয়: জুমুআ ও দু'ইদের রাত এবং রজবের প্রথম রাত ও পনেরই শাবানের রাত।'[৩]

---

[১] ইবনে রজব আল-হাম্বলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

[২] ইবনে রজব আল-হাম্বলী, *প্রাগুক্ত*

[৩] আন-নাওয়াওয়ী, *রাওযাতুত তালিবীন*, খ. ২, পৃ. ৭৫

ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল রহ.) থেকে এ-রাত জেগে থাকা সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই। তবে রাতজাগা সম্পর্কে তাঁর থেকে যে-দুটো বর্ণনা রয়েছে তাও ঈদের রাত জেগে থাকা সম্পর্কিত।[১]

নবী করীম ﷺ-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পনেরই শাবান রাতে মুমিন নর-নারী ও শহীদগণের মাগফিরাতের জন্য কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَوَضَعَ عَنْهُ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَتِمَّ أَنْ قَامَ، فَلَبِسَهُمَا، فَأَخَذَتْنِيْ غَيْرَةٌ شَدِيْدَةٌ، ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَأْتِيْ بَعْضَ صُوَيْحِبَاتِيْ، فَخَرَجْتُ أَتْبَعُهُ، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيْعِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ، فَقُلْتُ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ فِيْ حَاجَةِ رَبِّكَ، وَأَنَا فِيْ حَاجَةِ الدُّنْيَا.

فَانْصَرَفْتُ، فَدَخَلْتُ فِيْ حُجْرَتِيْ وَلِيْ نَفَسٌ عَالٍ، وَلَحِقَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا هٰذَا النَّفَسُ يَا عَائِشَةُ»؟، فَقُلْتُ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي أَتَيْتَنِيْ، فَوَضَعْتَ ثَوْبَيْكَ، ثُمَّ لَمْ تَسْتَتِمَّ أَنْ قُمْتَ، فَلَبِسْتَهُمَا، فَأَخَذَتْنِيْ غَيْرَةٌ شَدِيْدَةٌ، وَظَنَنْتُ أَنَّكَ تَأْتِيْ بَعْضَ صُوَيْحِبَاتِيْ حَتَّىٰ رَأَيْتُكَ بِالْبَقِيْعِ تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ، بَلْ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ ؑ، فَقَالَ: هٰذِهِ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلِلّٰهِ فِيْهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ، لَا يَنْظُرُ اللهُ فِيْهَا إِلَىٰ مُشْرِكٍ، وَلَا إِلَىٰ مُشَاحِنٍ، وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحِمٍ، وَلَا إِلَىٰ مُسْبِلٍ، وَلَا إِلَىٰ عَاقٍّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا إِلَىٰ مُدْمِنِ خَمْرٍ».

---

[১] ইবনে রজব আল-হাম্বলী, *৫/৩৮*

قَالَتْ: فَوَضَعَ ثَوْبَيْهِ، فَقَالَ لِيْ: «يَا عَائِشَةُ! تَأْذَنِيْنَ قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ»؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ! بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، فَقَامَ، فَسَجَدَ طَوِيْلًا، حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قُبِضَ، فَقُمْتُ أَلْتَمِسُهُ، وَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، فَتَحَرَّكَ، فَفَرِحْتُ وَسَمِعْتُهُ، يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: «أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ»، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرْتُهُنَّ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! تَعَلَّمْتِيْهِنَّ وَعَلِّمِيْهِنَّ»؟ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ ﷺ عَلَّمَنِيْهِنَّ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أُرَدِّدَهُنَّ فِي السُّجُوْدِ».

'হযরত আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং পোশাক খুলছিলেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ না খুলে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পুনরায় পোশাক পরে নিলেন। তাতে আমার খুবই ঈর্ষা লাগলো এবং আমার মনে হলো, তিনি আমার অন্য সতিনের নিকট যাচ্ছেন। তবে আমি তাঁকে বকিউল গরকদে দেখতে পাই; তিনি মুমিন নর-নারী এবং শহীদগণের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন। অতঃপর আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি আপনার প্রভুর কাজে নিবেদিত আছে, আর আমি পার্থিব কাজে ব্যস্ত আছি।

অতঃপর আমি ফিরে আসি এবং আমার কামরায় প্রবেশ করি। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘ হচ্ছিল। ইত্যবসরে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনেন এবং তিনি বললেন, হে আয়িশা! তোমার শ্বাসপ্রশ্বাসের এ-অবস্থা কেন'? আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনি তো আমার ঘরে তশরীফ এনেছিলেন এবং পোশাক খুলছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ না খুলে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পুনরায় পোশাক পরে নিলেন। এতে আমার খুবই ঈর্ষা লাগলো এবং আমার ধারণা হলো, আপনি আমার অন্য সতিনের নিকট যাচ্ছেন। তবে আমি আপনাকে বকিউল গরকদে দেখতে পাই; আপনার কাজ আপনাকে করতে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, 'হে

আয়িশা! তোমার কি আশঙ্কা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার ওপর যুলম করবে? হ্যাঁ! আমার কাছে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসেছিলেন এবং বললেন, আজকের রাত পনেরই শাবানের রাত। এতে কলব গোত্রের ছাগলের লোমের সমপরিমান মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে মুশরিক, হিংসুক, আত্মীয়তা ছিন্নকারী, গর্বভরে গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ছেড়ে পোশাক পরিধানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং সর্বদা মাদকসেবীর প্রতি আল্লাহ এ-রাতেও দৃষ্টিপাত করবেন না।'

তিনি বলেন, অতঃপর তিনি পোশাক খুললেন এবং আমাকে বললেন, 'হে আয়িশা! আজকের রাতে জেগে ইবাদতে তোমার অনুমতি আছে কি'? আমি বললাম, অবশ্যই! আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং একদীর্ঘ সাজদায় গেলেন। এমনকি আমার ধারণা করতে লাগলাম যে, তিনি ইন্তিকাল করলেন নাকি? আমি উঠে তাঁকে স্পর্শ করলাম; আমি তাঁর পায়ের তালুতে হাতে স্পর্শ করে দেখলাম। তিনি নড়েচড়ে ওঠলেন। তাই আমি আনন্দিত হলাম অতঃপর আমি শুনতে পেলাম, তিনি তাঁর সাজদায় বলছিলেন:

«أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ»

'হে আল্লাহ! তোমার পাকড়াও থেকে তোমার ক্ষমার আশ্রয় কামনা করছি, আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় কামনা করছি। আমি তোমার থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আমার পক্ষে তোমার এমন প্রশংসা অসম্ভব যে-ধরনের প্রশংসা তুমি নিজেই নিজের করেছ।'

যখন সকাল হলো এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, 'হে আয়িশা! এসব দুআ নিজে শিকে নাও এবং অন্যদেরকে তা শিক্ষা দাও। নিশ্চয় হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে এই দুআগুলো শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, সাজদায় যেন এসব দুআ আমাকে শিখিয়েছেন আর সাজদায় বারবার পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন।"[১]

---

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৩, হাদীস: ৩৫৫৬

وَعَنْهَا ، قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّيْ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ قُمْتُ حَتّٰى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ! أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بِكِ»؟ فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلٰكِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُوْلِ سُجُوْدِكَ، فَقَالَ: «أَتَدْرِيْنَ أَيَّ لَيْلَةٍ هٰذِهِ»؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هٰذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ يَطَّلِعُ عَلٰى عِبَادِهِ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِيْنَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِيْنَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ».

হযরত আয়িশা থেকে আরও বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং একদীর্ঘ সাজদায় গেলেন। এতে আমার ধারণা হতে লাগলো তিনি পরলোকগমন করেছেন নাকি। যখন এ-অবস্থা দেখতে পেলাম তখন আমি দাঁড়ালাম এবং আঙুলে নাড়া দিলাম। অতঃপর তিনি নড়েচড়ে উঠলেন। তারপর আমি ফিরে আসি। যখন তিনি সাজদা থেকে মাথা ওঠালেন এবং সালাত থেকে অবসর হলেন তখন বললেন, 'হে আয়িশা! বা হে হুমায়রা! তুমি কি ধারণা করেছিলে য, নবী তোমার ওপর অবিচার করেছে'? আমি বললাম, জি-না, আল্লাহর নামে শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! কিন্তু আপনার দীর্ঘ সাজদার দরুন আপনার প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়েছিল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, 'হে আয়িশা! তুমি জান এটি কোন রজনী'? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, 'এটি পনেরই শাবানের রাত; নিশ্চয় আল্লাহ পনেরই শাবান রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি অবতরণ করে থাকেন। অতঃপর ক্ষমাপ্রার্থীদের ক্ষমা করেন, করুণাপ্রার্থীদেরকে অনুগ্রহ করেন। পক্ষান্তরে হিংসুকদের তাদের দুরাবস্থার ওপর ছেড়ে দেন।"[১]

---

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ৩৫৫৪

এই রাতের সালাত-বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَامَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الْفَرَاغِ، فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص] أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق] أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس] أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً، وَ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ﴾ [التوبة] الْآيَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَأَلْتُ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِهِ، قَالَ: «مَنْ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِيْ رَأَيْتَ كَانَ لَهُ كَعِشْرِيْنَ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً، وَصِيَامُ عِشْرِيْنَ سَنَةً مَقْبُوْلَةً، فَإِنْ أَصْبَحَ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ لَهُ كَصِيَامِ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ».

হযরত আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পনেরই শাবানের রাতে দেখতে পেলাম, তিনি উঠে দাঁড়ান। অতঃপর চৌদ্দ রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাত থেকে অবসর হয়ে বসলেন এবং সূরা আল-ফাতিহা চৌদ্দবার, সূরা আল-ইখলাস চৌদ্দবার, সূরা আল-ফালাক চৌদ্দবার, আন-নাস চৌদ্দবার, একবার আয়াতুল কুরসী এবং لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ (নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন, যিনি স্নেহশীল।)[১] আয়াতখানি তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি তাঁর সালাত থেকে অবসর নেন তাঁকে আমি যা করতে দেখলাম সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, 'তুমি যা দেখলে অনুরূপ যদি কোনো ব্যক্তি করে তাকে বিশটি মাকবুল হজ ও বিশ বছরের মাকবুল সিয়াম পালন সাওয়াব প্রদান করা হবে। যদি এই দিন সকালে সিয়াম পালন করে

---

[১] আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:১২৮

তাহলে তা তার জন্য দু'বছর: বিগত একবছর ও আগামী একবছরের সিয়াম পালনের সাওয়াবের সমান হবে হবে।"

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী ﷺ তাঁর *শুআবুল ঈমান* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, জানা গেছে যে, এ-হাদীসটি মাওযূ (বানোয়াট)। এর বর্ণনাকারীরা অজ্ঞাত। তাই এটি মুনকার (অবাঞ্ছিত)।[1]

ইমাম আল-জুরকানী তাঁর *আল-আবাতীল*[2] গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনুল জওযী ﷺ তাঁর *আল-মাওযূআত* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন যে, এটি সম্পূর্ণ মাওযূ (বানোয়াট) এবং এর সূত্রও প্রচ্ছন্ন।[3]

তানযীহুশ শরীআ গ্রন্থে মাওযূ (বানোয়াট) হাদীসসমূহের মধ্যে এসেছে:

حَدِيْثُ عَلِيٍّ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا عَلِيُّ! مَنْ صَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝ ﴾ [الإخلاص] عَشَرَ مَرَّاتٍ»...

'হযরত আলী ﷺ-এর হাদীস, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'হে আলী! যে-ব্যক্তি পনেরই শাবানের রাতে একশ রাকআত সালাত আদায় করবে: প্রত্যেক রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পর এগারবার সূরা আল-ইখলাস পড়বে।"[4]

হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

«وَيَأْمُرُ الْكَاتِبِيْنَ أَنْ لَّا تَكْتُبُوْا عَلَىٰ عَبْدِيْ سَيِّئَةً، وَّاكْتُبُوْا لَهُ الْحَسَنَاتِ إِلَىٰ أَنْ يَّحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَمَنْ صَلَّى هٰذِهِ الصَّلَاةَ فَالرَّبُّ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيْبًا مِّنْ عِنْدِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ».

'(আল্লাহ) কিরামান-কাতিবীনকে নির্দেশ দেন, আমার বান্দার কোনো পাপ লিপিবদ্ধ করবে না, বরং এ-বছরের সমাপ্তি পর্যন্ত তার পুণ্যই

---

[1] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৬–৩৬৭, হাদীস: ৩৫৫১
[2] আল-জুরকানী, *আল-আবাতীল ওয়াল মানাকীর ওয়াস সিহাহ ওয়া আল-মাশাহীর*
[3] ইবনুল জওযী, *আল-মাওযূআত*, খ. ২, পৃ. ১০৩
[4] ইবনে আরাক, *তানযীহ*, খ. ২, পৃ. ৯২–৯৩, হাদীস: ৫২

লিখতে থেকো। আর যে-ব্যক্তি এই সালাত আদায় করবে তাহলে প্রতিপালক তাকে ওই তাঁর কাছ থেকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন।'[১]

ইমাম ইবনুল জওযী বলেছেন, এর বর্ণনাকারীরা অজ্ঞাত এবং দুর্বল।[২]

৪ হাদীস ৪

«مَنْ قَرَأَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَلْفَ مَرَّةٍ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص] فِيْ مَائَةِ رَكْعَةٍ، لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ إِلَيْهِ فِيْ مَنَامِهِ مِائَةَ مَلَكٍ ثَلَاثُوْنَ يُبَشِّرُوْنَهُ بِالْجَنَّةِ، وَثَلَاثُوْنَ يُؤْمِنُوْنَهُ مِنَ النَّارِ، وَثَلَاثُوْنَ يَعْصِمُوْنَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ، وَعِشْرُوْنَ يَكِيْدُوْنَ مَنْ عَادَاهُ».

'যে-ব্যক্তি পনেরই শাবানের রাতে একহাজার বার সুরা আল-ইখলাস-সহকারে একশ রাকাআত সালাত আদায় করবে। সে ইহকাল ত্যাগ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তার ঘুমের মধ্যে তার প্রতি একশজন প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে ত্রিশজন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে, ত্রিশজন তাঁকে জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দেবে, ত্রিশজন ভুল-ত্রুটি থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং দশজন ফেরেশতা তার শত্রুদের মুকাবিলা করবে।'[৩]

ইমাম ইবনুল জওযী বলেছেন, এর বর্ণনাকারীরা অজ্ঞাত এবং সমালোচিত।[৪]

حَدِيْثُ عَلِيٍّ، رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَامَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

'হযরত আলী-এর বর্ণনা, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পনেরই শাবানের রাতে দেখতে পেলাম, তিনি ওঠে দাঁড়ান। অতঃপর চৌদ্দ রাকাআত সালাত আদায় করলেন।'[৫]

---

[১] ইবনে আররাক, *প্রাগুক্ত*

[২] ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ২, পৃ. ১২৮

[৩] ইবনে আররাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৯৩, হাদীস: ৫৩

[৪] ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ২, পৃ. ১২৯

[৫] ইবনে আররাক, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৯৩, হাদীস: ৫৫

আল-হাদীস। এর সূত্র প্রচ্ছন্ন।[1] ইমাম আল-বায়হাকী রহ. বলেছেন, জানা গেছে যে, এ-হাদীসটি মাওযু (বানোয়াট)।[2]

নোংরা বিদআতসমূহ

ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকায় জনসাধারণে প্রচলিত রয়েছে যে, তারা আলোকসজ্জা ও ঘরের প্রাচীরের ওপর বাতি প্রজ্বলিত করে এবং পরস্পর গর্ব এ-বিষয়ে করে, সম্মিলিতভাবে আতশবাজি করে হই-হল্লা করে আর গোলা ছোড়াছুড়ি করে। প্রামান্য গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহে এসবের কোনো ভিত্তি নেই। বরং একেবারে অগ্রহণযোগ্য। এসব কাজের সমর্থনে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি, না দুর্বল ও না মওযু (বানোয়াট) কোনো হাদীস।

ভাতবর্ষ ছাড়া আরব দেশসমূহ বিশেষত হারামাইন শরীফাইনে—আল্লাহ এ-দুটো স্থানের সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিন—প্রচলিত নয়। আর ভারতবর্ষ ব্যতীত অনারব কোনো দেশেও এসব চালু নেই। সম্ভবত বরং নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীরের আলোকসজ্জা ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রথা অনুকরণ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে পৌত্তলিক যুগ থেকে নোংরা বিদআতের কুসংস্কারসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অতঃপর যৌথ বসবাস, মেলামেশা, মিশ্র পরিবার এবং অমুসলিম মেয়েদের সাথে বিয়েসহ নানাবিধ কারণে মুসলিম-সমাজে এসবের প্রচলন ঘটেছে।

পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম বলেন, বিশেষ রাতগুলোতে অতিরিক্ত আলোকসজ্জা নিকৃষ্ট রকমের বিদআত। কেননা প্রয়োজনের অধিক আলোকসজ্জা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে শরিয়তের কোথাও কোনো প্রমাণ নেই।

ইমাম আলী ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন, প্রথম আলোকসজ্জার প্রচলিত হয় বারামিক থেকে, যারা পূর্বে অগ্নিপূজারি ছিলো। তারা ইসলামগ্রহণ করে হিদায়তি সুন্নাতের প্রলেপ দিয়ে সেসব ইসলামে ঢুকিয়ে দেয়। বস্তুত তারা অগ্নিপূজরি ছিলো, মুসলিমদের সাথে এই আলোকসজ্জায় সাজদা করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য।

---

[1] ইবনুল জওযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৩০

[2] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৬–৩৬৭, হাদীস: ৩৫৫৯

মসজিদের কতিপয় মুর্খ ইমাম সালাতুর রাগায়িব ইত্যাদির নামে লোক জোগাড়, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের জন্য ফন্দি এঁটেছেন। তারা মুখরোচক ও মনগলানো গল্প বলে আলোচনাসভাসমূহ সরগরম করেন।

অতঃপর এই ধরনের কুসংকারসমূহ বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য আল্লাহ তাআলা হিদায়তের ইমামগণকে নিয়োজিত করেছেন। অতএব এসব কুপ্রথাসমূহ ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। হিজরী অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে মিসর ও সিরিয়া থেকে এসব কুসংস্কারসমূহকে নির্মূলে জোরদার আন্দোলন সংঘটিত হয়।[১]

ইমাম আত-তরসূসী رحمه الله (তারাবীহ) খতমের রাতে সমবেত হওয়া, মঞ্চ তৈরি, নর-নারীর অবাধ মেলামেশা এবং পরস্পর হই-হল্লা করা এমনকি যা হওয়ার তাই হয়—এসবকে খ-ন করেছেন।[২]

আত-তাযকারা গ্রন্থে বিস্তারিত এসেছে।

---

[১] মোল্লা আলী আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ,* খ. ৩, পৃ. ৯৭৭

[২] আল-ফাত্তানী, *তাযকিরাতুল মাওযূআত,* পৃ. ৪৬

মাহে রামাযান

মাহে রামাযানে রয়েছে সিয়াম ও কিয়াম। কিয়াম থেকে উদ্দেশ্য হলো তারাবীহ। এখানে আমরা রামাযানের আহকাম ও প্রাসঙ্গিক মাসায়িল নিয়ে আলোচনা করব।

জেনে রাখুন! তারাবীহ কি সুন্নাত সে-বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, না। তারাবীহ হলো নফল এবং তা মুস্তাহাব। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সুন্নাত। আর এই মতটিই সঠিক। তারাবীহ নর-নারী সকলের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা—পূর্বসূরিদের থেকে উত্তরসূরি পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতায় এটি প্রচলিত হয়ে আসছে। নিচের বর্ণনার আলোকে এ-নিয়ে যাবতীয় মতভেদের অবসান হয়ে যায়।

(عَنِ) الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ﷺ، أَنَّهَا سُنَّةٌ، لَا يَنْبَغِيْ تَرْكُهَا؛ وَهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَقَامَهَا بَعْضَ اللَّيَالِيْ ثُمَّ تَرَكَهَا وَبَيَّنَ الْعُذْرَ فِيْ تَرْكِ الْمُوَاظَبَةِ وَهُوَ خَشْيَةُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْنَا، ثُمَّ وَاظَبَ عَلَيْهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ خُصُوْصًا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيْثِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي».

ইমাম আল-হাসান ﷺ থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুমাল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তারাবীহ সুন্নাত। তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা নবী করীম ﷺ কোনো কোনো রাত তারাবীহ পড়তেন আবার ছেড়েও দিতেন এবং ছেড়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, তাঁর আশংকা ছিলো যদি আবার এটা ফরয হয়ে যায়। অতঃপর খুলাফায়ে রাশিদীন বিশেষত আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন নিয়মিত

তারাবীহ পড়তেন। যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমার অবর্তমানে তোমারা আমার এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।"[১]

ফিকহের অনেক কিতাবে উল্লেখ আছে, যদি কোনো নগরবাসী তারাবীহ ছেড়ে দেয় তাহলে প্রশাসক তাদেরকে এজন্য হত্যা করবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ক্রীতদাস যাকওয়ানের পিছনে তারাবীহ পড়তেন। অনুরূপভাবে হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্যান্য মহিলাদের সাথে সম্মিলিতভাবে তাঁর ক্রীতদাস উম্মুল হাসান আল-বাসারীর পিছনে তারাবীহ পড়তেন।[২]

এখানে আমরা কয়েকটি পরিচ্ছদে আলোচনা করবো।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ তারাবীহের রাকআতসমূহ

আমাদের মতে তারাবীহ বিশ রাকাআত। যেহেতু ইমাম আল-বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

إِنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْـخَطَّابِ رضي الله عنه بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَفِيْ عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما مِثْلَهُ.

'তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন। হযরত ওসমান (ইবনে আফফান) রাদিয়াল্লাহু আনহু[৩] ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলেও অনুরূপ পড়া হতো।'[৪]

বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِيْ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযানে বিশ রাকআত সালাত আদায় করতেন।

---

[১] (ক) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১৮, পৃ. ২৪৬, হাদীসঃ ৬১৮; হযরত আল-ইরবায ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; (খ) আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ২, পৃ. ১৪৫

[২] আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া*, খ. ২, পৃ. ৩৩৭

[৩] আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৬৯৮, হাদীসঃ ৪২৮৮

[৪] আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীসঃ ৪২৯০

তারপর তিন রাকাআত বিতর সালাত পড়তেন।'[১]

অবশ্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এ-হাদীসটি দুর্বল। হযরত আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

'নবী করীম (সা.) এগার রাকাআত সালাত আদায় করতেন।'[২]

রাতজাগরণের ক্ষেত্রে নবী করীম (সা.)-এর অনুরূপ অভ্যাসই ছিলো।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর শাসনামলে অনেক পূর্বসূরি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমলের সাথে সামঞ্জস্য করে এগার রাকাআত সালাত পড়তেন।

আর সাহাবা, তাবেয়িবর্গ ও তাঁদের পরবর্তীদের থেকে যে-বিষয়টি সাব্যস্ত এবং প্রসিদ্ধ হয়ে আসছে তা হলো তারাবীহ হবে বিশ রাকাআত।

অন্য একটি বর্ণনা মতে, তারাবীহ হলো তেইশ রাকাআতের। সে-হিসেবে বিতরও তারাবীহের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মালিক (ইবনে আনাস (রহ.))[৩] বলেছেন, ইমাম আশ-শাফিয়ী (রহ.)[৪] থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তারাবীহ হলো ছত্রিশ রাকাআত অথবা বিতরসহ উনচল্লিশ রাকাআত। এই আমল বিশেষত মদীনাবাসীর। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, মক্কার অধিবাসীরা পবিত্র কাবা সাতবার প্রদক্ষিণ করতেন এবং তাওয়াফের দু'রাকাআত সালাত প্রত্যেক দু'তারাবীহের মাঝখানে আদায় করতেন। তবে যেহেতু মদীনাবাসীদের পক্ষে এ-ফযীলত লাভ করা দুরূহ ছিলো তাই তারা ওই দু'তারাবীহের মাঝখানে চার রাকাআত করে অতিরিক্ত পড়তে শুরু করেন। তারা এর নাম দেন সিত্তা আশারিয়া। তাদের এই অভ্যাস ওইভাবে এখনও প্রচলিত আছে।

ওই রকম হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তবে তা প্রসিদ্ধ নয়।

যদি মদীনাবাসী ছাড়া অন্যরাও অতিরিক্ত সালাত পড়ে তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর এ-ক্ষেত্রে ইমাম ও অন্যরা সকলেই সমান। এসব

---

[১] আবদ ইবনে হুমায়দ, *আল-মুনতাখাব*, পৃ. ২১৮, হাদীস: ৬৫৩

[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৩০৩; হাদীস: ৪৪০

[৩] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মাদূনা*, খ. ১, পৃ. ২৮৭

[৪] আল-ইমরানী, *আল-বায়ান*, খ. ২, পৃ. ২৭৮

সালাত ব্যক্তিগতভাবে পড়া উচিত। কেননা তারাবীহ্ ছাড়া জামাআত-সহকারে নফল পড়া আমাদের মতে মাকরুহ। তবে মদীনাবাসী এসব সালাত জামাআত-সহকারে আদায় করেন। কারণ তাদের মতে জামাআতের সাথে নফল পড়া মাকরুহ্ নয়।

মিসরের পরবর্তী যুগের আলেমদের মাঝে শায়খ কাসিম আল-হানাফি বলেছেন, জামাআতের সাথে নফল পড়া মাকরুহ। কেননা জামাআতের সাথে নফল পড়া যদি মুস্তাহাবও হতো, তবে তা ফরযের মতো ফযীলতপূর্ণ হতো। আর যদি ফযীলতপূর্ণই হতো তবে তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও রাত জেগে ইবাদত পালনকারীরা সকলে সমবেত হয়ে ফযীলত লাভের জন্যে জামাআতের সাথে আদায় করতেন। কিন্তু যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবা রিযওয়ান আল্লাহ আজমাইন থেকে বিষয়টি প্রমাণিত নয়—তাই বোঝা গেলো এতে কোনো ফযীলত নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক দু'তারাবীহের মাঝখানে এক তারাবীহ পরিমান বসা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে পঞ্চম তারাবীহ্ ও বিতরের মাঝখানেও। ইমাম আবু হানিফা رحمه الله থেকে এমনটি বর্ণিত আছে।

اَلتَّرَاوِيْحُ শব্দ اَلرَّاحَةُ (বিশ্রাম) থেকে নির্গত। তাই এই (বিশ্রাম গ্রহণই) তারাবীহ্ নামকরণের নেপথ্য কারণ। পূর্বসূরি ওলামা ও হারামাইনের অধিবাসী সকল এ-ব্যাপারে একমত।

মক্কা-অধিবাসীরা পবিত্র কাবার সাত সাতবার তাওয়াফ করতেন এবং মদীনাবাসীরা চার চার রাকাআত সালাত পড়তেন। অনুরূপভাবে মুসলিম-বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের জন্য তাসবীহ, তাহলীল, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত কিংবা নীরব বসে থাকার ইখতিয়ার আছে। যদি দু'তারাবীহের পর বিশ্রামে না বসা হয়, তবে অনেকের মতে এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা মুস্তাহাব নয়। কেননা এটা হারামাইন শরীফাইনের অধিবাসীদের -আল্লাহ তাঁদের সম্মানে-মর্যাদা বাড়িয়ে দিন- আমলের পরিপন্থি।[১]

অধম বান্দা—আল্লাহ তার জীবনকে শুধরে দিন এবং সূচনা ও শেষ পরিণাম শুভ করুন—বলেন, বর্তমানে হাফিযদের তারাবীহের মধ্যে দীর্ঘ কিরাআত পড়ার যে-প্রচলন রয়েছে তার কারণে মুসাল্লীদের দু'তারাবীহের

---

[১] কাযী খান, *আল-ফাতাওয়া*, খ. ১, পৃ. ২৩৫

মধ্যখানে বিশ্রাম নেওয়া কষ্টকর। হ্যাঁ! এভাবে (বিশ্রাম নিতে গেলে তো) সারারাত কেটে দেওয়া যাবে। এ-থেকে স্পষ্ট হলো যে, দীর্ঘ কিরাআত উত্তম নয়। কারণ এতে পূর্বসূরি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচলিত মুস্তাহাব আমল পরিত্যক্ত হচ্ছে। বরং কিরাআতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। এতে বিশ্রাম করা সহজ হবে। তারাবীহে কিরাআতের আহকাম সম্পর্কিত আলোচনা সামনে আসছে। এক তারাবীহ পড়তে যে-সময় লাগে সে-পরিমাণ না হলেও মধ্যপন্থি কিরাআতে চার রাকাআতের স্বল্প সময়ের বিশ্রামও যথেষ্ট হবে ইনশা-আল্লাহ। আমরা আল্লাহর নিকট স্বীয় আমলের মজুরি কামনা করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তারাবীহের নিয়ত

যদি তারাবীহ, সময়ের সুন্নাত কিংবা রামাযানের কিয়ামুল লায়লের নিয়ত করা হয় তবে জায়েয আছে। আর যদি সাধারণ সালাত কিংবা নফলের নিয়ত করা হয় তবে সে-ব্যাপারে ওলামা-মাশায়িখের মাঝে সেই একই রকম মতপার্থক্য রয়েছে যা সুন্নাতে মুআক্কাদার আদায় সম্পর্কে রয়েছে।

কতিপয় পূর্ববর্তী আলিমরা বলেছেন যে, সঠিক মতে জায়িয নয়। কারণ তারাবীহ হলো সুন্নাত। আর সুন্নাত নফলের নিয়াত বা সাধারণ সালাতের নিয়তে আদায় হবে না। যেহেতু ফজরের দু'রাকাআত এবং এ-বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ﷬ থেকে ইমাম আল-হাসান ﷬ এ-রকমই বর্ণনা করেছেন। কেননা তারাবীহও ফরয সালাতের মতোই একটি বিশেষ সালাত। তাই এতেও ফরয সালাতের বৈশিষ্ট্যের খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য সাধারণ সালাতের নিয়তে তারাবীহ আদায় হবে না।

অধিকাংশ পরবর্তী আলিমরা বলেন, তারাবীহসহ যাবতীয় সুন্নাত সালাত সাধারণ সালাতের নিয়তে আদায় হয়ে যাবে। কেননা তারাবীহে হলো নফল আর নফল সাধারণ সালাতের নিয়তে আদায় হয়।

সাবধানতা হলো, তারাবীহের ক্ষেত্রে তারাবীহ, সময়ের সুন্নাত কিংবা রামাযানের কিয়ামুল লায়লের নিয়ত করবে। আর অন্যান্য সুন্নাতসমূহে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে সুন্নাতের নিয়ত করবে কিংবা সাধারণ সালাতের নিয়ত করবে।[১] যাতে অর্ন্তদ্বন্দ্ব থেকে বাঁচা যায়।

অতঃপর প্রশ্ন হলোঃ তারাবীহের প্রত্যেক জোড় রাকাআতে পৃথকভাবে নিয়ত করার প্রয়োজন আছে কি? বিশুদ্ধ মত হলো, এর কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু পুরো তারাবীহই মূলত একটি সালাত।

---

[১] ইবনে মাযা, *আল-মুহীতুল বুরহানী*, খ. ১, পৃ. ৪৫৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তারাবীহে কিরাআতের পরিমান

এ-ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মাগরিবে যে-পরিমান কিরাআত পড়া হয় তারাবীহেও সে-পরিমান কিরআত পড়বে। কেননা তারাবীহ্ ফরয সহজ সালাত থেকেও বেশ সহজ।[১]

এই মতটা যথার্থ নয়। কেননা এতো অল্পপরিমান কিরাআতে রামাযানে কুরআনের খতম হবে না।

আর কেউ কেউ বলেন, ইশায় যে-পরিমান কিরআত পড়া হয় তারাবীহেও সে-পরিমান কিরাআত পড়বে।[২] কেননা সময়ের দিক দিয়ে তারাবীহ ইশার অনুসারী। বর্ণিত আছে,

(عَنِ) الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ﷺ، أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ وَنَحْوَهَا.

ইমাম হাসান রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি প্রত্যেক রাকাআতে আনুমানিক দশ আয়াত পড়তেন।[৩]

এ-পরিমান কিরআত পড়লে কুরআন একবার খতম হয়। কেননা তারাবীহের রাকাআত-সংখ্যা হলো ছয়শ। আর কুরআনের আয়াত রয়েছে ছয় হাজার। সে-অনুযায়ী প্রতি রাকাআতে প্রায় দশ আয়াত পড়ে।[৪]

কেউ কেউ বলেছেন, বিশ থেকে ত্রিশটি আয়াত পড়বে। যেহেতু বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، أَنَّهُ دَعَا ثَلَاثَةً مِّنَ الْأَئِمَّةِ، فَأَمَرَ أَحَدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثِيْنَ آيَةً، وَأَمَرَ الثَّانِيْ أَنْ يَقْرَأَ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ آيَةً، وَأَمَرَ الثَّالِثَ أَنْ يَقْرَأَ عِشْرِيْنَ آيَةً فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ.

হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি তিনজন ইমামকে ডেকে পাঠান। অতঃপর তাদের একজনকে প্রত্যেক

---

[১] ইবনে নাযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৯
[২] ইবনে নাযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৯
[৩] আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ. ২, পৃ. ১৪৬
[৪] আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত

রাকাআতে ত্রিশটি করে আয়াত পড়ার নির্দেশ দেন, দ্বিতীয়জনকে নির্দেশ দেন পঁচিশটি করে আয়াত পড়তে এবং তৃতীয়জনকে প্রত্যেক রাকাআতে বিশটি করে আয়াত পড়তে নির্দেশ দেন।'[১]

এখানে হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব)-এর বক্তব্য হলো ফযীলতের আর ইমাম আবু হানিফা-এর বক্তব্য হলো সুন্নাতের। এর কারণ হলো, আলিমদের ঐক্যমতে, কুরআন খতম একবার সুন্নাত, দুইবার খতম করা ফযীলতপূর্ণ এবং তিনবার খতম করা অনেক উত্তম।[২]

ইমাম আবু হানিফা-এর বক্তব্য-অনুযায়ী কুরআন খতম হবে একবার। আর হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব)-এর নির্দেশ-অনুযায়ী খতম হবে দুই বা তিনবার।

ফকীহরা এ-রকমই বলেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে আবার লায়লাতুল কদরের ফযীলত লাভের আশায় সাতাইশে রামাযানে খতম-অনুষ্ঠান পছন্দ করেন। কেননা হাদীস থেকে বেশ স্পষ্ট যে, সাতাইশে রামাযানই লায়লাতুল কদর।

এজন্য বুখারার আলিমরা কুরআনে পাঁচশত চল্লিশটি রুকু নির্ণয় করেছেন এবং সে-অনুসারে মাসহাফে চিহ্ন বসিয়েছেন, যাতে সাতাইশতম রাতে খতম অনুষ্ঠিত হয়।

আমাদের পূর্ববর্তী আলিমদের অনেকে যারা বলেছেন, উত্তম হলো প্রত্যেক রাকাআতে ত্রিশটি করে আয়াত পড়া। এতে প্রতি দশদিনে এক খতম অনুষ্ঠিত হবে। কেননা মাসের প্রতি দশদিন পৃথক ও সতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।[৩] হাদীসে এসেছে,

«إِنَّهُ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ».

'রামাযান—যার প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত, তৃতীয় দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি।'[৪]

বর্ণিত হয়েছে,

---

[১] আস-সারাখসী, *প্রাগুক্ত*

[২] ইবনে মাযা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৫৯

[৩] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ২, পৃ. ১৪৬

[৪] ইবনে খুযায়মা, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯১, হাদীস: ১৮৮৭: হযরত সালমান আল-ফারসী থেকে বর্ণিত

عَنْ أَبِيْ حَنِيفَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِحْدَىٰ وَسِتِّيْنَ خَتْمَةً؛ ثَلَاثِيْنَ فِي اللَّيَالِيْ، وَثَلَاثِيْنَ فِي الْأَيَّامِ، وَوَاحِدَةً فِي التَّرَاوِيْحِ.

'ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি রামাযান মাসে একষট্টিটি খতম করতেন; প্রতিদিন একটি খতম, প্রতিরাত একটি খতম এবং পুরো তারাবীহে একটি খতম করতেন।'[১]

আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়ায় ইমাম আশ-শাফিয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আজমাইন থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[২]

আলিমগণ আরও বলেছেন, সকল সালামে (প্রতি দু'রাকাআতে) কিরআতের মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম। এ-রকমই ইমাম আল-হাসান রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব রা.) থেকে এসেছে, এর পরিপন্থীতে তবে কোনো অসুবিধা নেই। আর এক সালামে (একটি দু'রাকাআতের সালাতের মধ্যে) দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করা অন্যান্য সালাতের মতো সর্বসম্মতভাবে মুস্তাহাবের পরিপন্থী। অবশ্য প্রথম রাকাআতে দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় কিরাআত দীর্ঘ করা হয় তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

অবশ্য উত্তম কোনটি: এ-ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর নিকট উভয় রাকাআতে সমানভাবে কিরাআত পছন্দসই। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর নিকট পছন্দসই মত হলো ফরয সালাতের মতো দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় প্রথম রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ পড়বে।[৩]

মাসআলা: যদি তারাবীহে কোনো ভুল করে বসে; যার কারণে কোনো সুরা বা আয়াত ছুটে যায় এবং এর পরবর্তী (কোনো সুরা বা আয়াত) পড়ে ফেলে, তাহলে মুস্তাহাব হলো ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রথমে ছুটে যাওয়া সুরা বা আয়াত পড়বে, তারপর পূর্বে পঠিত আয়াত বা সুরাগুলো পড়বে।[৪]

মাসআলা: যদি তারাবীহের কোনো জোড় ভেঙে যায় এবং এতে কিছু পড়া হয় তবে কি যা পড়া হয়েছে তা পুনরায় পড়তে হবে?

---

[১] (ক) আশ-শিলবী, *আল-হাশিয়া আলা তাবয়ীনিল হাকায়িক*, খ. ১, পৃ. ১৭৯; (খ) কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৮

[২] আল-কাসতাল্লানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩০৮

[৩] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৯

[৪] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৮

কেউ কেউ বলেছেন, পুনরায় পড়তে হবে না। কেননা কিরাআতই উদ্দেশ্য আর কিরাআতের তো কোনো বিশৃঙ্খলা সম্ঘটিত হয়নি।

আর কেউ কেউ বলেছেন, পুনরায় পড়তে হবে। যাতে এই নামাযে একটি সুষ্ঠু খতমে কুরআন অনুষ্ঠিত হয়।[1]

শুধরে দেওয়ার বিধান অন্যান্য সালাতে যেমন জেনেছি অনুরূপভাবে কিছুটা মতবিরোধপূর্ণ। তবে ফাতাওয়া হলো শুধরে দিলে সালাত নষ্ট হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, তারাবীহে প্রয়োজনীয় স্থানে শুধরে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই।

ফকীহবর্গ বলেন, তারাবীহে ইমাম হিসেবে সুকণ্ঠীদের অগ্রাধিকার দেওয়া জনগণের জন্য উচিৎ নয়। বরং বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীকে ইমাম হিসেবে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ যখন ইমাম সুমিষ্ট কণ্ঠে কিরাআত পড়েন তখন মানুষ একাগ্রতা, একনিষ্ঠত, আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে চিন্তা-ফিকর ইত্যাদি থেকে উদাসীন থাকে।

যদি ইমাম কোনো লাহান করেন (কিরাআতে ভুল পড়েন) তবে তার মসজিদ ছেড়ে দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।[2] *সুনান আল-হুদা* গ্রন্থে এ-রকমই বলা হয়েছে।

যদি কোনো ফকীহ ব্যক্তি কারীও হন তবে তাঁর জন্য উত্তম হলো নিজের কিরাআতেই সালাত আদায় করা এবং কারো পিছনে ইকতিদা না করা।[3]

ইমাম সাহেব রুকু-সাজদায় তিনবারের কম তাসবীহ পড়বেন না। শুরুতে সানা পরিত্যাগ করবে না এবং নবী করীম ﷺ-এর ওপর দারুদ পড়াও ত্যাগ করবে না। যেহেতু এসব সুন্নাত। অবশ্য ফিকহের কিছু কিতাবে তার বিপরীতও বলা হয়েছে। তবে সঠিক কথা হলো প্রথমটি।

এখন থাকলো দুআর কথা। মানুষের অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, কষ্টকর না হলে পড়া যায়, অন্যথায় নয়।

যখন শেষ জোড়ে (দু'রাকাআতে) পড়া হয়: প্রথম রাকাআতে সুরা আল-ফালাক ও আন-নাস পড়ে ফেলে কারো মতে দ্বিতীয় রাকাআতে ফাতিহা আল-কিতাব এবং আল-বাকারা থেকে কিছু পড়ে নেবে—এটা মুসাফিরের এক মনযিলে পৌঁছার পর দ্বিতীয় মনযিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়ে গেলো।

---

[1] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*
[2] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৮–২৮৯
[3] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১৪

আবার কেউ কেউ বলেছেন, ছন্দ ও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে দ্বিতীয় রাকাআতে পুনরায় সুরা আন-নাস পড়বে। আল-বাকারা থেকে কিছু পড়বে না।[১]

এটি মসনুন এবং হারামাইন শরীফাইন ও আরব-বিশ্বে সর্বস্বীকৃত।

খতমের শেষ পর্যায়ে সুরা আয-যুহা থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্তের তাকবীর পড়বে। এ-ক্ষেত্রে পছন্দসই হলো لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ। যদি শুধু اَللّٰهُ أَكْبَرُ পড়া হয় তবুও শুদ্ধ হবে।

যদি ইমাম সাহেব হাফিযে কুরআন না হন, তবে কারো মতে তারাবীহের প্রতি রাকাআতে সুরা আল-ইখলাস পড়া উত্তম।

কেউ কেউ বলেন, ছোটছোট সুরা পড়া ভালো। এটি অত্যন্ত ভালো নিয়ম। এতে করে রাকাআতের সংখ্যা গণনায় সন্দেহের সৃষ্টি হবে না এবং মনে রাখতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে না। এতে কুরআনের ভাব ও মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে মনোযোগ সৃষ্টি।

বর্তমানে মক্কা-মদীনা ও আরব-বিশ্বের প্রচলন অনুযায়ী প্রথম জোড়ের (প্রথম দু'রাকাআতের) প্রথম রাকাআতে সুরা আল-ফিল ও দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা আল-ইখলাস পড়বে। দ্বিতীয় জোড়ের (দ্বিতীয় দু'রাকাআতের) প্রথমে রাকাআতে সুরা আল-কুরাইশ ও দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা আল-ইখলাস পড়বে। এভাবে অষ্টম জোড় (অষ্টম দু'রাকাত) পর্যন্ত, উভয় রাকাআতে সুরা আল-ইখলাস। আর নবম জোড়ে (নবম দু'রাকাআতে) সুরা আল-ইখলাস ও সুরা আল-ফালাক এবং দশম জোড়ে (দশম দু'রাকাআতে) সুরা আল-ইখলাস ও সুরা আন-নাস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জামাআত-সহকারে তারাবীহ আদায়

যে-ব্যক্তি তারাবীহের জামাআত ত্যাগ করে এবং ঘরে পড়ে নেয় তবে সে-সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতভেদ আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, সে একজন সুন্নাত ত্যাগী এবং সে একটি মন্দ কাজের সূচনা করল। যেহেতু বর্ণিত আছে যে,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَدْرُ مَا صَلَّى التَّرَاوِيْحَ صَلَّى بِالْجَمَاعَةِ.

নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি যতো তারাবীহ পড়েছেন জামাআত-সহকারেই পড়েছেন।[২]

---

[১] কাযী খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৪
[২] ইবনে মাযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৭

আর সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাইন থেকেও অনুরূপই বর্ণিত আছে। যে-বিষয়ে বরেণ্য সকল ফকীহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, সে একজন ফযীলত ত্যাগী। এতে কোনো অসুবিধা নেই।[১] কেননা অনেক পূর্বসূরি থেকে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু নবী করীম ﷺ লোকজনের সাথে তারাবীহ আদায় মুলতবি করার পর তাদের এড়িয়ে চলতেন। তখন লোকজন নিজ নিজ ঘরে যেভাবে ইচ্ছা তারাবীহ আদায় করে নিতেন। বস্তুত হযরত আবু বকর رضي الله عنه-এর শাসনামল ও হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه)-এর প্রাক-খিলাফত আমলেও অনুরূপ প্রচলিত ছিলো। তারপর জামাআতবদ্ধভাবে আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটি খুবই উত্তম।

শায়খ কাসিম আল-হানাফী رحمه الله বলেন, সঠিক মতে জামাআত-সহকারে আদায় করা সুন্নাতে কিফায়া। যদি মসজিদের প্রতিবেশী সকলেই জামাআত ত্যাগ করে তাতে তারা সুন্নাত পরিত্যাগ করেছে আর এজন্য তারা গোনাহগার হবে। যদি মসজিদে জামাআত-সহকারে তারাবীহ অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বে কোনো লোক যদি পিছুটান দেয় এবং ঘরে গিয়ে পড়ে তাহলে সে ফযীলত ত্যাগ করেছে।[২] এতে সে গোনাহগার হবে না।

যদি লোকজন ঘরেই জামাআত-সহকারে তারাবীহ আদায় করে তবে সে-ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। সঠিক মতে জামাআতের জন্য ফযীলত অবশ্যই আছে। তবে মসজিদে জামাআতের ফযীলত আলাদা। অতএব এই লোক দুইটি ফযীলতের মধ্য থেকে একটিই লাভ করেছে এবং অন্যটি ত্যাগ করেছে।[৩] ফরযের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

কেউ কেউ বলেছেন, অন্যান্য সুন্নাতের মতো তারাবীহও একাএকা পড়বে। কেননা আমলের এ-নিয়ম একনিষ্ঠতার নিকটবর্তী এবং লোকদেখানো থেকে দূরবর্তী। বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে,

«أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ».

---

[১] ইবনে মাযা, *প্রাগুক্ত*

[২] ইবনে আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার*, খ. ১, পৃ. ৫৫২

[৩] ইবনে মাযা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৫৮

'পুরুষদের জন্য ফরয ছাড়া অন্য সকল সালাত নিজ ঘরে পড়াই উত্তম।'[1]

আমি বলবো, এ-বক্তব্যটি পছন্দসই নয়। কেননা হাদীসটি জামাআতের নিয়ম নেই সে-ধরনের সালাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তারাবীহে জামাআতের নিয়ম আছে। এ-ব্যাপারে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ইমাম আবু ইউসুফ رحمه الله থেকে বর্ণিত, যে-ব্যক্তি মাসনুন কিরাআত-সহকারে ঘরে আদায়ে সক্ষম সে ঘরেই সালাত আদায় করে নেবে। অবশ্য কোনো মহান ফকীহ ব্যক্তি; মানুষ যার অনুসরণ করে, তাঁর উপস্থিতে লোকসমাগম বেশি হয় তবে তাঁর জন্য জামাআত ত্যাগ উচিত নয়।[2]

মাসআলা: কোনো লোককে বেতন দিয়ে ইমাম নিয়োগ দেওয়া মাকরূহ। যেহেতু ইমামের বেতন ধার্য করা ফাসিদ।[3]

মাসআলা: যদি মুসল্লীগণ দু'ইমামের পেছনে তারাবীহ পড়ে এবং প্রত্যেক ইমাম এক সালাম (দু'দু'রাকাআত) করে পড়ান তাহলে তা সঠিক মতে মুস্তাহাবের বরখেলাপ। মুস্তাহাব হলো প্রত্যেক ইমাম এক তারওয়িহা (চার রাকাআত) করে পড়াবেন। এমনও করা যায় যে, একজন ফরয পড়াবেন অন্যজন তারাবীহ।[4]

মাসআলা : যদি একজন ইমাম দুই মসজিদে তারাবীহ পড়ান—প্রত্যেক মসজিদে পুরোপুরিভাবে, তবে সে-ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, দু'মসজিদবাসীর জন্য এটি জায়িয। যেমন- যদি মুয়াযযিন আযান দিলো, ইকামত বললো এবং সালাত পড়লেন, অতঃপর অন্য মসজিদে চলে যান, সেখানে আযান দিলো, ইকামত বললো এবং তাদের পড়লো—এতে মাকরূহ হবে না।[5]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যদি কোনো কারণ ছাড়া তারাবীহ বসে পড়া হয় তবে তার বৈধতা ও মুস্তাহাব হওয়া—দু'বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

---

[1] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৫, পৃ. ৪৯৩, হাদীস: ২১৬২৪; হযরত যায়দ ইবনে সাবিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[2] আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা*, খ. ১, পৃ. ৯৭

[3] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৩

[4] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৩

[5] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৩–২৩৪

বৈধতা বিষয়ক আলোচনা

এ-বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, না-জায়িয। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জায়িয; এটিই বিশুদ্ধ মত। অবশ্য আলিমরা এ-ব্যাপারে সর্বসম্মত যে, ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাত কোনো কারণ ছাড়া বসে পড়া জায়িয নয়। ইমাম আল-হাসান ইমাম আবু হানিফা رحمه الله থেকে এ-রকম বর্ণনা করেছেন।[১]

অতঃপর যারা না-জায়িয বলতে চান তারা বলেন, তারাবীহ ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাতের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

আর যারা জায়িয বলতে চান, তারা বলেন, তারাবীহ হলো নফল। এতে ফজরের সুন্নাতের অনুরূপ অতিরিক্ত তাগিদে বিশেষত্ব করা যায় না। তাই এর বিধান অন্যান্য সুন্নাত ও নফলসমূহের অনুরূপ। দলিল হলো, ইমাম আবু হানিফা رحمه الله, ইমাম আবু ইউসুফ رحمه الله ও ইমাম মুহাম্মদ رحمه الله থেকে হযরত আবু সুলায়মান رحمه الله বর্ণনা করেছেন, ওযর বা ওযরবিহীন অবস্থার কোনো প্রভেদ স্বীকার করেন না।

মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক আলোচনা

বিশুদ্ধ মতে বসে তারাবীহ পড়া কোনো অবস্থাতেই মুস্তাহাব নয়। কেননা তা পূর্বসূরিদের ধারাবাহিকসূত্রে প্রচলিত আমলেরও পরিপন্থী।

যদি ইমাম সাহেব কোনো কারণে বা কারণ ছাড়া বসে তারাবীহ পড়ান আর মুক্তাদীরা দাঁড়িয়ে পড়েন তার বৈধতা ও মুস্তাহাব হওয়া— দু'বিষয়েও আলোচনা রয়েছে।

বৈধতা বিষয়ক আলোচনা

এ-বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে জায়েয আছে। ইমাম মুহাম্মদের মতে ফরযের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়িয নয়। আর কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের সকলের মতেই জায়িয। এ-মতটিই বিশুদ্ধ। কেননা মুক্তাদীদেরও বসে পড়া তো জায়িয আছেই, তাই যদি তারা দাঁড়িয়ে পড়ে তবে সেটা তো আরও উত্তম।

---

[১] আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানাই*, খ. ১, পৃ. ২৯০

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجُوْزُ.

'আল হাসান থেকে, তিনি আবু হানিফা থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাত কোন কারণ ছাড়া বসে পড়ে, তবে তা জায়িয নেই।

মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক আলোচনা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে কোনো ওযর না থাকলে মুক্তাদীদের দাঁড়িয়ে পড়া মুস্তাহাব। কেননা তাদের জন্য বসা ও দাঁড়ানো উভয়ই জায়িয। অতএব দাঁড়িয়ে পড়াটা উত্তম—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে না-দাঁড়িনো মুস্তহাব। তাঁর নিকট এই মতপার্থক্যের কারণ হলো, তিনি ফরযে (ইমাম বসে পড়ালে মুক্তাদীদের দাঁড়ানোকে) বৈধতা দেন না, তাই নফলে তিনি মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি মানেন না।[১]

মাসআলা: তারাবীহে মুক্তাদীদের বসে থাকা, যখন ইমাম সাহেবের রুকু করার সময় হয় তখন দাঁড়ানো মাকরুহ। কেননা এতে অলসতার প্রকাশ ঘটে এবং মুনাফিকদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়।[২] আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ

'যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত অলসভাবে।'[৩]

অনুরূপভাবে যদি অতিরিক্ত তন্দ্রা হয় তবে তন্দ্রাবস্থায় সালাত আদায় মাকরূহ। বরং সালাত স্থগিত রাখবে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত। তন্দ্রাবস্থায় সালাতে দুর্বলতা, অলসতা ভর করে এবং ধ্যান-ধারণার শক্তি লোপ পায়।[৪]

অনুরূপভাবে গরমের কারণে ছাদে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রেও। যেমন– আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا۟ يَفْقَهُونَ ۝

'বলুন হে নবী! জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত গরম, যদি তারা তা বুঝতো।'[৫]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শুধু রামাযানে বিতর জামাআত-সহকারে পড়া উত্তম, এর ওপর মুসলিম উম্মার ঐকমত্য রয়েছে। তবে এটি সর্বোত্তম কিনা সে-ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে বলেছেন, জামাআত-সহকারে পড়া সর্বোত্তম।

---

[১] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৪৩–২৪৪
[২] ইবনে মাযা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৬৭
[৩] আল-কুরআন, *সুরা আন-নিসা*, ৪:১৪২
[৪] ইবনে মাযা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৬৭
[৫] আল-কুরআন, *সুরা আত-তাওবা*, ৯:৮১

অন্যরা বলেছেন, সর্বোত্তম হলো নিজ বাড়িতে একাএকা বিতর আদায় করা। এটিই পছন্দসই। কেননা সাহাবা ﵃ জামাআত-সহকারে বিতর পড়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মত ছিলেন না। যেমনটি তারাবীহের ব্যাপারে তাঁরা সর্বসম্মত ছিলেন। *আত-তাবয়ীন*[১] ও ইমাম ইবনুল হুমাম ﵀-কৃত *আল-হিদায়ার* ব্যাখ্যাগ্রন্থ[২] ও *আল-ইনায়ায়*[৩] এ-রকমই আছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তারাবীহের পরপরই জামাআত-সহকারে বিতর পড়ে নেবে। তবে যে-ব্যক্তি তাহাজ্জুদ আদায় করে সে পড়বে তাহাজ্জুদের পরে।

আর ইমাম সাহেব রামাযানের বিতরের তিন রাকাআতেই কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। একাকিভাবে আদায়কারীর ইখতিয়ার আছে (উচ্চৈঃস্বরে কিংবা অনুচ্চ স্বরে সে পড়তে পারে)।

কুনূতের দুআর ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। আর কেউ কেউ বলেছেন, অনুচ্চ স্বরে পড়বে। তবে (উচ্চৈঃস্বরে পড়ার ক্ষেত্রে) এর আওয়াজ কিরাআত থেকে অনুচ্চ হতে হবে।

কুনূতের দুআ পড়ার সময় উভয় হাত বাঁধবে, না ছেড়ে দেবে—এ-বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আর মুক্তাদীদের ভূমিকা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

কেউ কেউ বলেন, কুনূতের দুআ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ পর্যন্ত পড়বে। তখন মুক্তাদীগণ নিশ্চুপ থাকবে। আর কেউ বলেন, আমিন বলবে। কেউ কেউ বলেছেন, মুক্তাদীদের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে, চাইলে সে কুনূত পড়বে কিংবা আমিন বলবে।

আত-তাবয়ীনে আছে, বিতরে কুনূতের পাঠক তার কুনূতে ইমামের অনুসরণ করে আস্তে আস্তে কুনূত পড়বে। কেননা কুনূত আসলে একটি দুআ। কেউ কেউ বলেন, উচ্চৈঃস্বরে পড়বে।

কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম মুহাম্মদের মতে কুনূত পড়বেন ইমাম সাহেব, মুক্তাদীগণ পড়বে না। যেমন– তারা কিরআত পড়ে না। প্রথম মতটি সঠিক।[৪]

---

১ ফখরউদ্দিন আয-যায়লায়ী, *তাবয়ীনুল হাকায়িক*, খ. ১, পৃ. ১৮০

২ ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কদীর*, খ. ১, পৃ. ১৮০

৩ আল-বাবারতী, *আল-ইনায়া*, খ. ১, পৃ. ৪৭০

৪ ফখরউদ্দিন আয-যায়লায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৭১

মাসআলাঃ যদি কারো এক বা দু'তারবিয়াহ (চার রাকাতের তারাবীহ) ছুটে যায়, অথচ ইমাম বিতর আরম্ভ করেছেন—আলিমদের মাঝে মতভিন্নতা আছে।

কেউ কেউ বলেছেন, সে ইমামের সাথে বিতর আদায় করে, তারপর ছুটে যাওয়া তারাবীহ পড়বে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, আগে কাযা পড়বে।[১]

মাসআলাঃ মুক্তাদী কুনূত পড়া শেষ করার আগেই যদি ইমাম রুকুতে চলে যান, তবে মুক্তাদীও ইমাম সাহেবের অনুসরণ করবে। কেননা কুনূতের ওপর সালাত নির্ভর করে না এবং ঠেকে থাকে না।[২]

মাসআলাঃ বিতরের সালাতে মাসবুক (রাকাআত বিশেষ হারানো লোক) যদি ইমামের সাথে কুনূত পড়ে নেয়, ছুটে যাওয়া সালাত আদায়ের সময় পুনরায় কুনূত পড়বে না।[৩]

মাসআলাঃ যদি মুসল্লীরা অভিযোগ করে যে, তারা সালাত নয় বা দশ সালাম তবে সেসময়ের করণীয় সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

অনেকে বলেছেন, সর্তকতার জন্য জামাআত-সহকারে এক সালামের সালাত পুনরায় আদায় করবে।

আর কেউ কেউ বলেছেন, অতিরিক্ত পড়বে না। কারণ শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তারাবীহে অতিরিক্ত পড়া না-জায়িয।

সঠিক মত হলো, একাকিভাবে এক সালামের সালাত আদায় করে নেবে তারা। এতে করে সুন্নাতের আমল পরিপূর্ণ হবে এবং তারাবীহ ছাড়া জামাআত-সহকারে নফল আদায়ের আশঙ্কা থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।[৪]

মাসআলাঃ যদি দু'জন ইমাম এক তারবিয়াহ (চার রাকাআত); প্রত্যেকে এক সালাম করে পড়ান তবে সে-সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। সঠিক মতে এটি মুস্তাহাবের বরখেলাপ। তবে পুরো এক তারবিয়াহ (চার রাকাআত) এক ইমাম পড়াতে পারবেন। হারামাইনের অধিবাসী ও অন্যান্যরা এর ওপরই আমল করেন। এতে ইমাম পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্রাম হয়ে যায়।[৫]

---

[১] আল-হাদ্দাদী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৯

[২] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৭

[৩] ইবনুল হুমাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫২০

[৪] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৯

[৫] আল-কাসানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৮৯

অষ্টম পরিচ্ছেদ : তারাবীর ওয়াক্ত

এ-বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতবিভিন্নতা রয়েছে।

আমাদের হানাফী আলিমরা বিশেষত শায়খ ইসমাইল আয-যাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, পুরো রাত—ফজর উদয় পর্যন্ত, ইশার পূর্ব-পর এবং বিতর পড়ার পূর্ব-পর তারাবীহের সময়। কেননা তারাবীহ হলো রাত জেগে ইবাদত করার নাম। আর এর জন্য শর্ত হলো রাত। ব্যস।

বুখরার সর্বজন আলিমগণ বলেছেন, তারাবীহের ওয়াক্ত ইশা ও বিতরের মাঝখানে। অতএব কেউ যদি ইশার আগে বা বিতরের পরে তারাবীহ পড়ে তাহলে তা সময় মতো পড়া হয়নি। কেননা হাদীসে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তাই তারাবীহে হাদীসেরই অনুসরণ করতে হবে।

সঠিক মতে তারাবীহের ওয়াক্ত হলো ইশার পর থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। তাই কেউ যদি বিতরের পর তারাবীহ পড়ে তবুও জায়িয হবে। তবে যদি ইশার পূর্বে তারাবীহ পড়ে তাহলে জায়িয হবে না। কেননা তারাবীহ হচ্ছে নফল ইশার পরের সুন্নত। অতএব রামাযান ছাড়া অন্য সময়ের ইশার পরের মাসনুন নফলের সাথে এর সাদৃশ্য হয়ে গেলো।[১]

সালাত বিতরের পরে পড়াও জায়িয আছে। মোট কথা হলো বিতর রাতের শেষ সালাত হওয়া সর্বোত্তম। যেমন- ইতঃপূর্বে প্রয়োজনীয় স্থানে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুস্তাহাব হলো রাতের এক তৃতীয় প্রহর বা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দেরিতে তারাবীহ পড়া।

কেউ কেউ বলেছেন, রাতের দ্বিপ্রহর পর তারাবীহ পড়লে ইশার সালাত দেরিতে পড়ার ন্যায় মাকরূহ হবে।

সঠিক মতে তারাবীহ দেরিতে আদায়ে মাকরূহ হবে না। কেননা তারাবীহ রাতের সালাত আর তা শেষ সময়ে পড়াই উত্তম।

ফাতাওয়া কাযিখানে আছে, রাতের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দেরি করে তারাবীহ পড়া মুস্তাহাব। আরও অনেকে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং এটিই সঠিক।[২]

আল-খুলাসা গ্রন্থে আছে, উত্তম হলো পুরো রাত সালাত আদায়, অপেক্ষা ও বিশ্রাম গ্রহণের মাধ্যমে কাটানো, যদিও রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত দেরি করতে হয়। এমনটি সঠিক এবং জায়িয, আদৌ মাকরূহ নয়।[৩]

---

[১] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৫

[২] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৫-২৩৬

[৩] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৬

মাসআলাঃ যদি তারাবীহ ছুটে যায় তবে কি তা তারাবীহের অন্য সময়ে জামাআত-সহকারে পড়বে, না জামাআত ছাড়া পড়বে? উত্তর হলো, জামাআত-সহকারে কাযা করবে না। অবশ্য জামাআত ছাড়া কাযার ক্ষেত্রে আলিমদের মতভেদ রয়েছে।

অনেকে বলেছেন, রামাযান শেষ না-হওয়ার আগেই কাযা করবে। আর অনেকে বলেছেন, কোনো কাযা করবে না।[1]

এটিই সঠিক। যেহেতু তারাবীহ মাগরিব ও ইশার সুন্নাতের চেয়ে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর এ-ধরনের সালাত একাকিভাবে আমাদের মতে কাযা করা যায় না। অতএব তারাবীহ এ-রকমই। এর প্রমাণ হলো, সর্বসম্মতভাবে জামাআত-সহকারে তারাবীহের কাযা নেই। যদি তারাবীহের কাযা হতো তবে যেভাবে ছুটে যায় সেভাবে কাযা করতে হতো। অতএব যদি তারাবীহ একাকিভাবে কাযা করা হয় তবে মুস্তাহাব হবে। যেমন– মাগরিবের সুন্নাত যদি কাযা করা হয়।[2]

শায়খ কাসিম আল-হানাফী ﵀ অনুরূপ বলেছেন, তিনি *সুনান আল-হুদায় আস-সিরাজিয়া* থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি একাকিভাবে কাযা করে তবে উত্তম কাজ হবে।

তারাবীহের মাসায়িল সমাপ্ত হলো।

---

[1] আল-যাহাদী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৯
[2] কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৬

মাহে শাওয়াল

হজের প্রধান মাসসমূহের মধ্যে শাওয়াল একটি মহিমান্বিত মাস। এটিকে ফিতরের মাস বলা হয়। এ-মাসে ইদ ও গোনাহ মাফের দিন রয়েছে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ، إِنَّهُ كَانَ يَوْمُ الْعِيْدِ بَاهَى اللهُ تَعَالَىٰ بِعِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ مَلَائِكَتَهُ، فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِيْ! مَا جَزَاءُ أَجِيْرٍ وَّفَّىٰ عَمَلَهُ؟، قَالُوْا: رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوْفَىٰ أَجْرَهُ، قَالَ: يَا مَلَائِكَتِيْ! مَا جَزَاءُ عَبِيْدِيْ وَإِمَائِيْ؟ قَضَوْا فَرِيْضَتِيْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوْا يَعِجُّوْنَ إِلَيَّ الدُّعَاءَ، وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكَرَمِيْ وَعُلُوِّيْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِيْ لَأُجِيْبَنَّهُمْ، فَيَقُوْلُ: ارْجِعُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، قَالَ: فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَّهُمْ'.

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক ﷺ) থেকে বর্ণিত, ঈদের দিন আসলে আল্লাহ তাআলা নিজের সৎ বান্দাদের নিয়ে গর্বভরে ফেরেশতাদের বলেন, হে ফেরেশতা! সেসব শ্রমিকের প্রতিদান কী হওয়া উচিৎ, যে তার কাজ পুরো করে'? তারা বললেন, হে প্রভু! তাদের প্রতিদান হলো তাদের পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া। আল্লাহ বলেন, 'হে ফেরেশতারা! আমার এসব বান্দা ও গোলামদের প্রতিদান কী দেওয়া যেতে পারে যারা আমার ফরয যা তাদের ওপর দায়িত্ব ছিলো পালন করছে, অতঃপর বের হয়ে আমার কাছে ডেকে ডেকে দুআ করছে। আমার সম্মান, আমার প্রতাপ, আমার মর্যাদা, আমার পরাক্রম ও উচ্চাসনের শপথ! আমি তাঁদের প্রার্থনা কবুল করে নেবো।' তিনি আরও বলেন, 'ফিরে যাও! তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম, তোমাদের পাপকে পুণ্য দ্বারা বদলে দিলাম। (হযরত আনাস

ইবনে মালিক رضي الله عنه) বলেন, সত্যিই তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে।'

হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী رحمه الله শুআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।[1]

ঈদের দিন ঈদগাহে রওয়ানা হবার পূর্বে কিছু খেয়ে নেওয়া সুন্নত। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বেজোড় কয়েকটি খেজুর খেয়ে নিতেন।

হযরত আনাস (ইবনে মালিক رضي الله عنه) থেকে ইমাম আল-বুখারী رحمه الله-এর বর্ণনা এ-রকম এসেছে।[2] ইমাম আল-হাকিম رحمه الله বর্ণনা করেন,

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، كَانَ يَأْكُلُ ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.

'হযরত ওতবা ইবনে হুমায়দ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি (নবী করীম ﷺ) ৩ বা ৫ বা ৭টি কিংবা কম-বেশি খেজুর খেতেন।'[3]

মুহাদ্দিসগণ বলেন, খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব—এর হিকমত হলো খেজুর মিষ্টান্ন জিনিস। আর মিষ্টি সিয়াম পালনে দুর্বল দৃষ্টিকে শক্তিশালী করে। তা ছাড়া শিন্নি আত্মাকে কোমল করে এবং বিশ্বাসঋদ্ধ মস্তিষ্কের জন্য খুব উপাদেয়। এজন্য বলা হয়, মুমিনরা মিষ্টভাষী।

যদি কেউ শিন্নি খেতে স্বপ্নে দেখে তবে তার ব্যাখ্যা হলো সে শিগগিরই ঈমানের স্বাদ ভোগ করবে। সে কারণে মধু ও খেজুরের ন্যায় শিন্নি দিয়েও ইফতার করা উত্তম। যদিও খেজুরে পুষ্টিগুণ পর্যাপ্ত বিশেষত মদীনার খেজুরে। উপর্যুক্ত আলোচনার সারকথা হলো ৩ বা ৫ কিংবা ৭টি খেজুর খেয়েই ঈদগাহে যাবে।

এ-মাসের বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ছয় দিনের সিয়াম পালন। ইমাম মুসলিম رحمه الله তাঁর *সহীহে* বর্ণনা করেছেন:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

---

[1] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ২৯০, হাদীস: ৩৪৪৪

[2] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১৭, হাদীস: ৯৫৩

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ».

'আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটি খেজুর খেতেন'।

[3] আল-হাকিম, *মাস্তক*, খ. ১, পৃ. ৪৩৩, হাদীস: ১০৯০

'হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে-ব্যক্তি রমযানে সিয়াম পালন করলো, অতঃপর শাওয়ালের ছয় তার অনুকরণ করলো, সে তো পুরো জীবন সিয়াম পালন করলো।'"[১]

যদি সে পুরো জীবন এ-ধরনের সিয়াম পালন করে সে-ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। আর যদি সে একমাসেই মাত্র সিয়াম পালন করে তবে তা এক বছর সিয়াম পালনের ন্যায় হবে। এ-অর্থেই হযরত সাওবান ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম ইবনে মাজাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন।[২]

অন্য একটি বর্ণনায় ثُمَّ-সহকারে ثَلَاثَ এসেছে। তাই এখানে প্রকৃত ধারাবাহিকতা উদ্দেশ্য নয়। কারণ এতে ঈদের দিনও সিয়াম পালন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অতএব মাসের প্রথম ও শেষ দিকে সিয়াম পালন করলেও সুষ্ঠ হবে।

ইমাম আশ-শাফিয়ী ﷺ-এর কাছে পছন্দসই হলো মাসের প্রথম থেকে লাগাতার পালন করা। আমাদর মতে সাধারণভাবে পালিত হবে।

ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল ﷺ)-এর মতও অনুরূপ। বরং তারা বলেছেন যে, আমাদের মতে তা মাকরূহ হওয়া এবং খ্রিস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য হওয়া থেকে অনেক দূরে।

দুই ঈদের দিন গোসল করা সুন্নত বলে ফকীহগণ মত ব্যক্ত করেছেন। সম্মিলিন হিসেবে জুমুআর ওপর কিয়াস করে এটি প্রমাণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে হযরত ফাকিহ ইবনে সা'দ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে—যিনি নবী করীম ﷺ-এর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তবে এই হাদীসটি ছাড়া তাঁর ব্যাপারে আর কিছু জানা যায় না—তিনি বলেন,

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮২২, হাদীস: ২০৪ (১১৬৪)

[২] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫৪৭, হাদীস: ১৭১৫

عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ»

"আল্লাহর রাসূল ﷺ ক্রীতদাস সাওবান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, 'ঈদুল ফিতরের পর ছয়দিন সিয়াম পালন করে তা পুরো বছরের সিয়াম পালনের ন্যায় হবে।"

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতর-দিবস, আযহা-দিবস ও আরাফা-দিবসে গোসল করতেন।

হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ رحمه الله তাঁর *সুনানে*[1], ইমাম আত-তাবারানী رحمه الله রচিত *মু'জামুল (কবীরে)*[2], ইমাম আল-বাযযার رحمه الله তাঁর *মুসনদে* বর্ণনা করেছেন এমনটি।

ইমাম আশ-শুমুন্নী رحمه الله ও ইমাম ইবনুল হুমাম رحمه الله বলেছেন, এ-হাদীসটি দুর্বল। ইমাম আন-নাওয়াওয়ী رحمه الله প্রমুখও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[3] *কিতাবুল খারকীর* ব্যাখ্যাগ্রন্থেও[4] এ-হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলেছেন, হযরত ফাকিহ ইবনে সা'দ رضي الله عنه এই দিনসমূহে তাঁর পরিবারকে গোসল করতে নির্দেশ দিতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, হাদীসটি ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ رحمه الله তাঁর *মুসনদে*[5] ও ইমাম ইবনে মাজাহ رحمه الله[6] বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আস-সুয়ুতী رحمه الله *জামউল জাওয়ামি'য়ে* বর্ণনা করেছেন,

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ لِقَوْمٍ: رَأَيْتُ مِنْكُمْ كُلُّ فَعَلَ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تَغْتَسِلُوْنَ فِي الْعِيْدَيْنِ.

'ইমাম আশ-শা'বী رحمه الله থেকে বর্ণিত আছে, হযরত যিয়াদ ইবনে আয়ায আল-আশআরী رضي الله عنه বর্ণনা করেন, তিনি একদল লোক সম্পর্কে বলেন, তাদের প্রত্যেকে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা করতে দেখেছি তার সবই পালন করতে দেখেছি কিন্তু তাদের কেউ দু'ঈদে গোসল করতেন না।'

---

[1] ইবনে মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪১৭, হাদীস: ১৩১৬
[2] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, খ. ৭, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৭২০০
[3] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মাজমু' শরহুল মুহাযযাব*, খ. ৫, পৃ. ৭
[4] আয-যারকাশী, *শারহুয যারকাশী আলা মুখতাসারিল খারকী*, খ. ২, পৃ. ২১৫, হাদীস: ৯০৪
[5] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ. ২৭, পৃ. ২৭৭, হাদীস: ১৬৭২০
[6] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪১৭, হাদীস: ১৩১৬

এটি ইমাম ইবনে মুনদা (রহ.) ও ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.)[1] বর্ণনা করেছেন। (ইমাম আস-সুয়ুতী (রহ.)) বলেন, হযরত আয়াম (রা.)-এর সূত্র হাদীসটি বিশুদ্ধ। তবে যিয়াদ নিরাপদ নন।

অনেক মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি দুর্বল বলে হুকুম দিয়েছেন। ছয় বিশিষ্ট কিতাবে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি আমল ছাড়া এ-ধরনের কোনো হাদীস পাওয়া যায় না।

أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

'তিনি ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।'[2]

মুহাদ্দিসবর্গ বলেন, হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব (রা.)) নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাতের কঠোর অনুসারী। এজন্য হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে দাবি রাখে।

ঈদগাহে যাওয়ার পথে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়া তিন বিশিষ্ট ইমামের মতে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে সুন্নত।

তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এটি ঈদ আল-আযহার সুন্নাত, ফিতরের নয়।

উচ্চৈঃস্বরে পড়ার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। যদি অনুচ্চ স্বরে তাকবীর পড়া হয় তবে তাই ভালো। আর আল্লাহর স্মরণ সর্বসময়েই মুস্তাহাব। বলাবাহুল্যে আমাদের বোঝা হয়ে গেলো যে, মতপার্থক্য মূল তাকবীরকে কেন্দ্র করে।

অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়ার বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে। যেমন– ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে আছে।[3]

ইমামবর্গ ইমাম আদ-দারাকুতনী (রহ.) বর্ণিত একটি হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى.

---

[1] ইবনে আসাকির, *তারিখু দামিশক*, খ. ৪৭, পৃ. ২৫১–২৫২, হাদীস: ৫৪৮৪

[2] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ২, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ৬০১

[3] ইবনুল হুমাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭২

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবীর পড়তেন।'[১]

ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.) বলেন, হাদীসটি মরফু হওয়া নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে এ-কথা সত্যি যে, হাদীসটি হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর (রা.)-এর ওপর মাওকুফ।

শায়খ ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেছেন, এ-হাদীসটি তার অন্যতম বর্ণনাকারী হযরত মুসা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আতা (রহ.)-এর দিক থেকে দুর্বল। তা ছাড়া হাদীসটি উচ্চৈঃস্বরে পড়তে বোঝায় না। আর কোনো সাহাবার বক্তব্যে وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ[২] আয়াতের সাধারণ অর্থের বিপরীত হতে পারে না।[৩]

আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّاسَ يُكَبِّرُوْنَ، فَسَأَلَ مَنْ كَانَ يَقُوْدُ جَمَلَهُ هَلْ كَبَّرَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: لَا! قَالَ: أَدْرَكْنَا مِثْلَ هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি লোকজনকে তাকবীর পড়তে শুনে তাঁর উটচালককে জিজ্ঞেস করলেন, ইমাম কী তাকবীর বলেছেন? সে বলল, না! তিনি বললেন, আমরা এ-ধরনের অনেক দিবসে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্য লাভ করেছি। কিন্তু আমাদের কেউ ইমামের আগে তাকবীর বলতেন না।'[৪]

ইমাম আবু জাফর (রহ.) বলেন, সাধারণ মানুষকে তাকবীর পড়তে বারণ না করা উচিৎ। কেননা তাদের ভালো কাজে উৎসাহ কম।[৫]

---

[১] আল-বায়হাকী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩৮০, হাদীস: ১৭১৪
[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-আ'রাফ*, ৭:২০৫
[৩] ইবনুল হুমাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭২
[৪] ইবনুল হুমাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭২
[৫] ইবনুল হুমাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭২

ঈদের দিন ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করা সুন্নাত: বেরুবে এক রাস্তা দিয়ে এবং ফিরে আসবে অন্য রাস্তা দিয়ে। ইমাম আল-বুখারী ﷺ বর্ণনা করেছেন,

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.

'হযরত জাবির (ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদের দিন ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করতেন।'[১]

ইমাম আত-তিরমিযী ﷺ ও ইমাম আদ-দারিমী ﷺ বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ.

'হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন এক পথে যেতেন, অন্য পথে ফিরতেন।'[২]

আলিমরা বলেছেন যে, এই প্রক্রিয়ার মাঝে অনেক দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম-রহস্য রয়েছে। আমরা *নফরুস সাআদায়* বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এটি শুধু ইমামের জন্য, না সব মানুষের জন্যে প্রযোজ্য—এ নিয়ে মতভেদ আছে।

রইলো ঈদের সালাতের আগে-পরে সালাত পড়ার বিধানের আলোচনা; এ-বিষয়ে লোকদের অবগত করা দরকার।

ইমাম আল-বুখারী ﷺ, ইমাম মুসলিম ﷺ,ইমাম আবু দাউদ ﷺ,ইমাম আত-তিরমিযী ﷺ ও ইমাম আন-নাসায়ী ﷺ বর্ণনা করেছেন যে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন বের হন, অতঃপর দু'রাকআত সালাত

---

[১] আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ২৩, হাদীস: ৯৮৬

[২] (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ২, পৃ. ৪২৪, হাদীস: ৫৪১; (খ) আদ-দারিমী, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১০০৪, হাদীস: ১৬৫৪

আদায় করেন, তবে তার পূর্বাপর কোনো সালাত আদায় করেননি।'[১]

আল-হাদীস। ইমাম আত-তিরমিযী ﷺ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ ও আবু সাঈদ (আল-খুদরী ﷺ)-এর বর্ণনা মতে, নবী করীম ﷺ-এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাঁদের পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এর ওপর আমল করতেন। আলিমদের একটি দল অবশ্য ঈদের সালাতের আগে ও পরে সালাত আদায় জায়িয দিয়েছেন। তবে প্রথম মতটিই সঠিক।[২]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ﷺ-এর মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব *আল-খারকীর* ব্যাখ্যায় বলেছেন,

اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ أَبَا مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى النَّاسِ، فَخَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ.

'হযরত আলী ﷺ হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী ﷺ-কে লোকজনের ওপর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন, অতঃপর তিনি ঈদের দিবসে বেরুলেন এবং বললেন, হে লোকসকল! নিশ্চয় ইমামের আগে কোনো সালাত আদায় সুন্নাত নয়।'[৩]

এটি ইমাম আন-নাসায়ী ﷺ বর্ণনা করেছেন।[৪]

ইমাম ইবনে সিরীন ﷺ বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَّحُذَيْفَةَ قَامَا، وَنَهَيَا النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوْا يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ إِلَى الْمُصَلَّى.

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২৪, হাদীস : ৯৮৯; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬০৬, হাদীস : ১৩ (৮৮৪); (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৪২৪, হাদীস : ৪৫১; (ঘ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৪১৭, হাদীস : ৫৩৭; (ঙ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ১, পৃ. ৩০১, হাদীস: ১১৫৯

[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৪১৭

[৩] আয-যারকাশী, *প্রাগুক্ত* খ. ২, পৃ. ২৩১, হাদীস: ৮০৪

[৪] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১৮১, হাদীস: ১৫৬১; হযরত সা'লাবা ইবনে যাহদাম ﷺ থেকে বর্ণিত

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসঊদ ﷺ ও হযরত হুযায়ফা ﷺ দাঁড়ালেন এবং লোকজনকে ঈদের দিন ইমাম ঈদগাহে আসার পূর্বে সালাত আদায় থেকে বারণ করতেন।'[1]

এটি সাঈদ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আয-যুহরী ﷺ বলেছেন,

مَا سَمِعْتُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَائِنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَسْلَافِ هَذِهِ الْأُمَّةِ صَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، أَوْ بَعْدَهَا.

'আমি আমাদের কোনো আলিমকে এ-উম্মার পূর্বসূরিরা ঈদের সালাতের আগে বা পরে কোনো সালাত পড়েছেন মর্মে বলতে শুনিনি।'[2]

এটি হযরত আল-আসরাম ﷺ বর্ণনা করেছেন।

এ-নিষেধাজ্ঞা কি শুধু ঈদগাহের সাথে সম্পৃক্ত, নাকি ঈদগাহ ও সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য—এ নিয়েও মতভেদ আছে।

অনেকে বলেছেন, যদি ঈদগাহ ব্যতীত অন্যত্র সালাত আদায় করলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

'হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সালাতের পূর্বে কোনো সালাত আদায় করতেন না। ঘরে ফিরে দু'রাকাআত সালাত আদায় করতেন।'

হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ ﷺ[3] ও ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল ﷺ)[4] বর্ণনা করেছেন।

আল-হিদায়ায় আছে, ঈদগাহে ঈদের সালাতের পূর্বে নফল পড়া যাবে না। অতএব বিশেষভাবে ঈদগাহে সালাতই মাকরূহ।[5]

---

[1] আয-যারকাশী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৩১, হাদীস: ৯৩৫

[2] আয-যারকাশী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৩১, হাদীস: ৯৩৬

[3] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪১০, হাদীস: ১২৯৩

[4] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৭, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ১১২২৬ ও পৃ. ৪৫২, হাদীস: ১১৩২৫

[5] আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ৮৫

যাঁরা জায়িয বলে মত দেন তারা বলেন, এটিও সাধারণভাবে সালাতের ওয়াক্ত। তাই এতে মাকরূহের কিছু নেই।

যাঁরা নিষিদ্ধের পক্ষে তারা বলেন, যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এ-ধরনের সালাত পড়েননি। যে তাঁকে অনুসরণ করে সেই হিদায়তপ্রাপ্ত।

বস্তুত ঈদের সালাতের পূর্বাপর কোনো সুন্নাতের কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য অনেকে জুমুআর ওপর কিয়াস করে থাকেন। পক্ষান্তরে মাকরূহ সময় ছাড়া সাধারণভাবে নফল পড়া নিষেধ—এ-বিশেষটাও বিশেষ দলিলে প্রমাণিত নয়।[১]

অতঃপর জেনে রাখুন! ছুটে যাওয়া ঈদের সালাত নিয়ে আলিমদের মতভেদ আছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর স্পষ্ট মাযহাব হলো, ঈদের সালাতের কোনো কাযা নেই। কেননা এই সালাতটি এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্যভাবে প্রমাণিত নয়।

হিদায়ার কতিপয় ব্যাখ্যাগ্রন্থে আছে, যুহার সালাতের মতো ইচ্ছে মাফিক দুই বা চার রাকআত সালাত পড়ে নেবে, যেমন– অন্যান্য দিনে পড়া হয়।[২]

আল-মুহীত ও *ফাতাওয়া কাযীখানে* আছে, যে-ব্যক্তি ঈদগাহে পৌঁছে ইমামের সাথে সালাত না পায় তবে ইচ্ছে করলে নিজের ঘরে ফিরে যাবে, ইচ্ছে হলে সালাত পড়ে তবেই ফিরবে। সর্বোত্তম হলো চার রাকআত পড়ে নেবে এতে তার যুহার সালাত আদায় হয়ে যাবে। যেমন– হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

مَنْ فَاتَ عَنْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

'যে-ব্যক্তির ঈদের সালাত ছুটে যায় সে চার রাকআত সালাত পড়ে নেবে।'[৩]

ফতহুল বারী গ্রন্থে এ-রকমই এসেছে।[৪]

---

[১] ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ২, পৃ. ৪৭৬

[২] আল-আইনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১২০

[৩] (ক) ইবনে বাত্তা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১১২; (খ) কাযী খান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮৪

[৪] ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ৯, পৃ. ৭৭

وَقَـرَأَ فِيْهَـا فِي الرَّكْعَـةِ الْأُوْلَى: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ ﴾ [الأعلى]، وَفِي الثَّانِيَـةِ : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝ ﴾ [الشمس]، وَفِي الثَّالِثَـةِ: ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ۝ ﴾ [الليل]، وَفِي الرَّابِعَةِ : ﴿ وَالضُّحٰى ۝ ﴾ [الضحى].

وَرَوَى ابْـنُ مَسْعُوْدٍ فِيْ هَـذَا مِـنْ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ وَعْـدًا جَمِيْلًا، وَثَوَابًا جَزِيْلًا.

'আর এর প্রথম রাকাআতে সূরা আল-আলা, দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা আশ-শামস, তৃতীয় রাকাআতে সূরা আল-লায়ল এবং চতুর্থ রাকাআতে সূরা আয-যুহা পড়বে।'

এ-ব্যাপারে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ ﷺ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে অতি উত্তম প্রতিদান ও সাওয়াবের সুসংবাদের কথা বর্ণনা করেছেন।[১]

ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল ﷺ)-এর মাযহাবেও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তারা দলিল হিসেবে হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ ﷺ-এর এই বর্ণনাটি পেশ করেন।[২] আর ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল ﷺ) বলেছেন, এতে হযরত আলী ﷺ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তাকে শক্তিশালী করে,

أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضُعَفَاءِ الْقَوْمِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِلَا تَكْبِيْرٍ وَّخُطْبَةٍ.

'এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, সম্প্রদায়ের দুর্বল লোকদের সাথে তাকবীর ও খুতবা ছাড়া চার রাকাআত সালাত আদায় করতে।'

ইমাম আল-বুখারী ﷺ অধ্যায়ের শিরোনামে উল্লেখ করেছেন যে,

أَنَّ أَنَسًا جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ فِي الزَّاوِيَةِ مَوْضِعٍ عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنَ الْبَصْرَةِ، وَصَلَّى صَلَاةَ الْعِيْدِ بِجَمْعِ أَهْلِ السَّوَادِ وَيُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيْدِ مَعَ الْإِمَامِ،

---

[১] ইবনে মাজা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১১২

[২] ইবনে মাজা, *প্রাগুক্ত*

'হযরত আনাস (ইবনে মালিক (রহ.)) তাঁর পরিবার-পরিজনকে বসরা থেকে দুই কিলোমিটার দূরে যাবিয়া এলাকায় সমবেত করলেন এবং আশ-পাশের লোকজনের সাথে ঈদের সালাত আদায় করলেন। তারা ইমামের সাথে ঈদের সালাতের মতো আরও দু'রাকাআত সালাত আদায় করতো।'[১]

ইমাম আল-কিরমানী (রহ.) বলেছেন, যদি ইমামের সাথে ঈদের সালাত ছুটে যায় তবে ইমাম মালিক (ইবনে আনাস (রহ.)) ও ইমাম আশ-শাফিয়ী বলেছেন, দু'রাকাআত সালাত পড়ে নেবে।

আর ইমাম আহমদ (ইবনে হাম্বল (রহ.)) বলেছেন, চার রাকাআত পড়বে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে তার ইখতিয়ার আছে, ইচ্ছে করলে পড়বে, ইচ্ছে করলে পড়বে না। এই অবস্থায় দুই কিংবা চার রাকাআত সালাত আদায়ের ইখতিয়ার আছে তার। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

---

[১] আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ২৩; কিতাব: ১৩, বাব: ২৫

মাহে যিলহজ্জ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَال: «وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ». قَالُوا : وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'দিনসমূহে এমন কোনো সময় নেই; যার অসংখ্য পূণ্যকর্ম আল্লাহর দরবারে দশই যুল হজের থেকে বেশি পছন্দের। সাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও কি সমান প্রিয় নয়? তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয়।' সাহাবারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদও কি সমান প্রিয় নয়? 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে-ব্যক্তি জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তার জিহাদে গিয়ে সেখান থেকে কিছু না নিয়ে ফেরে সে অবশ্য প্রিয়।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﷺ বর্ণনা করেছেন।[1] ইমাম ইবনে আওয়ানা ﷺ-এর *সহীহে* ও ইমাম ইবনে হিব্বান ﷺ-এর *সহীহে* বর্ণিত এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ، «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ»

'হযরত জাবির (ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ) থেকে বর্ণিত, দশই যুল হজের চেয়ে উত্তম কোনো দিন নেই।'[1]

---

[1] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২০, হাদীস: ৯৬৯; শব্দ আল-বুখারীর নয়; (খ) আবু আওয়ানা, *আল-মুসতাখরাজ*, খ. ২, পৃ. ২৪৬ ও ২৪৭, হাদীস: ৩০১৯, ৩০২২ ও ৩০২৮; (গ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৩০, হাদীস: ৩২৪

আলিমরা বলেন, যে-ব্যক্তি বছরের উত্তম দিনসমূহে সিয়াম পালনের মান্নত করে তাহলে এ দশদিনই এর উদ্দেশ্যে হবে। যদি সকল দিনসমূহের মধ্যে কোনো উত্তম দিনে সিয়াম পালনের মান্নত করে তাহলে আরাফা-দিবসই এর উদ্দেশ্য হবে। আর যদি সপ্তাহের একটি উত্তম দিনে সিয়াম পালনের মান্নত করে তাহলে জুমুআবারই হবে এর উদ্দেশ্য।

মজার ব্যাপার হলো, এ-দশদিন ফযীলতপূর্ণ হয়েছে এতে আরফা-দিবস আছে বিধায়। আর রামাযানের দশরাত ফযীলতপূর্ণ হয়েছে সেখানে কদর-রজনী থাকার কারণে।

বাস্তব ব্যাপার হলো, যুল হজের প্রথম দশক তথা নয়টি দিনে সিয়াম পালন এবং এর ফযীলত ও মুস্তাহাব বিষয়েও অনেক হাদীস রয়েছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো। ইমাম আবু দাউদ رحمه الله ও ইমাম আন-নাসায়ী رحمه الله বর্ণনা করেছেন,

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، إِنَّهُ يَصُوْمُ تِسْعَةَ أَيَّامِ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَمِنْ أَوَّلِ الْإِثْنَيْنِ فِيْهِ، وَمِنْ أَوَّلِ الْخَمِيْسِ فِيْهِ.

'নবী করীম ﷺ-এর কোনো কোনো সহধর্মিণী থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ যুল হজের নয় দিন, আশুরা-দিবস, প্রতি মাসে তিনতিনটি এবং প্রথম সোমবার ও প্রথম বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন।'[২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

كَانَ يَصُوْمُ الْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ.

'নবী করীম ﷺ দশই যুল হজ ও প্রতি মাসের তিনদিন সিয়াম পালন করতেন।'[৩]

আর ইমাম মুসলিম رحمه الله, ইমাম আত-তিরমিযী رحمه الله ও ইমাম আবু দাউদ رحمه الله বর্ণনা করেছেন যে,

---

[১] (ক) আবু আওয়ানা, *আল-মুসতাখরাজ*, খ. ২, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ৩০২৩; (খ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ৯, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৩৮৫৩

[২] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ২৪৩৭; (খ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২২০, হাদীস: ২৪১৭

[৩] আন-নাসায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২২০, হাদীস: ২৪১৬

عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ.

'হযরত আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কখনো হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দশই যুল হজে সিয়াম পালন করতে দেখিনি।'[১]

এ-বর্ণনাটি উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা তিনি দেখেননি শুধু এ-খবরই তিনি দিয়েছেন। হয়তো হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিয়াম পালন সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না অথবা অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কিছু এতে প্রতিবন্ধক ছিলো।

(যুল হজের) এ-দশদিনে যেসব ভালো কাজের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা থেকে সিয়াম পালনের ফযীলতও সুসাব্যস্ত হয়ে যায়।

কিছু সুন্নাত আছে যা মানুষ একদম ছেড়ে দিয়েছে। যে-ব্যক্তি ফরয হোক বা নফল কুরবানির ইচ্ছা করে তার জন্য কুরবানি না দেওয়া পর্যন্ত চুল-নখ কাটা উচিত নয়।

ইমাম মুসলিম ﵀ বর্ণনা করেন,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

'হযরত উম্মে সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (যুল হজের) প্রথম দশক শুরু হয়, তখন যদি তোমাদের কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে থেকো তাহলে সে চুল-নখের কিছুই কাটবে না।'[২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

«فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَّلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا».

'তাহলে সে চুল মু-াবে না এবং নখ কাটবে না।'[৩]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

---

[১] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮৩৩, হাদীস: ৯ (১১৮৬); (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১২০, হাদীস: ৮৫৬; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ২৪৩৯

[২] মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৫৬৫, হাদীস: ৩৯ (১৯৭৭)

[৩] মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৫৬৫, হাদীস: ৪০ (১৯৭৭); হযরত উম্মে সালমা ﵂ থেকে বর্ণিত

«مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ».

'যে-ব্যক্তি যুল হজের চাঁদ দেখলো এবং কুরবানি করবে বলে ইচ্ছা করলো তবে সে নখ-চুল কাটবে না।'[১]

জামিউল উসূলে ইমাম মুসলিম রহ. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قَرِيبًا مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، فَطَّلَى -يَعْنِيْ تَنَوَّرَ جَمَاعَةٌ-، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: قَدْ يَمْنَعُوْنَ مِنْ هَذَا ثُمَّ لَقِيْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ الْحَمَّامِيْ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِيْ! هَذَا حَدِيْثٌ قَدْ نَسِيَهُ النَّاسُ وَتَرَكُوْهُ، حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ».

'হযরত আমর ইবনে মুসলিম ইবনে আম্মার আল-লায়সী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ঈদ আল-আযহা-দিবসের সময় হাম্মামে অবস্থান করছিলাম। এদিকে একদল লোক পরিচ্ছন্ন তথা অবাঞ্ছিত লোম পরিস্কার করছিলো। তখন হাম্মামে অবস্থিত কেউ বলল, এতো নিষেধ করা হয়েছে। তারপর আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর কাছে হাম্মামে অবস্থানকারী লোকদের কথা নিয়ে আলোচনা করি, তিনি বললেন, হে ভ্রাতষ্পুত্র! একথা তো মানুষ ভুলেই গেছে এবং তারা পরিত্যাগ করে চলেছে। নবী করীম ﷺ-এর পবিত্রাত্মা সহধর্মীণী উম্ম সালমা রাযি. আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে-ব্যক্তি যুল হজের চাঁদ দেখলো... ।''[২]

---

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ১০২, হাদীস: ১৫২৩: হযরত উম্মে সালমা রাযি. থেকে বর্ণিত

[২] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৫৬৬, হাদীস: ৪২ (১৯৭৭); (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৩, পৃ. ৩৭৮, হাদীস: ১৬৯৬

আল-হাদীস। সর্বোত্তম আরাফা, না জুমুআবার—তা নিয়ে মতভেদ আছে।

কেউ কেউ বলেছেন, আরাফা বছরের দিনসমূহের মধ্যে উত্তম আর জুমুআ সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্যে উত্তম। এর বিস্তারিত প্রমাণাদি *সফরুস সাআদা* গ্রন্থে জুমুআ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

আরফা-দিবসে সিয়াম পালন; সার্বজনীন মতানুযায়ী আরাফা-দিবসে সিয়াম পালন সুন্নাত।

আর কেউ কেউ বলেছেন, আরফায় অবস্থানকারী ছাড়া অন্যদের জন্য সুন্নাত।

وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ.

'হযরত উম্মুল ফযল বিনতুল হারিস ﷺ থেকে বর্ণিত, আরাফা-দিবসে কিছু লোক তাঁর কাছে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিয়াম পালনের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি করছিলো। কেউ বলছিলো, তিনি সিয়াম পালন করছেন। আর কেউ বলছিলো, তিনি সিয়াম পালন করছেন না। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এক পিয়ালা দুধ পাঠিয়েছিলাম, সেসময় তিনি উঠের ওপর সওয়ার ছিলেন এবং তিনি তা পান করলেন।'

ইমাম আল-বুখারী ﷺ[১] ও ইমাম মুসলিম ﷺ[২]-বর্ণিত। হযরত মায়মুনা ﷺ থেকেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১৬২, হাদীস: ১৬৬১ ও খ. ৩, পৃ. ৪২, হাদীস: ১৯৮৮

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮৯১, হাদীস: ১১২৩

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৪২, হাদীস: ১৯৮৯

عَنْ مَيْمُوْنَةَ -ﷺ-، أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِيْ صِيَامِ النَّبِيِّ -ﷺ- يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

'মায়মুনা ﷺ থেকে বর্ণিত, আরফা দিবসে নবীজি ﷺ এর সিয়াম পালন নিয়ে লোকজনের মাঝে সংশয় বিরাজ করছিলো। আমি তাঁর নিকট এক পিয়ালা দুধ পাঠাই, সে সময় তিনি বাহনে সওয়ার ছিলেন। অতঃপর তিনি তা পান করলেন আর লোকজন দেখলো'।

ইমাম আত-তিরমিযী رحمه الله বলেন, এ-বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه ও হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণনা রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَصُمْهُ يَعْنِيْ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمَعَ أَبِيْ بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُوْمُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ الْإِفْطَارَ بِعَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى بِهِ الرَّجُلُ عَلَى الدُّعَاءِ، وَقَدْ صَامَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে হজ করেছি। তিনি এ-দিন অর্থাৎ আরফা-দিবসে সিয়াম পালন করতেন না। হযরত আবু বকর رضي الله عنه-এর সাথেও হজ করেছি, তিনিও এ-দিন সিয়াম পালন করতেন না। হযরত ওমর (ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه)-এর সাথেও হজ করেছি, তিনিও সে-দিনে সিয়াম পালন করতেন না। আর আমিও এ-দিন সিয়াম পালন করি না, এর আদেশ করি না এবং এ-থেকে বারণও করি না। অধিকাংশ আলিমদের মতে সশক্তিতে প্রার্থনা করার জন্য আরাফা-দিবসে সিয়াম পালন না করা মুস্তাহাব। আর অনেক আলিম আরফা-দিবসে আরফায় সিয়াম পালন করেছেন।'[১]

আরফা-দিবসের ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

«إِنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ وَالَّتِيْ قَبْلَهُ».

'নিশ্চয় দিবসটি বিগত একবছর ও আগামী এক বছরের গোনাহ মার্জনা করে দেবেন।'[২]

সঠিক মতে আরফা-দিবসে সিয়াম পালন মুস্তাহাব তবে হাজিদের জন্য নয়। এতে তারা প্রার্থনা এবং সাধনা করতে শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

---

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১১৫–১১৬, হাদীস: ৭৫০ ও ৭৫১

[২] আত-তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৭৪৯

কিছু কিছু লোক বিভিন্ন দেশে আরাফা-দিবসের বিশেষ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে—সেসবের হুকুম আলোচনা করে। এ-ব্যাপারে সতর্ক করা প্রয়োজন।

কোনো কোনো হানাফী আলেমরা উল্লেখ করেছেন যে,

أَنَّ التَّعْرِيفَ: وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ تَشَبُّهًا بِالْوَاقِفِيْنَ بِعَرَفَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

'التعريف (আরাফা-দিবসের বিশেষ কর্মকা-) বলতে, আরাফায় অবস্থানের সাথে সাদৃশ্য রেখে আরাফা-দিবসে বিভিন্ন স্থানে লোকজন সমবেত হওয়া। এসব ভিত্তিহীন।'

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, উসুলের বর্ণনার বিপরীতে এসব মাকরূহ নয়। কেননা বর্ণিত রয়েছে যে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْبَصْرَةِ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বসরায় এ-রকম করেছিলেন।'[1]

আত-তাবয়ীন গ্রন্থে এ-রকমই এসেছে।[2]

আল-জামিউস সগীর আল-বুরহানীতে আছে,

إِنَّ قَوْلَهُمْ: التَّعْرِيفُ الَّذِيْ يَصْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

'তাঁদের বক্তব্য: التعريف (আরাফা-দিবসের বিশেষ কর্মকা-) যা মানুষ সৃষ্টি করেছে—তার কোনো ভিত্তি নেই।'

অবশ্য এর দ্বারা শরীয়া-সম্মত অন্যান্য ইবাদতও নিষিদ্ধ নয়। কেননা এসব তো দুআ, তাসবীহ এবং আল্লাহর কাছে সকাতর প্রার্থনা। তবে এসবকে ওয়াজিব বা সুন্নাত মনে করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ফাতাওয়া নাজমুদ্দীন আল-বলখীতে এ-রকমই রয়েছে।

আল-জামিউস সগীরে আছে,

التَّعْرِيفُ الَّذِيْ يَصْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

---

[1] (ক) আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ৮৬; (খ) ফখরউদ্দিন আয-যায়লায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২২৮; (গ) মোল্লা খসরু, *দুরারুল হুকাম*, খ. ১, পৃ. ১৪৪

[2] ফখরউদ্দিন আয-যায়লায়ী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২২৬

'মানুষের তৈরি আরাফার কোনোই ভিত্তি নেই।'[১]

তাই আরফা-দিবসে প্রত্যেক শহরের সালিহ ও আরিফ ব্যক্তিবর্গ সমবেত হয়ে হজের ন্যায় তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করেন। এসবের কোনো ভিত্তি নেই অর্থাৎ সুন্নায় এসবের কোনো অনুমোদন নেই। তবে এসব স্বতন্ত্রভাবে ইবাদত, কল্যাণ এবং কল্যাণকর কাজের প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডের অংশ।

আল-কাফী গ্রন্থে এ-রকমই বলা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুস্তাহাব। কেননা এতে অনুগত বান্দাদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়, এতে তারা সাওয়াব লাভ করবেন।

একথা রয়েছে *সুনান আল-হুদায়*।

একথা স্পষ্ট যে, যিকর, তাসবীহ-তাহলীল ও দুআ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এসব সর্বত্র-সবসময় শরীয়া-সম্মত। কিন্তু আপত্তিকর হলো আরফায় অবস্থানকারীরা সে-জায়গায় যা করেন অনুরূপভাবে ইহরামের পোশাক পড়া, তালবিয়াসহ হজের যাবতীয় আদবসমূহ পালন করার ক্ষেত্রে। স্পষ্টত এসব শুধু আরাফার সাথেই নির্দিষ্ট। প্রকৃত ব্যাপারে আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

এ ছাড়া অন্যান্য ইবাদত, দুআ ও আহকাম ইত্যাদি ফিকহ ও হজ-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে আলোচিত হয়েছে, সেসবে খুঁজে নেওয়া যায়। এখানেই এই পুস্তিকার মাধ্যমে আমাদের যা উদ্দেশ্য ছিলো তার সমাপ্তি হয়েছে।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ هُدَاةِ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَمُحْيِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، آمِيْنَ، آمِيْنَ، آمِيْنَ.

'অবশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সমস্ত প্রসংশা সে-মহান আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহর সালাত বর্ষিত হোক রাসূলকুল শিরোমণি ও খোদাভীরুদের প্রাণস্পন্দন মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবা এবং তাঁর সেসব অনুসারীবৃন্দের প্রতি যারা হকের পথে অবিচল থেকে দীনি জ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করছেন। আমিন, আমিন, আমিন।

সমাপ্ত।

---

[১] মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, *আল-জামিউস সগীর*, পৃ. ১১৫

তথ্যপঞ্জি

১. আল-কুরআন

২. আল-আইনী : বদরুদ্দীন, আবু মুহাম্মদ, মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমদ আল-আইনী (৭৬২–৮৫৫ হি. = ১৩৬১–১৪৫১ খ্রি.), *আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৩. আল-আজুররী : আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুররী (০০০–৩৬০ হি. = ০০০–৯৭০ খ্রি.), *আশ-শরীআ,* দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, সুউদি আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৪. আল-আজলূনী : আবুল ফিদা, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী আল-জাররাহী আল-আজলূনী আদ-দামিশকী (১০৮৭–১১৬২ হি. = ১৬৭৬–১৭৪৯ খ্রি.), *কাশফুল খিফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস আম্মা ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস,* মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৩৫১ হি. = ১৯৩২ খ্রি.)

৫. আবদ ইবনে হুমায়দ : আবু মুহাম্মদ, আবদ ইবনে হুমায়দ ইবনে নাসর আল-কিস্‌সী (০০০–২৪৯ হি. = ০০০–৮৬৩ খ্রি.), *আল-মুনতাখাব মিন মুসনদি আবদ ইবনি হুমায়দ,* মাকতাবাতুস সুন্না, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৬. আবদুর রায্‌যাক আস-সানআনী: আবু বকর, আবদুর রায্‌যাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফি আল-হিময়ারী আস-সানআনী (১২৬–২১১ হি. = ৭৪৪–৮২৭ খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ,* আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

৭. আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী: আবুল আলা, মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহীম আল-মুবারকপুরী (০০০–১৩৫৩ হি. = ০০০–১৯৩৪ খ্রি.), *তুহফাতুল আহওয়াযী ফী শরহি জামিয়িত তিরমিযী,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৯১৪ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৮. আবু আওয়ানা : আবু আওয়ানা, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আন-নায়শাপুরী (০০০–৩১৬ হি. = ০০০–৯২৮ খ্রি.), *আল-মুসতাখরাজ,* দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৯. আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী : আবু ইয়া'লা, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হিলাল আত-তামীমী আল-মুসিলী (২১১–৩০৭ হি. = ৮২৬–৯২০ খ্রি.), *আল-মুসনদ,* দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

১০. আবু তালিব আল-মক্কী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আতিয়া আল-হারিসী (০০০–৩৮৬ হি. = ০০০–৯৯৬ খ্রি.), *কুয়াতুল কুলূব ফী মুআমিলাতিল মাহবূব ওয়া ওয়াসফি তারীকিল মুরীদ ইলা মাকামিত তাওহীদ,* দারুল

কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

১১. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২–২৭৫ হি = ৮১৭–৮৮৯ খ্রি.), *আস-সুনান,* আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান

১২. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৩৬–৪৩০ হি = ৯৪৮–১০৩৮ খ্রি.):

(ক) *আত-তিব্বুন নববী* (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি = ২০০৬ খ্রি.)

(খ) *দালায়িলুন নুবুওয়াত,* দারুন নাফায়িস, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি = ১৯৮৬ খ্রি.)

(গ) *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া,* দারুল ফিক্‌র, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৩. আবু মুসহির আল-গাস্‌সানী: আবু মুসহির, আবদুল আ'লা ইবনে মুসহির ইবনে আবদুল আ'লা ইবনে আবু যারআ আল-গাস্‌সানী আদ-দিমাশকী (১৪০–২১৮ হি = ৭৫৭–৮৩৩ খ্রি.), *আন-নুসখা,* দারুস সাহাবা, তানতা (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি = ১৯৮৯ খ্রি.)

১৪. আবু শামা আল-মাকদিসী : আবুল কাসিম, আবু শামা, শিহাবউদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম আল-মাকদিসী আদ-দিমাশকী (৫৯৯–৬৬৫ হি = ১২০২–১২৬৭ খ্রি.), *আল-বায়িস আলা ইনকারিল বিদয়ি ওয়াল হাওয়াদিস,* দারুল হুদা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৮ হি = ১৯৭৮ খ্রি.)

১৫. আবুর রবী আল-কালায়ী : আবুর রবী, সুলায়মান ইবনে মূসা ইবনে সালিম ইবনে হাস্‌সান আল-কালায়ী আল-হিময়ারী (৫৬৫–৬৩৪ হি = ১১৭০–১২৩৭ খ্রি.) *আল-ইকতিফা বি-মা তাযাম্মানাহু মিন মাগাযি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াস সালাসাতিল খুলাফা,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি = ২০০০ খ্রি.)

১৬. আলাউদ্দীন মুগলতায়ী : আবু আবদুল্লাহ, আলাউদ্দীন, মুগলতায়ী ইবনে কালীজ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাকজারী আল-মিসরী আল-হিকরী আল-হানাফী (৬৮৯–৭৬২ হি = ১২৯০–১৩৬১ খ্রি.), *মুখতাসারুস সিরাতিন নাবাওয়িয়্যা,* দারুল মাআরিফ, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি = ২০০১ খ্রি.)

১৭. মোল্লা আলী আল-কারী: নূরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০–১০১৪ হি = ০০০–১৬০৬ খ্রি.):

(ক) *জামউল ওয়াসায়িল শরহিশ শামায়িল,* আল-মাতবাআতুশ শারফিয়া, হলব, মিসর

(খ) *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতিল মাসাবীহ,* দারুল ফিকর, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি = ২০০২ খ্রি.)

১৮. আলী আল-মুত্তাকী : আলাউদ্দীন, আলী ইবনে হোসামউদ্দীন ইবনে কাযী খান আল-কাদিরী আশ-শাযিলী আল-হিন্দী আল-বুরহানপুরী আল-মাদানী আল-মক্কী আল-মুত্তাকী (৮৮৮–৯৭৫ হি = ১৪৮৩–১৫৬৭ খ্রি.),

কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (পঞ্চম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

১৯. আযুদ্দীন আল-ইজী : আবুল ফযল, আযুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল গফ্ফার (০০০-৭৫৬ হি. = ০০০-১৩৫৫ খ্রি.), *আল-মাওয়াকিফ,* দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

২০. কাযী আয়ায : আবুল ফযল, আয়ায ইবনে মুসা ইবনে আমরূন আল-ইয়াহসাবী আস-সাবতী (৪৭৬-৫৪৪ হি. = ১০৮৩-১১৪৯ খ্রি.):

(ক) *আশ-শিফা বি তা'রিফি হুকূকিল মুস্তাফা,* দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান (১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

(খ) *ইকমালুল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম,* দারুল ওয়াফা, আল-মনসুরা, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

(গ) *মাশারিকুল আনওয়ার আলা সিহাহিল আসার,* দারুত তুরাস, কায়রো মিসর ও আল-মাকতাবাতুল আতিকিয়া, তুনস, তিউনিশিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৯ হি. = ১৯৭০ খ্রি.)

২১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ,* মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

২২. আল-ইরাকী : আবুল ফযল, যায়নুদ্দীন, আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে ইবরাহীম আল-কুরদী আর-রাযনানী আল-মিহরানী আল-মিসরী আশ-শাফিয়ী (৭২৫-৮০৬ হি. = ১৩২৫-১৪০৪ খ্রি.), *আত-তাবসিরাতু ওয়াত তাযকিরাতু আলফিয়াতুল ইরাকী ফি...*, *আল-...* হস্তলিপি

২৩. আল-ইমরানী : আবুল হুসাইন, ইয়াহইয়া ইবনে আবুল খায়র ইবনে সালিম আল-ইমরানী আল-ইয়ামানী আশ-শাফিয়ী (৪৮৯-৫৫৮ হি. = ১০৯৫-১১৬২ খ্রি.), *আল-বায়ান ফী মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফিয়ী,* দার আল-মিনহাজ, জিদ্দা, সৌউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

২৪. আল-ইয়াফিয়ী : আফীফুদ্দীন, আবুল্লাহ ইবনে আস'আদ ইবনে আলী আল-য়াফী (৬৯৮-৭৬৮ হি. = ১২৯৮-১৩৬৭ খ্রি.):

(ক) *মুখতাসারুল মাহাসিন ফী মানাকিবিশ শায়খ আবদিল কাদির,* দারুল আসার আল-ইলমিয়া, ব্রেবলি, শ্রীলংকা (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

(খ) *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান ফী মা'রিফাতি মা য়ু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

২৫. ইবনুন নাজ্জার : আবু আবদুল্লাহ, মুহিব্বুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনুল হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে মাহাসিন ইবনুন নাজ্জার (৫৭৮-৬৪৩ হি. = ১১৮৩-১২৫৪ খ্রি.):

(ক) *আদ-দুররাতুস সমীনা ফী আখবারিল মদীনা,* দারুল আরকাম ইবনে আবী আরকাম গ্রুপ, কায়রো, মিসর

(খ) *যাইলু তারীখি বাগদাদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি = ১৯৯৭ খ্রি.)

২৬. ইবনুল আরাবী : আবু বকর, কাযী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাআফিরী আল-ইশবীলী আল-মালিকী (৪৬৮–৫৪৩ হি = ১০৭৬–১১৪৮ খ্রি.), *আল-মাসালিক ফী শারহি মুওয়াত্তা মালিক*, দারুল গারব আল-ইসলামী, বৈরুত, লেবানন (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৮ হি = ২০০৭ খ্রি.)

২৭. ইবনুল আসীর : ইযযুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল আসীর আল-জাযারী আশ-শাইবানী (৫৫৫–৬৩০ হি = ১১৬০–১২৩৩ খ্রি.):

(ক) *উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি = ১৯৯৪ খ্রি.)

(খ) *জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, মাকতাবাতুল হুলওয়ানী, বৈরুত, লেবানন (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৯ হি = ১৯৬৯ খ্রি.)

(গ) *আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার*, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৩৯৯ হি = ১৯৭৯ খ্রি.)

২৮. ইবনুল জাওযী : আবুল ফারাজ, জামালুদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওযী (৫০৮–৫৯৭ হি = ১১১৬–১২০১ খ্রি.):

(ক) *আত-তাবসিরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি = ১৯৮৬ খ্রি.)

(খ) *আল-মাওযূআত*, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়া, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: (১ম ও ২য় খ.) ১৩৮৬ হি = ১৯৬৬ খ্রি. ও (৩য় খ.) ১৩৮৮ হি = ১৯৬৮ খ্রি.)

(গ) *আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি = ১৯৯২ খ্রি.)

(ঘ) *তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসার ফী উয়ূনিত তারীখ ওয়াস সিয়ার*, দারুল আরকাম ইবনি আবিল আরকাম, বৈরুত, লেবানন (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি = ১৯৯৭ খ্রি.)

(ঙ) *সিফাতুস সাফওয়া*, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি = ২০০০ খ্রি.)

২৯. ইবনুল হাজ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাজ আল-আবদারী (০০০–৭৩৭ হি = ০০০–১৩৩৬ খ্রি.), *আল-মাদখাল*, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন (১৪০১ হি = ১৯৮১ খ্রি.)

৩০. ইবনুস সালাহ : তকী উদ্দীন, আবু আমর, উসমান ইবনে আবদুর রহমান আশ-শাহরাযূরী (৫৭৭–৬৪৩ হি = ১১৮১–১২৪৫ খ্রি.), *মা'রিফাতু আনওয়াইল উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি = ২০০২ খ্রি.)

৩১. ইবনুস সুন্নী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আসবাত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে বুদায়হ আদ-দীনাওয়ারী (২৮০–৩৬৪ হি. = ৮৯৪–৯৭৪ খ্রি.), *আমালুল য়াওমি ওয়াল লায়লা : সুলূকুন নবী মাআ রব্বিহি ﷺ ওয়া মুআশারাতুহু মাআল ইবাদ*, দারুল কিবলা, জিদ্দা, সৌদি আরব / মুওয়াসসিসাতু উলূমিল কুরআন, বয়রুত, লেবনান

৩২. ইবনুল হুমাম : কামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে মাসউদ আস-সিওয়াসী আল-ইসকান্দরী (৭৯০–৮৬১ হি. = ১৩৮৮–১৪৫৭ খ্রি.), *ফতহুল কদীর শরহুল হিদায়া*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

৩৩. ইবনে আবদুল বার্‌র : আবু ওমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বার্‌র আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮–৪৬৩ হি. = ৯৭৮–১০৭১ খ্রি.):

(ক) *আত-তামহীদু লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ*, ওয়াযারাতু উমূমিল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়া, মাগরাব (১৩৮৭ হি. = ১৯৬৭ খ্রি.)

(খ) *আল-ইসতিযকার*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৩৪. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯–২৩৫ হি. = ৭৭৬–৮৪৯ খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৩৫. ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী: আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনযির আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী (২৪০–৩২৭ হি. = ৮৫৪–৯৩৮ খ্রি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকাররমা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৩৬. ইবনে আবিদীন : মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবদুল আযীয আবিদীন আদ-দামিশকী আল-হানাফী (১১৯৮–১২৫২ হি. = ১৭৮৪–১৮৩৬ খ্রি.), *রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার = হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন = ফতোয়ায়ে শামী*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

৩৭. ইবনে আসাকির : আবুল ইয়ামান, আমীনুদ্দীন, আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব, ইবনে আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনে আসাকির আদ-দিমাশকী (৬১৮–৬৮৬ হি. = ১২২১–১২৮৭ খ্রি.):

(ক) *ইত্তিহাফুয যায়ির ওয়া ইতরাফুল মুকিম লিস-সায়ির ফী যিয়ারাতিন্নাবী* ﷺ, দারুল আরকম ইবনু আবিল আরকম (প্রথম সংস্করণ)

(খ) *মুখতাসার ফী ফযলি রজব*, মুআসসিসাতুর রাইয়ান, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৩৮. ইবনে আসাকির : তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দামিশকী (৪৯৯–৫৭১ হি. = ১১০৫–১১৭৬ খ্রি.):

(ক) *তারিখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিক্‌রু ফাদলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হাল্লাহা মিনাল আমাসিল আওইজতাযু বিনাওয়াহিহা মিন ওয়ারিদিয়্যিহা ওয়া আহলিহা*, দারুল ফিক্‌র, দামিশক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

(খ) *মু'জামুশ শুয়ুখ*, দারুল বাশায়ির, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৩৯. ইবনে ইরাক : নূরুদ্দীন, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইরাক আল-কিনানী (৯০৭–৯৬৩ হি. = ১৫০২–১৫৫৬ খ্রি.) *তানযীহুশ শরীয়া আল-মারফূআ আনিল আখবারিশ শানীআ আল-মাওযূআ*, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৯ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

৪০. ইবনে ইসহাক : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার আল-মুত্তালিবী আল-মাদানী (০০০–১৫১ হি. = ০০০–৭৬৮ খ্রি.) *আস-সিয়ার ওয়াল মাগাযী*, দারুল ফিক্‌র, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৮ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

৪১. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৪২. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.):

(ক) *আস-সীরাতুন্নাওয়াবিয়া*, দারুল মা'রিফা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৫ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

(খ) *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৪৩. ইবনে কাইয়্যিম আল-জওযিয়া: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সা'দ আল-জওযিয়া (৬৯১–৭৫১ হি. = ১২৯২–১৩৫০ খ্রি.):

(ক) *আল-মানারুল মুনীফ ফিস সহীহ ওয়ায যায়ীফ*, মাকতাবাতুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯০ হি. = ১৯৭০ খ্রি.)

(খ) *তুহফাতুল মাওদুদ বি-আহকামিল মাওলুদ*, মাকতাবাতু দারুল বায়ান, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯১ হি. = ১৯৭১ খ্রি.)

৪৪. ইবনে কানি' : আবুল হুসাইন, আবদুল বাকী ইবনে কানি' ইবনে মরযূক ইবনে ওয়াসিক আল-উমাওয়ী আল-বগদাদী (২৬৬–৩৫১ হি. = ৮৮০–৯৬২ খ্রি.), *মু'জামুস সাহাবা*, মাকতাবাতুল গুরাবা আল-আসরিয়া, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৪৫. ইবনে খুযায়মা : শায়খুল ইসলাম, আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা ইবনুল মুগীরা ইবনে সালিহ ইবনে বকর আস-সুলামী আন-

(২৯৭–৩৮৫ হি. = ৯০৯–৯৯৫ খ্রি.), *নাসিখুল হাদীস ওয়াল মনসূখুহ,* মাকতাবা আল-মানার (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৫৪. ইবনে সাইয়্যিদুন নাস : আবুল ফাতাহ, ফাতাহুদ্দীন, ইবনে সাইয়্যিদুন নাস, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-ইয়া'মারী আর-রিব'য়ী (৬৭১–৭৩৪ হি. = ১২৭৩–১৩৩৪ খ্রি.). *উয়ূনুল আসার ফিল মাগাযী ওয়াশ শামায়িল ওয়াস সিয়ার,* দারুল কলম, বয়রুত, লেবনান (১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৫৫. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বাগদাদী (১৬৮–২৩০ হি. = ৭৮৪–৮৪৫ খ্রি.), *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৫৬. ইবনে হাজর আল-হায়সামী: শিহাব উদ্দীন, শায়খুল ইসলাম, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল-হায়সামী আস-সা'দী আল-আনসারী (৯০৯–৯৭৪ হি. = ১৫০৪–১৫৬৭ খ্রি.):

(ক) *আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া,* দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান

(খ) *আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা আলা আহলির রাফযি ওয়ায যালাল ওয়ায যানদাকা,* মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

৫৭. ইবনে হাজর আল-আসকালানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হি. = ১৩৭২–১৪৪৯ খ্রি.):

(ক) *তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রজব,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

(খ) *নুযহাতুন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকর ফী মুসতালাহি আহলিল আসর,* মাতবাআতু সফীর, রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

(গ) *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী,* দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

৫৮. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হিব্বান ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তামীমী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০–৩৫৪ হি. = ০০০–৯৬৫ খ্রি.):

(ক) *আল-মাজরূহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন ওয়ায যুআফা ওয়াল মাতরূকুন,* দারুল ওয়া'য়ী আল-আরবী, হলব, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৬ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

(খ) *আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান,* মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

(গ) *আস-সিকাত,* দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ওসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৩ হি. = ১৯৭৩ খ্রি.)

৫৯. ইবনে হিশাম : আবু মুহাম্মদ, জামাল উদ্দীন, আবদুল মালিক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আল-হুমায়রী আল-মাআফিরী (০০০–২১৩ হি. =

০০০-৮২৮ খ্রি) *আস-সীরাতুন নাবাওয়ীয়া,* মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. = ১৯৫৫ খ্রি.)

৬০. ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ: আবু ইয়াকুব, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে মাখলাদ আল-খানযালী আত-তামীমী আল-মারূযী (১৬১-২৩৮ হি. = ৭৭৮-৮৫৩ খ্রি.), *আল-মুসনদ,* মাকতাবাতুল ঈমান, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৬১. ইয়াকুত আল-হামাওয়ী : আবু আবদুল্লাহ, শিহাবুদ্দীন, ইয়াকুত ইবনে আবদুল্লাহ আর-রূমী আল-হামাওয়ী (৫৭৪-৬২৬ হি. = ১১৭৮-১২২৯ খ্রি.), *মু'জামুল বুলদান,* দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৬২. আল-উকায়লী : আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে মুসা ইবনে হাম্মাদ আল-উকায়লী আল-মক্কী (০০০-২২৩ হি. = ০০০-৯৩৪ খ্রি.) *আয-যু'আফাউল কবীর,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৬৩. আল-কাস্‌তাল্লানী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্‌তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১-৯২৩ হি. = ১৪৪৮-১৫১৭ খ্রি.), *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া,* আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, কায়রো, মিসর

৬৪. আল-কাসানী : আলাউদ্দীন, আবু বকর ইবনে মাসউদ ইবনে আহমদ আল-কাসানী (০০০-৫৮৭ হি. = ০০০-১১৯১ খ্রি.), *বাদায়িউস সানাই ফী তারতীবিশ শারায়ি,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৬৫. আল-কিরমানী : শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে সায়ীদ আল-কিরমানী (৭১৭-৭৮৬ হি. = ১৩১৭-১৩৮৪ খ্রি), *আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শরহুল বুখারী,* দারু ইশাআতিত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

৬৬. কাযী খান : ফখরুদ্দীন, কাযী হাসান ইবনে মনসুর ইবনে আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে আবদুল আযীয খান আল-উয্‌জানদী আল-ফরগানী (০০০-৫৯২ হি. = ০০০-১১৯৬ খ্রি.), *আল-ফাতাওয়া আল-খানিয়া,* আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩১০ হি. = ১৮৯২ খ্রি.)

৬৭. আল-খতীবুল বগদাদী : আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি. = ১০০২-১০৭২ খ্রি.):

(ক) *আল-মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক,* দারুল কাদিরী, দামেশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ:১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

(খ) *আস-সাবিক ওয়াল লাহিক ফী তাবাউদ মা বায়না ওফাতি রাবিয়িইনা আন শায়খিন ওয়াহিদ,* দারুস সামিয়ী, রিয়াদ, সুউদি আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

(গ) *তারিখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া*

আরদীহা = তারিখু বগদাদ, দারুল গারব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৬৮. আল-খলীলী : আবূল য়া'লা, খলীল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল খলীল আল-খাযওয়ীনী (০০০–৪৪৬ হি. = ০০০–১০৫৪ খ্রি.), *আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতি ওলামায়িল হাদীস*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৬৯. আল-খারায়িতী : আবূ বকর, মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সহল ইবনে শাকির আল-খারায়িতী আস-সামিরী (২৪০–৩২৭ হি. = ৮৫৪–৯৩৯ খ্রি.), *হাওয়াতিফুল জিনান*, দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৭০. আল-গাযালী : হুজ্জাতুল ইসলাম, আবূ হামিদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তূসী (৪৫০–৫০৫ হি. = ১০৫৮–১১১১ খ্রি) *ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, দারুল মারিফা, বয়রুত, লেবনান

৭১. আল-জামী : নূরুদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-জামি (৭১৭–৮৯৮ হি. = ১৪১৪–১৪৯৬ খ্রি.), *শাওয়াহিদুন নুবুওয়াত লি-তাকবিয়াতি ইয়াকীনি আহলিল ফুতুওয়াত*, মাকতাবায়ে নাবাওয়াবিয়া, লাহোর, পাকিস্তান (চতুর্থ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৭২. আত-তাবরীযী : আবূ আবদুল্লাহ, ওয়ালি উদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমরী আত-তাবরীযী (০০০–৭৪১ হি. = ০০০–১৩৪০ খ্রি.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ = ১৯৮৫ খ্রি.)

৭৩. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.):

(ক) *আল-মু'জামুস সগীর*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

(খ) *আল-মু'জামুল আওসাত*, দারুল হারামাইন, কায়রো, মিসর

(গ) *আল-মু'জামুল কবীর*, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

(ঘ) *মুসনদুশ শামিইয়ীন*, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৭৪. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯–২৭৯ হি. = ৮২৪–৮৯২ খ্রি.):

(ক) *আল-জামিউল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

(খ) *আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া ওয়াল খাসায়িলুল মুস্তাফিয়া*, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া, মক্কায়ে মুকার্‌রমা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

(ক) *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা*, মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়্যা, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

(খ) *আস-সুনানুল কুবরা*, মুআসসাসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৮৫. আন-নাওয়াওয়ী : আবু যাকারিয়া, মুহইউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১–৬৭৬ হি. = ১২৩৪–১২৭৮ খ্রি.):

(ক) *আল-মজমূ' শরহুল মুহাযযাব*, দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান

(খ) *আল-মিনহাজ শরহু সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. = ১৯৭২ খ্রি.)

(গ) *খুলাসাতুল আহকাম ফী মুহিম্মাতিস সুনান ওয়া কাওয়ায়িদিল ইসলাম*, মুআসসাসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

(ঘ) *রাওযাতুত তালিবীন ওয়া ওমদাতুল মুফতিয়ীন*, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বয়রুত, লেবনান; দামেস্ক, সিরিয়া; আম্মান, জর্ডান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৮৬. নাসিরুদ্দীন আল-বয়যাওয়ী: কাযী, নাসিরুদ্দীন, আবু সাঈদ, আবুল খাইর, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শীরাযী আল-বয়যাওয়ী (০০০–৬৯১ হি. = ০০০–১২৯২), *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাওয়ীল*, দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৮৭. নুরুদ্দীন আল-হায়সামী: আবুল হাসান, নুরুদ্দীন, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫–৮০৭ হি. = ১৩৩৫–১৪০৫ খ্রি.), *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৮৮. আল-ফাত্তানী : মুহাম্মদ তাহির ইবনে আলী আস-সিদ্দীকী আল-হিন্দী আল-ফাত্তানী (৯১০–৯৮৬ হি. = ১৫০৪–১৫৭৮ খ্রি.), *তাযকিরাতুল মাওযূআত*, ইদারাতুত তাবাআ আল-মুনিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৩৪৩ হি. = ১৯২৯ খ্রি.)

৮৯. আল-ফীরযাবাদী : মুজাদ্দিদুদ্দীন, আবু তাহির, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ইবনি মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আমর আশ-শীরাযী আল-ফীরযাবাদী (৭২৯–৭১৭ হি. = ১৩২৯–১৪১৫), *আল-কামূসুল মুহীত*, মুআসসাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

৯০. ফখরউদ্দিন আয-যায়লায়ী: ফখরউদ্দীন, ওসমান ইবনে আলী ইবনে মিহজান আল-বারিঈ আয-যায়লায়ী আল-হানাফী (০০০–৭৪৩ হি. ০০০ = ১৩৪৩ খ্রি.), *তাবয়ীনুল হাকায়িক শরহু কানযিদ দাকায়িক*, আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩১৩ হি. = ১৮৯৫ খ্রি.)

৯১. আল-বাগাওয়ী : আবুল কাসিম, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনুল মারযুবান ইবনে সাবূর ইবনে শাহিনশাহ আল-বাগাওয়ী (২১৪–৩১৭ হি. = ৮৩০–৯২৯ খ্রি.), *মু'জামুস সাহাবা*, দারুল বায়ান, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৯২. আল-বাগাওয়ী : রুকনুদ্দীন, মুহয়িউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ, আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল ফাররা আল-বাগাওয়ী আশ-শাফিয়ী (৪৩৬–৫১০ হি. = ১০৪৪–১১১৭ খ্রি.), *শরহুস সুন্নাহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দামেস্ক, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

৯৩. আল-বাবারতী : মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ, আকমল উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ ইবনুশ শায়খ শামসুদ্দীন ইবনুশ শায়খ জামাল উদ্দীন আর-রুমী আল-বাবারতী (৭১৪–৭৮৬ হি. = ১৩১৪–১৩৮৪ খ্রি.), *আল-ইনায়া শরহুল হিদায়া*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

৯৪. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.):

(ক) *আদ-দা'ওয়াতুল কবীর*, গিরাস লিন-নাশর ওয়াত-তাওযী', কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

(খ) *আস-সুনানুস সগীর*, জামিয়াতুদ দারাসাত আল-ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

(গ) *আস-সুনানুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

(ঘ) *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

(ঙ) *ফাযায়িলুল আওকাত*, মাকতাবাতুল মানার, মক্কা শরীফ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

(চ) *মুখতাসারুল খিলাফিয়াত*, মকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

(ছ) *শুআবুল ঈমান*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

৯৫. আল-বাযযার : আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে ওবায়দিল্লাহ আল-আতাকী আল-বাযযার (০০০–২৯২ হি. = ০০০–৯০৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখখার*, মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪–১৪২৯ হি. = ১৯৮৮–২০০৯ খ্রি.)

৯৬. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪–২৫৬ হি. = ৮১০–৮৭০ খ্রি.):

(ক) *আল-আদাবুল মুফরাদ*, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

(খ) *আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ওয়া*

সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ, দারু তওকিল নাজাত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৯৭. আল-মাযিরী : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ওমর আত-তামীমী আল-মাযিরী আল-মালিকী (৪৫৩–৫৩৬ হি. = ১০৬১–১১৪১ খ্রি.), *আল-মু'লিম বি-ফাওয়াযিদি মুসলিম*, আদ-দারুত তিউনিসিয়া, জাযায়ির, তিউনিসিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি. [প্রথম ও দ্বিতীয় খ-], ১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৯৮. আল-মুতাররিযী : আবুল ফতহ, বুরহানউদ্দীন, নাসির ইবনে আবদুস সাইয়িদ আবুল মাকারিম ইবনে আলী আল-খাওয়ারযিমী আল-মুতাররিযী (৫৩৮–৬১০ হি. = ১১৪৪–১২১৩ খ্রি.) *আল-মুগরিব ফী তারতীবিল মুরীব*, দারুল কিতাব আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৯ হি.)

৯৯. মালিক ইবনে আনাস: ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিময়ারী (৯৩–১৭৯ হি. = ৭১২–৭৯৫ খ্রি.):

(ক) *আল-মাদূনা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

(খ) *আল-মুওয়াত্তা*, যায়দ ইবনে সুলতান আলে নাহিয়ান ফাউন্ডেশন, আবু যাবী, সংযুক্ত আরব-আমিরাত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

১০০. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী: ইমাম, হাফিয, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (১৩১–১৮৯ হি. = ৭৪৮–৮০৪ খ্রি.), *আল-জামিউস সগীর*, আলমুল কুতুব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

১০১. মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী : হাফিয, মুহিব্বুদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আত-তাবারী (৬১৫–৬৯৪ হি. = ১২১৮–১২৯৫ খ্রি.):

(ক) *আর-রিয়াযুন নাযরা ফী মানাকিবিল আশরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ)

(খ) *খুলাসাতু সিয়ারি সাইয়িদিল বাশার*, মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকাররমা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

১০২. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ ﷺ = আস-সহীহ*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

১০৩. মোল্লা খসরু : মুহাম্মদ ইবনে ফরামুরযি ইবনে আলী মোল্লা/মুনলা/মওলা খসরু (০০০–৮৮৫ হি. = ০০০–১৪৮০ খ্রি.), *দুরারুল হুকাম ফী শরহি গুরারিল আহকাম*, দারু ইয়াহইয়ায়ির কুতুব আল-আরবিয়া, বয়রুত, লেবনান

১০৪. আয-যারকাশী : শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আয-যারকাশী আল-মিসরী আল-হাম্বলী (৭৪৫–৭৯৪ হি. = ১৩৪৪–১৩৯২ খ্রি.):

(ক) *আশ-শরহ আলা মুখতাসারিল খারকী*, দারুল আবীকান, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

(খ) *তালখীসু কিতাবিল মাওযূআত লি-ইবনুল জাওযী*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

(গ) *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

১০৫. আয-যুরকানী : আবু আবদিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে শাহাবউদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ আয-যুরকানী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

১০৬. যিয়াউদ্দিন আল-মাকদিসী: যিয়াউদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (৫৬৯–৬৪৩ হি. = ১১৭৪–১২৪৫ খ্রি.), *আল-আহাদীসুল মুখতারা = আল-মুসতাখরাজ মিনাল আহাদীসিল মুখতারা মিম্মা লাম ইয়ুখরিজহুল-বুখারী ওয়া মুসলিম ফী সাহীহায়হিমা*, দারু খিযর, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

১০৭. আর-রাফিয়ী : আবুল কাসিম, আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম আর-রাফিয়ী আল-কাযওয়ীনী (৫৫৭–৬২৩ হি. = ১১৬২–১৯৮৭ খ্রি.), *আত-তাদওয়ীন ফী আখবারি কাযওয়ীন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

১০৮. আশ-শাতানুফী : আবুল হাসান, আলী ইবনে ইউসুফ ইবনে হারীয ইবনে মি'যাদ আল-লাখমী আশ-শাতানুফী (৬৪৪–৭১৩ হি. = ১২৪৬–১৩১৪ খ্রি.), *বাহজাতুল আসরার ওয়া মা'দিনুল আনওয়ার ফী বা'যি মানাকিবিল কুতুব আর-রাব্বানী মুহ্উদ্দীন আবী মুহাম্মদ আবদিল কাদির আল-জিলানী*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২ খ্রি.)

১০৯. আশ-শাফিয়ী : ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফি' ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদু মুনাফ আশ-শাফিয়ী আল-মুত্তালাবী আল-কুরাশী আল-মক্কী (১৫০–২০৪ হি. = ৭৬৭–৮২০ খ্রি.), *আল-উম্ম*, দারুল মুরিফা, বয়রুত, লেবনান (১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

১১০. আশ-শিলবী : শিহাবউদ্দীন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইউনুস ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইউনুস আল-শিলবী (০০০–১০২১ হি. = ০০০–১৬১২ খ্রি.), *আল-হাশিয়া আলা তাবয়ীনিল হাকায়িক শরহি কানযিদ দাকায়িক*, আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩১৩ হি. = ১৮৯৫ খ্রি.)

১১১. আস-সনদী : আবুল হাসান, নুরুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী আস-সনদী আত-তাতাওয়ী আল-হানাফী (০০০–১১৩৮ হি. = ০০০–১৭২৬ খ্রি.), *কিফায়াতুল হাজা ফী শরহি সুনানি ইবনি মাজাহ = হাশিয়াতুস সনদী আলা সুনানি ইবনি মাজাহ*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

১১২. আস-সাখাওয়ী : শামসুদ্দীন, আবুল খায়র, আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান ইবনে মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (৮৩১–৯০২ হি. = ১৪২৭–১৪৯৭ খ্রি.), *আল-মাকাসিদুল হাসানা ফী বয়ানি কসীরিম মিনাল আহাদীসিল মশহূরা আলাল আলসিনা*, দারুল কিতাব আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

১১৩. আস-সাফুরী : আবদুর রহমান ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে উসমান আস-সাফুরী আশ-শাফিয়ী (০০০–৮৯৪ হি. = ০০০–১৪৮৯ খ্রি.), *নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতাখাবুন নাফায়িস*, আল-মাতআবাতুল কাসতিলিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১২৮৩ হি. = ১৮৬৬ খ্রি.)

১১৪. আস-সামহূদী : নূরুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আল-হাসানী আস-সামহূদী আশ-শাফিয়ী (৮৪৪–৯১১ হি. = ১৪৪০–১৫০৬ খ্রি.):

(ক) *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

(খ) *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*

১১৫. আস-সুয়ূতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ূতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.):

(ক) *আল-খাসায়িসুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

(খ) *জামউল জাওয়ামি'*, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়া আল-আম্মা, কায়রো, মিসর (১৩৯৪ হি. = ১৯৭৪ খ্রি.)

(গ) *তাযয়ীনুল খুলাফা*, মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকাররমা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

১১৬. আস-সারাখসী : শামসুল আয়িম্মা, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু সাহল আস-সারাখসী (০০০–৪৮৩ হি. = ০০০–১০৯০ খ্রি.), *আল-মাবসূত*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

১১৭. আস-সালিহী : শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (০০০–৯৪৬ হি. = ০০০–১৫৩৬ খ্রি.), *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ ওয়া যিকরু ফাযায়িলিহি ওয়া আ'লামি নুবুওয়াতিহি ওয়া আফআলিহি ওয়া আহওয়ালিহি ফিল মাবদা ওয়াল মাআদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

১১৮. সা'লব : আবুল আব্বাস, সা'লব, আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে যায়দ ইবনে সায়ার আশ-শায়বানী (২০০–২৯১ হি. = ৮১৬–৯১৪ খ্রি.), *আল-মাজালিস*

১১৯. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১–৪০৫ হি. = ৯৩৩–১০১৪ খ্রি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস*

সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

১২০. আল-হাকীমুত তিরমিযী: আবূ আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হাসান ইবনে বশর আল-হাকীম আত-তিরমিযী (০০০–অনু. ৩২০ হি. = ০০০–অনু. ৯৩২ খ্রি.), *নাওয়াদিরুল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল ﷺ*, দারুন নাওয়াদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. = ২০১০ খ্রি.)

১২১. আল-হাদ্দাদী : আবূ বকর, ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-হাদ্দাদী আল-ইবাদী আয-যাবীদী আল-ইয়ামানী আল-হানাফী (০০০–৮০০ হি. = ০০০–১৩৯৭ খ্রি.), *আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা আলা মুখতাসারিল কুদুরী*, আল-মাতবাআ আল-খায়রিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৩২২ হি. = ১৯০৪ খ্রি.)

১২২. আল-হাসান আল-খাল্লাল: আবূ মুহাম্মদ, আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আলী আল-বগদাদী আল-খাল্লাল (৩৫২–৪৩৯ হি. = ৯৬৩–১০৪৭ খ্রি.), *ফাযায়িলু শাহরি রজব*, দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

১২৩. আল-হুমায়দী : আবূ বকর, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ইবনে ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ আল-কুরাশী আল-আসদী আল-হুমায়দী আল-মক্কী (০০০–২১৯ হি. = ০০০–৮৩৪ খ্রি.), *আল-মুসনদ*, দারুস সাকা, দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

১২৪. হান্নাদ ইবনুস সারী : আবুস সারী, হান্নাদ ইবনুস সারী ইবনে মাসআব ইবনে আবূ বকর ইবনে বশর ইবনে সা'ফূক ইবনে আমার ইবনে যারারা ইবনে আদস ইবন যায়দ আত-তামীমী আদ-দারিমী আল-কূফী (১৫২–২৪৩ হি. = ৭৬৯–৮৫৭ খ্রি.), *আয-যুহদ*, দারুল খুলাফা, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)